পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের জীবন, ধর্মমত ও দর্শন

বিকাশ চক্রবর্ত্তী
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং-

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ ---------- I

২। ঘোষণা পত্র ---------- II

৩। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ---------- III- IV

449694

৪। ভূমিকা---------- V-VI

৫। **প্রথম অধ্যায়:** শ্রীনিগমানন্দের জীবন ও তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা দীক্ষা---------- ১-৩৯

৬। **দ্বিতীয় অধ্যায়:** শ্রীনিগমানন্দের ধর্মীয় চিন্তা ---------- ৪০-৫১

৭। **তৃতীয় অধ্যায়:** শ্রীনিগমানন্দের দর্শন (ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ) ---------- ৫২-১০৭

৮। **চতুর্থ অধ্যায়:** ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার সাথে নিগমানন্দ দর্শন, চিন্তা ও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা ---------- ১০৮-১৭৫

৯। **পঞ্চম অধ্যায়:** আমাদের সময়ে নিগমানন্দ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা ও উপসংহার- ১৭৬-২২৪

১০। গ্রন্থপঞ্জি- ---------- ২২৫-২২৮

Dhaka University Institutional Repository

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের জীবন, ধর্মমত ও দর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

449601

গবেষক
বিকাশ চক্রবর্ত্তী
পরীক্ষার রোল নং-০১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. নিবন্ধন নং-২২৬
শিক্ষাবর্ষ-২০০৩-০৪

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

জুলাই, ২০১০

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. আনিসুজ্জামান
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। এও প্রত্যয়ন করছি যে, এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে এম. ফিল. বা পিএইচ.ডি. বা অন্য কোন উচ্চতর ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়া হয়নি।

অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ তথ্য নির্দেশিকায় রয়েছে।

বিকাশ চক্রবর্ত্তী
২৯/৭/২০২০

বিকাশ চক্রবর্ত্তী
এম.ফিল. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আনিসুজ্জামান ২৯/৭/২০২০
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনেক পরিশ্রম করে 'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের জীবন, ধর্মমত ও দর্শন' নামক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি যেমন গৌরবের তেমনি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দেরও । তবে আমার এই গৌরব এবং আনন্দের পিছনে অনেকের অবদান রয়েছে।

আমার লিখিত এই গবেষণা পত্রের পিছনে যার অবদান সবথেকে বেশি, তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে কর্মরত আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। আজকের এই আনন্দের দিনে তাঁর প্রতি রইল আমার শত কোটি প্রণাম। এই গবেষণা পত্রটির জন্য তিনি যে শ্রম দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে যেভাবে আমার গবেষণা কর্মটিকে সফল করতে সহায়তা করেছেন সে জন্য আমি তাঁর নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

যাঁর সাহায্য, সহযোগিতা ও উপদেশ ছাড়া আমার গবেষণা কর্মটি সফল হত না বলে আমি মনে করি, তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব ডাঃ নন্দ দুলাল চক্রবর্ত্তী। আসল কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমার এই গবেষণা কর্মটি তাঁরই অনুপ্রেরণার ফসল। আমার পিতার কাছে ঋণ স্বীকার করে তাঁকে আমি ছোট করতে চাই না, শুধু বলতে চাই 'পিতা' এমনি করে তুমি আমাকে হাত ধরে সত্য ধামে নিয়ে চল, এই তোমার কাছে আমার একমাত্র চাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ আমার 'মা' শ্রীমতি রেণু চক্রবর্ত্তী। আমার এই গবেষণা কর্মে তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ, আদর ও ভালবাসার ছোঁয়া রয়েছে। তাঁর অনুপ্রেরণা আমার গবেষণা কর্মের অন্যতম পাথেয় ছিল।

আমার সহধর্মিণী গীতা রাণী চক্রবর্ত্তী সংসারের অনকে কাজ তার আপন কাঁধে নিয়ে আমাকে আমার গবেষণা কর্মের জন্য সময় বের করে দিত, তাছাড়া অফুরন্ত অনুপ্রেরণা তো ছিলই, সেই জন্য আমি তার কাছেও বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

দিনাজপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সেবাশ্রমের কম্পিউটার চালক রমণী কান্ত রায় গবেষণা পত্রের প্রুফ সংশোধনে ও কম্পিউটার কম্পোজ পরিচালনা করে আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে, এই জন্য আমি তার কাছেও কৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণা পত্রটি লিখতে গিয়ে যেসকল পুস্তক ও জার্নালের সহায়তা নিতে হয়েছে সেই সকল পুস্তক ও জার্নালের লেখকদের আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

বিনয়াবনত–

বিকাশ চক্রবর্ত্তী

এম.ফিল. গবেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের জীবন, ধর্মমত ও দর্শন গবেষণাপত্রটি রচনা আমার জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ করতে চলেছে।

বর্তমান যুগের সম্প্রদায়-প্রবর্তক মহাপুরুষদের মধ্যে এ দেশে শ্রীনিগমানন্দই সর্ব প্রথম তাঁর দর্শনকে একটি সুশৃংখল এবং বিধিবদ্ধ রূপ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে হৃদয়োচ্ছ্বাসের চাইতে বুদ্ধির উদ্দীপনাই দাবি করেছেন বেশি। গবেষণাপত্রে তাঁর জীবন দর্শন ও ধর্মমতকে পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাঁর জীবন ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দীক্ষা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে- তাঁর ধর্মমত, তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর দর্শন চিন্তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর দর্শন ও ধর্ম চিন্তার সাথে ভারতীয় অন্যান্য দর্শন চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা, এবং পঞ্চম অধ্যায়ে উপসংহার তথা তাঁর দর্শনের প্রাসংঙ্গিকতা বিচার করা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে।

তাঁর জীবন যুগপৎ তিনটি সাধনার পরম্পরা। জ্ঞান পথে তাঁর ব্রহ্ম সাধনা, যোগ পথে পরমাত্মার সাধনা এবং প্রেম পথে ভগবানের সাধনা। এই তিনটি সাধনা বিভক্ত মনে হলেও অখন্ড বিজ্ঞানী তত্ত্ববিৎ একবাক্যেই বলবেন, নিঃসন্দেহে এটি এক ও অদ্বৈতত্ত্বেরই সাধনা যা আমরা তাঁর জীবন দর্শনে যুগপৎ লক্ষ করেছি। তন্ত্র পথে রূপের সাধনা, জ্ঞানে এসে তা হয়েছে অরূপের সাধনা, যোগে তাই প্রকাশ লাভ করেছে স্বরূপের প্রতিষ্ঠায় আর প্রেমে এসে তা তাঁর জীবনে ধরা দিয়েছে অপরূপের এক অনুপম মহিমা হিসেবে। একজন বাস্তববাদী মানুষও তাঁর জীবনকে এইভাবে পরিপূর্ণরূপে দেখতে ও পেতে চান। এখানেই শ্রীনিগমানন্দের জীবন ও ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা লাভ করেছেন।

আমি এই অবিচালিত প্রত্যয় নিয়েই এই মহামানবকে আমার জীবনের ধ্রুবতারা রূপে পেতে চেয়েছি। তিনিই আমার জীবন দেবতা। তাঁর এপারের কর্মের জন্যই আমি এই গবেষণার মাধ্যমে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। তাঁর অনুপম অনিন্দ্য আদর্শ জীবনকে দেশ জাতির কল্যাণে শান্তির অমিয়

Dhaka University Institutional Repository

ধারা রূপে বহাতে চেয়েছি। এই ঘূনে ধরা বাঙালী জাতির জন্য সত্যিকার তিনি একজন পথিকৃৎ। তিনি সত্যিকার একজন আদর্শ গার্হস্থ জীবন গঠন কর্তা। ত্যাগ ও ভোগ উভয় পথেই ছিল তাঁর উচ্চ দৃষ্টি। সমাজ রক্ষার্থে তিনি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দেশ জাতি রক্ষার্থে ভক্ত সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি বলেছেন যে, আনন্দের জন্য সৃষ্টি, আনন্দ ব্যাহত হইলে সেই সৃষ্টির কোন স্বার্থকতা নাই। তিনি কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। অথচ তিনি এমন শক্তিধর মহাপুরুষ ছিলেন যিনি বিভিন্ন মত পথের সাধককে এক জায়গায় সম্মিলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা অন্যান্যের পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব । তিনি জীবনভর আনন্দ রক্ষা করে গেছেন। জানায়ে গেছেন– আনন্দ থাকলে প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হলে শক্তির জাগরণ এবং আদর্শের প্রতিষ্ঠা হবেই হবে। তিনি বলতেন যে, পুরুষ একমাত্র তিনি, আর সকলেই আনন্দ লীলায় তাঁহারই প্রকৃতি বা শক্তি।

হে প্রাণ প্রিয়, গুরু মহারাজ এই দুরূহ কাজে আমাকে সামর্থ দিন, আমাকে শক্তি সাহস দান করুন আমি যেন দুস্তরগিরি লংঘন করতে সমর্থ হই। ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সবার উদারতা কামনা করছি।

শ্রী গুরু চরণাশ্রিত-

বিকাশ চক্রবর্ত্তী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শ্রীনিগমানন্দের জীবন ও তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা দীক্ষা

"ওঁ সচ্চিদানন্দ রূপায় ব্রহ্মণে নিগমাত্মনে

নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরুবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ।

ওঁ নম ভগবতে শ্রীশ্রী নিগমানন্দায় নমঃ নমঃ ।"[১]

পটভূমি

শ্রীনিগমানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া আমাদের পক্ষে স্পর্ধার কথা । তবে তিনি আমাদের গুরু দীক্ষা দাতা । তাই অকৃতার্থ প্রয়াসেরও আছে চরিতার্থতা । মানুষ যাঁর কাছে পায় চরম পথের আলো তাঁর কথা বলতে তৃষ্ণা জাগে বৈকি? কিন্তু আত্মসমর্থনের পালা থাকুক । সবাই এটুকু অন্তত স্বীকার করবেন যে, শ্রীনিগমানন্দের মহত্ত্বের কোন ছবি আঁকার প্রয়াস এ নয়– সে অসম্ভব । আমাদের চেষ্টা হোক শুধু তাঁর কথা যা পারি কিছু বলতে– যতটা পারি ব্যক্তিগত ভাবে । এ ক্ষেত্রে সেই পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ– যেহেতু যোগ সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক কথা বলার অধিকারী আমরা নই । তাঁর রচিত পুস্তক, গবেষক, গুণগ্রাহী সেবক, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, আদর্শগৃহী, ভক্ত-শিষ্য কথা এবং বিভিন্ন পত্রাবলী মাধ্যমে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছি এ রচনা তারই বিবৃতরূপ ।

---

১ । লেখকের নাম অজানা, পরমহংস শ্রীশ্রী নিগমানন্দদেব, দিনাজপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সেবাশ্রম, ১ম সংস্করণ ১৪১৪ পৃষ্ঠা নং-০১

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীনিগমানন্দের জীবন বৃত্তান্ত

জন্ম বাংলা ১২৮৭ সাল, ১৮৮০ খৃস্টাব্দ, ঝুলন পূর্ণিমা তিথি, রোজ বৃহস্পতিবার। মহাসমাধি- ১৩৪২ সন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ, ১৩ই অগ্রহায়ণ রোজ শুক্রবার, সময় দুপুর ১টা ১৫ মিনিট স্থান ৪৬/বি/১, বীডনস্ট্রিট, কলিকাতা, হাওড়া। পিতা ভুবন মোহন চট্টপাধ্যায়, মাতা মানিক সুন্দরীদেবী, স্থান রাধাকান্তপুর মাতুলালয়। পিতৃ নিবাস কুতুবপুর বর্তমানে মেহেরপুর জেলা সদর থেকে সাত আট মাইল উত্তরে কাথুলী বাস স্ট্যান্ডের এক কিলো উত্তর পশ্চিমে– নব কলেবরে নির্মিত ত্রিতল বিশিষ্ট অপরূপ শোভায় শোভা-মন্ডিত শ্রীশ্রী গুরুধাম (কুতুবপুর)। শ্রীনিগমানন্দের বাল্যনাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বাল্য ও যৌবন কাল

পিতা-মাতার বহু সাধনা ও তপস্যার ফল শ্রী নলিনীকান্ত। বাল্যকালে তিনি নির্ভিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, দুরন্তপনা, উপস্থিত বুদ্ধি, কর্মানুরাগ, সৎসাহস এবং পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। সাত বৎসর বয়সে একদা সন্ধ্যায় চন্ডি মন্ডপে ধুপদীপ জ্বালিয়ে মায়ের চরণে অর্ঘ ও প্রণাম নিবেদন করতে গেলে জগৎ জননী মা বালিকারূপে তাঁকে দর্শন দান করেন। জগৎতারিণী মায়ের এই আর্শীবাদই একদিন বয়ে আনে সিদ্ধসাধক নিগমানন্দ নামে তাঁর জীবনকে। বাল্যকালেই হন মা হারা ও স্নেহ আদর বঞ্চিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টপাধ্যায় ছিলেন তাঁর জ্ঞাতি দাদু। লেখা পড়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন তাঁর জীবনের এক দক্ষ রূপকার। যুবক বয়সে তিনি দাদু বঙ্কিমের ছোঁয়ায় নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা লিখতে শুরু করেন। উপনয়ণের পর বেশ আস্তিক ও ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠেন কিন্তু কিছু দিন পর থেকে পৈতা ফেলে দিয়ে ঘোর নাস্তিক হয়ে ওঠেন। এই সময় পিতা ভুবন মোহন তাঁর কুষ্ঠি হতে জানতে পারেন– যে সংসারী হলে তিনি রাজ চক্রবর্তী হবেন, সন্ন্যাসী হলে ভারত বরেন্য সাধু হবেন। তপস্যালব্ধ পুত্রকে পিতা হাত ছাড়া করতে রাজী না হওয়ায় মাত্র সতের বৎসর বয়সে এগার বৎসর বর্ষিয়া কলিকাতা নিবাসী হালি শহরের শ্রী

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্য বংশোদ্ভূত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া, সুশীলা, ধর্মপ্রাণা, সতীলক্ষ্মী, অনিন্দ সুন্দরী শুধাংশু বালার সাথে বিবাহ দেন।

সংসার ও চাকুরী জীবন

নলিনীকান্ত মধ্য ইংরেজী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঢাকায় আসেন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কিন্তু সংসারের অবস্থার দিকে তাকিয়ে সার্ভে স্কুলে (School Survey & Engineering) ভর্তি হন। উদ্দেশ্য ছিল এই সার্ভেয়ারী পাশ করলেই ওভারসিয়ারীর যোগ্যতা হবে। সহজেই একটি চাকুরী মিলবে। ঢাকা সার্ভে স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে সার্ভেয়ারী পাশ করেন। দিনাজপুর জেলা বোর্ডের অধীনে প্রথম সার্ভেয়ার পদের জন্য চাকুরীতে নিযুক্ত হন। বেতন অল্প হওয়ায় এই চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। সংসারের হাল ধরতে গিয়ে তাঁকে কঠোর বাস্তবতার সাথে লড়াই করে–অনুপমা সুন্দরী স্ত্রীর সান্নিধ্য ত্যাগ পূর্বক প্রবাস জীবন যাপন করতে হয়। মাত্র ৮ মাসের প্রকৃত বিবাহ জীবনের যবনিকা এক স্বপ্নময় সোনালী ভবিষ্যৎ; শুভ সূচনা লগ্নেই মুহূর্তে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় প্রকৃতির এক নির্মম কষাঘাতে।

জেনে রাখা ভাল, কুলপুরোহিত নলিনীর নাম নলিনীকান্ত কেন রাখলেন? নলিনী অর্থ পদ্ম, কান্ত অর্থ সূর্য। অর্থাৎ যিনি সূর্যের মত দীপ্তিমান এবং পদ্মের মত নয়নলোভন। এরই বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে শুধাংশু সংযুক্ত রূপচ্ছটায়। শুধাংশু অর্থ চন্দ্র। সূর্য হল জ্ঞানের প্রতীক, চন্দ্র হল ভক্তির প্রতীক। পদ্ম যেমন সূর্যের আলোয় পাপড়ি মেলে এবং সূর্য অস্তে পাপড়ি বুঝে, নলিনীকান্ত ও শুধাংশু বালাও ছিলেন আলো ও আঁধারে সম্মিলিত জ্যোতি ও চন্দ্রিমার এক অপরূপ নৈসর্গিক মহিমা-মন্ডিত জ্ঞান-প্রেমের উজ্জ্বল প্রতীক। নলিনীকান্ত তাঁর প্রাণ প্রিয়াকে কি চোখে দেখতেন তাঁর বাণীই তাঁর সাক্ষ্য- "প্রেমময়ি! তোমায় প্রেম প্লাবনের পলি পড়িয়াই না এ উষর হৃদি সরস হইয়াছে। তাঁর চোখে শুধাংশু বালা তো সামান্য একটি মানবী মাত্র নন, ছিলেন ব্রহ্মময়ীর একরূপ। প্রায় গান গেয়ে জানাতেন,

Dhaka University Institutional Repository

'করুণা করিয়া প্রেমে ভাসাইয়া পরাণ গলায়ে যাও।"[২] মাতা ঠাকুরাণী ছিলেন বাইরে শুধাংশু বালা ভিতরে জগৎজননী স্বরূপা। নলিনীকান্তের প্রতি তাঁর অনন্য প্রেমে কি যে মধুরারতির প্রকাশ পেত তা সাধারণের জ্ঞানাতীত। নলিনীকান্ত তাই একদা ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিয়ে প্রার্থনা জানালেন, 'আমাকে ভালবাসতে শিখাও।' ঠাকুর নিগমানন্দ পরবর্তী জীবনে স্বীকার করেন– 'এমন বুকভরা ভালবাসা আমি জীবনে কোনদিন পাইনি। বাল্যকালে মা মারা গেছেন। স্নেহ, মমতা কি জিনিষ জানতাম না। আজ তোমাকে পেয়ে জীবন আমার ধন্য হল।'[৩] প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন ধারায় সুখ চিরদিন এক রকম থাকেনা। নলিনীকান্তের জীবনেও ঘটলো সেই নিরানন্দের বেলাভূমি।

নারায়ণপুর রাণী রাসমণির স্টেট। বর্তমানে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর স্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিম দুই মাইল দূরে তিনি সেটেলম্যান্ট কাজের পরিদর্শক পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। কিংবদন্তি আছে কেউ বলেন, এখানেই ঠাকুর তাঁর স্ত্রীর ছায়ামূর্তির দর্শন করেন, কেউ বলেন, কলিকাতার রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্রী কৃষ্ণ প্রমদা দাসীর স্টেটের দাঁতিয়া পরগণার সুপার ভাইজার নিযুক্ত কালীন কলিকাতার এষ্টেটের ভাড়া বাড়ীতে অফিসিয়াল কর্মকালীন তাঁর স্ত্রীর ছায়ামূর্তির দর্শন পান। আরও কিংবদন্তি আছে কেউ বলেন তাঁর একটি মৃত কন্যা সন্তান হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী সূতিকায় আক্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে স্বামী দর্শনের তীব্র প্রত্যাশার কারণেই মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে দেখা দেন। কেউ বলেন সন্তানাদি হয়নি। কেউ বলেন, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা হয়েছিল। কেউ বলেন দেখা হয়নি। যদিও ঠাকুরের বাণী আছে, 'জীবন কাহিনী বলতে এই রকম হওয়া উচিত। শুধু কতকগুলি কীর্তি কলাপ লিখলেই জীবনী লেখা হয়না।'[৪] কিন্তু আমাদের মত পাঠকরা মহাপুরুষের জাগতিক জীবন ইতিহাসও জানতে চায়। তাঁরা যাকে তুচ্ছ খুঁটিনাঠি বলে উড়িয়ে দেন, আমরা তা থেকেও রস পাই। তাই আমাদের পক্ষে ঠাকুর মহারাজ সম্পর্কে যেখানে যা পাই তাই খুঁটে খুঁটে যোগাড় করাই

২। শ্রী নিগমানন্দদেব, প্রেমিক গুরু, কোকিলামুখ, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ১৪ শ সংস্করণ ১৪১১ সাল, পৃষ্ঠা নং -০২ ।

৩। সত্য চৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য, শ্রী শ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী, কোকিলা মুখ, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হতে প্রকাশিত নবম সংস্করণ ১৪০২, পৃষ্ঠা- ১২

৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ২২

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিক। সম্ভব হলে বিভিন্ন লেখকের লেখা মিলিয়ে তুলনামূলক আলোচনাতেও সত্য নির্ণয়ে তৎপর থাকি।

নলিনী একমনে এক ধ্যানে অফিসিয়াল কাগজপত্র দেখছেন। রাত্রি প্রায় ৯/১০ টা, টেবিলে মৃদু প্রদীপ জ্বলছে। হঠাৎ মিটি মিটি প্রদীপটি উজ্জ্বল হয়ে সমস্ত ঘরখানাকে আলোকিত করে তুলল। নলিনীকান্ত তাকিয়ে দেখেন দুঃখ ভারাক্রান্ত শুধাংশু অর্থাৎ তাঁর আদরের রাণী তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন অপলোক নয়নে। নলিনীকান্ত অবাক বিস্ময়ে ভাবছেন এ কী করে সম্ভব? এই মাত্র কয়েকদিন আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ীতে তাঁকে রেখে এলাম। অথচ এই সময় একা এখানে আসা এটি কী করে সম্ভব? নলিনী তাঁকে প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানতে চাইলেন কিন্তু শুধাংশু বালা কোন উত্তর না দিয়ে শুধু ব্যথাভরা হৃদয়ে করুণ দৃষ্টিতে এক মমতাময়ীর তীব্র আকর্ষণ নিয়ে তাকিয়েই থাকলেন। নলিনীকান্ত এই দৃশ্যের অবসান ঘটানোর জন্য যখনেই তাঁকে ধরতে গেলেন তখনেই তিনি নিমিষেই বাষ্পের মত উড়ে গেলেন। এই অশরীরী মূর্তি দেখে ভয়ে নলিনী কান্তের গা ছম্ ছম্ করতে লাগলো। তিনি ভয়ে চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। চাকর-বাকরগণ তাঁকে সুস্থ্য করে তুললেন। ভূতপ্রেত ভয়হীন প্রতিবাদী নলিনীও জন্মান্তরীণ সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। পরদিন সকালে টেলিগ্রাম আসলো– 'তোমার স্ত্রী মৃত্যু শয্যায়, শীঘ্র বাড়ী চলে আস।' কাল বিলম্ব না করে নলিনী বেরিয়ে পড়লেন গৃহাভিমুখে, আর নানান চিন্তায় তিনি ঘুরপাক খেতে লাগলেন।

বলে রাখা ভাল, নলিনী ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী, যুক্তিতর্কে যতক্ষণ সমাধান না পেতেন ততক্ষণ তিনি নির্বিচারে অন্ধবিশ্বাসে কোন কিছু মেনে নিতেন না। অলৌকিকত্ব তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু ভাবতে গিয়ে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন, মানুষ যদি মরে যায় তবে তার সকল কিছু শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মৃত মানুষ কি করে জীবন্ত রূপ ধারণ করতে সক্ষম? শুধাংশু কি মরে গিয়ে আমাকে দেখা দিতে এসেছিল? না-না-এ কী করে সম্ভব? যদি বেঁচেই থাকে তবে এ সময় তাঁর রোগ শয্যায় শায়িত থাকার কথা। কিন্তু মৃত মানুষটি আমার সামনে হাজির হল কিভাবে? না– আমি যা দেখেছি তা

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রম-দৃষ্টি। পাশ্চাত্য দর্শনে মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন, বেশীক্ষণ একজনকে চিন্তা করলে তার ভাবময় মূর্তি দর্শন হয়। আমি তো অফিসিয়াল চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম, তার চিন্তা তো করিনি। যেই হোক, কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় নলিনী বাড়ীর কাছে ভৈরব নদীর তীরে পৌছলেন। সদ্য কোন মৃত অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে কি না চারিদিকে উৎসুক নয়নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। কাছেই একজন পরিচিতাকে পেয়ে জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রী গতকাল সন্ধ্যার পূর্বে মারা গেছেন।

এই স্ত্রী-মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই নলিনীর জীবনে নিল এক নূতন মোড়। যেভাবে সেদিন সেই ছায়ামুর্তির দেখা পেয়েছিলেন, তার থেকেও অধিক বাস্তব রূপে তিনি আরও তিন তিন বার তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভ ও বাক্য বিনিময় করেন এবং নূতন জীবন গঠনের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। পাশ্চাত্য দর্শন ও আধুনিক পন্ডিতদের কাছে থেকে তিনি এতদিন যা জেনে জীবন গঠন করেছিলেন কিন্তু বর্তমান সত্য তাঁকে যে নূতন দর্শন দেখালো তা কিছুতেই কোন যুক্তিতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চললো কিছুদিন ধরে। শুধাংশু বালা তাঁকে পুনঃ বিয়ে করতে বাধা দিয়েছিলেন বলেই তাঁর পুনঃ বিবাহে পিতার চেষ্টা বৃথা হয়। তিনি বর্তমান চাকুরী স্থল বদলি করে অন্যত্র অন্য স্টেটে চাকুরী গ্রহণ করেন। যশোর কুমিরায় একদা এক রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে তিনি দিব্য জ্যোতিপূর্ণ আজানুলম্বিত দীর্ঘকায় শশ্রুমন্ডিত এক মহামানবের সাক্ষাত প্রাপ্ত হন। তাঁর দিব্য জ্যোতিপূর্ণ আলোচ্ছোটায় সমস্ত ঘরখানি আলোকিত হয়ে ওঠে। একবার মাত্র নলিনী তাঁর দিকে তাকান। এই অবসরে মহাপুরুষ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'তুমি যাকে খুঁজছো এই নাও তাঁর মন্ত্র।' 'মন্ত্র' বিষয়ে আধুনিক দার্শনিকদের মতবাদ এখানে তুলে না ধরলে বিষয়টি আধুনিক সমাজে অস্পষ্ট হয়ে থাকবে বলেই– মন্ত্র কী? আলোচনার প্রেক্ষাপট অবতারণা করা হল।

মন্ত্র মানে ফুক্, ফাক্ বা তুক্, তাক্ এই বিষয়ে বর্তমান চিন্তাবিদ্গণ এর যতসব ঘটনাকে কেন্দ্র করেও এ বিষয়ে রচিত রচনাকে গাঁজাখুরি, 'আষাঢ়ে গল্প' বলে উল্লেখ করেন। ছেলে মেয়েদেরকে ভুলানোর জন্য দাদু দিদিমাদের এসব গল্প বলা বলেও চিন্তাবিদ্গণ উল্লেখ করেন।ঠাকুর

Dhaka University Institutional Repository

নিগমানন্দের মনেও এই মন্ত্র নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা জাগ্রত হয়। কারণ তিনিও কম বাস্তববাদী ছিলেন না। মন্ত্র সম্বন্ধে তাই এখানে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য তুলে ধরা হল।

> মন্ত্র হল– একটি ধ্বনি বা শক্তি। শুধুমাত্র অক্ষর নয়। মন্ত্র হল , এক প্রকার পবিত্র শব্দ বা বাক্য, যা ধ্বনির ভিতর দিয়ে শব্দের অর্থ-কে মনের গভীরে নিয়ে যায়। এবং যা উচ্চারণ করলে দেবতার উপাসনা করা বুঝায়, মনন করলে ত্রাণ পাওয়া যায়; মারণ, উচাটন ও বশীকরণাদি ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়। মন্ত্রশক্তি এই লক্ষ্যেই বৈদিক সাহিত্যের অংশ রূপে পরিচয় লাভ করে। কোন পন্ডিত অস্বীকার করতে পারবেন কি, ধ্বনি বা শব্দের সাথে ক্রিয়ার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই? সাধারণের আর একটি বক্তব্য আছে, অর্থবোধ না হলে কোন শব্দোচ্চারণ দ্বারা কোন ফল লাভ হতে পারে না। প্রমাণ– তোতাপাখির মত রাম রাম উচ্চারণে কোন ফল লাভ হয় কি? আমরা এর বিপরীতে বলতে চাই, বাদ্যের তাল, সঙ্গীতের রাগ-রাগিনী, কাম-ক্রোধ-হর্ষ শোকাদিব্যঞ্জক ধ্বনি শ্রবণ করলে প্রত্যেকের দেহমনে কেন ক্রিয়া হয়? অথচ এসব ধ্বনির অধিকাংশই অর্থশূন্য। অতএব স্বীকৃত এই হয় না কি, ধ্বনি মাত্রই ক্রিয়ার প্রভাব আছে? আর এই ধ্বনির সাথে যদি ভাব ও অর্থের যোগ হয় তবে তো কথাই নেই, ফল অবশ্যম্ভাবী।[৫]

বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ Nervous System(স্নায়ু তন্ত্র) আবিষ্কার করে উল্লিখিত তথ্যকে পক্ষান্তরে স্বীকার করেছেন। একটি শব্দাঘাতে শিশু কাঁদে আবার একটি শব্দঘাতে শিশু হাসে। এটি কিভাবে সম্ভব? জ্ঞানহীন একটি শিশুর অন্তর ভয়, আনন্দ শব্দ কি করে বুঝে? মস্তিকে পিটুটারী গ্লান্ডে এই সকল কোষগুলি অবস্থিত থাকে বলেই Sensory Nerve এ আঘাত করা মাত্র Motor Nerve

---

৫। পূর্বোক্ত, পরমহংস শ্রী শ্রী নিগমানন্দ দেব, পৃষ্ঠা -১২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা এই কার্য সম্পাদিত হয়। সনাতন ধর্ম শাস্ত্র এখানেই জন্মান্তরীণ সংস্কারের রেস খুঁজে পায়।[৬]

অর্থাৎ তাঁর বহুবার জন্ম হয়েছিল বলেই এই ভয়, আনন্দ তার স্মৃতিতে অন্তলীন ছিল। এছাড়াও ওঝারা ঝাড় ফুক্ দ্বারা রোগমুক্ত করে, সাপুড়েরা মন্ত্র প্রয়োগ করে সর্পের বিষ ঝাড়ে। বর্তমান চিন্তাবিদ্ ও চিকিৎসাবিদ্গণ এটি স্বীকার করেন না, বরং হেসে উড়িয়ে দেন। আসলে বিষয়টি হল, ধ্বনি বা শব্দের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ মাধ্যমেই, যে এটি সম্ভব হয় তা স্বীকার না করা। যেহেতু রোগ প্রকৃত মন ভোগ করে দেহ তার উপাদান মাত্র। দেহে এর বাস্তবতা দেখতে পাই বলেই মনে করি ঔষধেই দেহের রোগটি সারাচ্ছে। তাই যদি হয় তবে মনোরোগীদের চিকিৎসকগণ ঔষেধের চেয়ে মনের উপর চিকিৎসা দেন বেশি কেন? হয়তো বলবেন, মনের রোগের জন্য মনের চিকিৎসা। যদি প্রশ্ন করা হয়- সেবা, বিশ্রাম, স্নেহ, আদর, ভালবাসা চিকিৎসায় এগুলির কেন প্রয়োজন হয়? এগুলিরও উত্তরে হয়তো বলবেন, মানুষের প্রয়োজনে যেহেতু মানুষ, অতএব তার সেবা সহানুভূতি লাগবেই। বস্তুবাদীগণ এভাবেই সব মতামতকে উড়িয়ে দিয়ে নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন।

বস্তুবিজ্ঞানীগণ এটি মানতে চান না যে, প্রতি জীবের মাঝে আত্মারূপ চৈতন্য আছে বলেই বিশ্বের সকল দ্রব্য, সকল বস্তু, ক্রিয়াশীল হয়। আত্মারূপ চৈতন্য বা চেতনা না থাকলে যেমন প্রাণ থাকবেনা, প্রাণ না থাকলে তদ্রূপ দেহে যে কোন শক্তিশালী দ্রব্যগুণেরও ক্রিয়া হবেনা এটি একটি জীবন্ত সত্য উক্তি। মন্ত্র শক্তিও জ্ঞাত অজ্ঞাত ঠিক এই শক্তি পদ্ধতিতেই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। মন্ত্রগুলি প্রাণ-শক্তির বীজ বলেই আত্মশক্তিতে এর রূপান্তর দেহমনে ঘটে, তার ফলেই আজও বিষধর সর্পের বিষ বশীভূত হতে দেখা যায়। যেমন বেদের বীজ 'ওঁ' মন্ত্র ঋষিদের ধ্যান নয়নে জাগ্রত হয়ে হৃদয়-তন্দ্রীতে স্পন্দিত হয়ে ফুটে উঠে বলেই বেদে মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়েছে এবং আজও ক্রিয়াশীল হয়ে ফুটে উঠে সাধকের জীবনে। নলিনীকান্তের জীবনে এই মন্ত্র প্রাপ্তি তারই

৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিল এবারে। বিশেষত্বটি হল, শব্দটি আগে আত্মনির্ভর হয়ে উঠে বলেই দেহে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। মৃত দেহে যে কোন ঔষধ কেন ক্রিয়াশীল হয় না, এ তারই উত্তম প্রমাণ নয় কি? ধ্বনির সাথে মনের, মনের সাথে বুদ্ধির, বুদ্ধির সাথে প্রাণের এবং প্রাণের সাথে আত্মার সম্বন্ধ আছে বলেই শব্দ বা বস্তুর গতি ও স্পন্দন ক্রিয়া দেহমনে স্বাভাবিক প্রকাশ দেখতে পাই। একটি স্থূল জীবন কিভাবে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করতে সক্ষম নলিনীকান্তের জীবনবেদ থেকে এবার এইভাবে পর্যায়ক্রমে আমরা মর্ম উপলব্ধি করবো।

অধ্যাত্মজীবন

পূর্ব কথায় ফিরে আসি– বিল্বপত্রে রক্ত চন্দনে লিখা জ্যোতির্ময় সেই মহাপুরষের উক্ত একাক্ষরী মন্ত্রটি তাঁর হাতে দিয়েই তিনি অন্তর্হিত হন। বিস্ময়াবিষ্ট ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন নলিনী বাস্তব সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ভাবতে লাগলেন, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ অথচ এই লোকটি কী করে ঘরে প্রবেশ করলো। তাঁর বিচারী মন আবার বলতে লাগলো, নিশ্চই এ ভ্রমদৃষ্টি স্বপ্ন মাত্র।কিন্তু রক্ত চন্দনে লিখা তাজা এই বিল্বপত্রের একাক্ষরী মন্ত্রটি আমার হাতে কি করে আসলো? নলিনী দিশেহারা হয়ে চাকুরী বাকুরী পরিত্যাগ করে সিদ্ধান্ত নিলেন 'হয় মন্ত্রের সাধন, নয় শরীর পাতন।' মন্ত্রের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তিনি ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। প্রিয়তমাকে স্বশরীরে ফিরে পাবার আশায় তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন। প্রথমে বাস্তবতাকেই গ্রহণ করলেন। মাদ্রাজে "থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে" যোগদান করলেন। ড. এ্যানি বেসান্ত, ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি, কর্ণেল অলকট্ ও ডাঃ সেনেট প্রভৃতি মনীষীদের সান্নিধ্যে এলেন। তাঁদের কথামত প্রেতাত্মাকে নিয়ে আসার কৌশল ও পদ্ধতি এক মাস ধরে শিখলেন। অবশেষে এক শুভদিনে তাঁর পত্নীর আত্মাকে এক মিডিয়া মাধ্যমে আকর্ষণ করে এনে কথা বললেন। সত্যিকার তাঁর স্ত্রী কি না প্রমাণের জন্য তাঁর স্ত্রী তাঁকে যে গানটি গোপনে শুনাতেন তা শুনতে চাইলেন। অবিকল সেই কণ্ঠে, সেই সুর, ছন্দ, লয় ও তালে গানটি শুনে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। এ থেকে তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল, অবশ্যই তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীকে তিনি ফিরে পাবেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকও যখন প্রেতাত্মা স্বীকার করেন এবং প্রেতাত্মার সাথে কথা বলতে পারেন তখন অলৌকিক ভৌতিক বলে উপহাস করি কী করে? এর পরেই কলিকাতায় স্বামী পুর্ণানন্দজীর সাক্ষাতে তিনি জানতে পারলেন যে, মহামায়ার সাধনা করলেই এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। সময় হলেই এর উপযুক্ত গুরুও তিনি পাবেন। গুরু খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে বস্তুবাদী নলিনী নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে শরীরের যত্ন ভুলে গেলেন। কিন্তু কোথাও উক্ত প্রাপ্ত মন্ত্রের উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেলেন না। অবশেষে মৃত্যু সংকল্প দৃঢ় করে গঙ্গায় ঝাপ দিয়ে জীবন বির্সজনের সিদ্ধান্ত নিলেন। হরিদ্বার লোছমন-ঝলার উঁচু পাহাড় থেকে তিনি গঙ্গায় ঝাপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করবেন। সেদিন কিন্তু মনের কোনে উঁকি দিয়েছিল স্বামী পূর্ণানন্দজীর ভবিষ্যৎ বাণী। কন্যা, জায়া, জননী ও বিশ্বজননী একই তত্ত্ব। সময়ে সব জানতে পারবে। যথা সময়ে গুরু পাবে এবং গুরু নির্দেশে সবিষয় তত্ত্ব জানতে পারবে। এই শেষ ভরসাটুকুও আজ শেষ হবার পথে। অবশেষে মৃত্যুই স্থির হল। গঙ্গার তীরে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ রাত্রিতে দেখলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর শির স্বীয় ক্রোড়ে নিয়ে বসে আছেন। ব্রাহ্মণের স্পর্শে তাঁর সমস্ত শ্রান্তি, ক্লান্তি দূর হয়েছে বোধ হল, শরীর মন আনন্দে নেচে উঠছে, তাঁর স্পর্শে পিতৃ-মাতৃ স্নেহ মমতা যেন উথলে উঠছে। মনে হয়েছিল একবার, এই অকৃত্রিম স্নেহ, ভালবাসা ও দয়া হয়তো জীবনে আর কোন দিন পাবো কি না জানিনা। পিতৃতুল্য ব্রাহ্মণ তাকে বাংলায় নিজের ঘরে ফিরে যেতে বললেন এবং কলিকাতার বীরভূম জেলার তারাপীঠে অবস্থানরত গুরু বামাখ্যাপার সাথে দেখা করতে বললেন এবং তার মনষ্কামনা সিদ্ধ হবে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মৃত্যু সংকল্প ত্যাগ করে নলিনী সুদূর উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করে বাংলায় ছুটে চললেন– জাগ্রত কৌল প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরু বামাখ্যাপার কাছে। দূর থেকে বালকটিকে তারাপীঠে আসতে দেখেই বামা মন্দিরে মায়ের সঙ্গে কথা বলে সব জেনে নিলেন। এখানে আসার তার উদ্দেশ্য কী? নলিনী বামার কাছে এলেই বামা স্নেহ, আদর পূর্বক কাছে বসিয়ে বললেন, বাবা, তোমার জীবন ধন্য। মায়ের

Dhaka University Institutional Repository

আশীর্বাদে তুমি যে তারা মন্ত্র পেয়েছ, তা সিদ্ধ মন্ত্র। অবিশ্বাস করে ভুল বুঝনা। মায়ের কৃপায় অতি শীঘ্র তোমার মাতৃ দর্শন হবে। আমি তোমাকে মায়ের সাক্ষাত করিয়ে দিব, তাঁর কাছেই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। তোমার প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্তি হবে। তোমার মত শিষ্য পেয়ে আমি ধন্য হলাম।

তান্ত্রিক গুরু লাভ

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক শুভদিনে নলিনীকান্ত গুরু কৃপায় রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আরাধ্য মন্ত্রের ইষ্টদেবীর দর্শন লাভ করলেন। দেবী দর্শন দান করলেন তাঁরই মনোময়ী মূর্তি শুধাংশুবালা মূর্তিতে।

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা ভাল, নলিনীকান্ত যে একাক্ষরী বীজ মন্ত্রটি পেয়েছিলেন তা বধুবীজ 'স্ত্রীং'। অর্থাৎ দেবীকে স্ত্রীরূপে দর্শন লাভ। যা আর কোন সাধকের জীবনে ঘটেছে কি না জানি না। শ্বশুর ভুবন মোহন একারণেই বলেছিলেন, 'মা আমার আর কেউ নয় সাক্ষাৎ জগদম্বা। মাকে অনেক পূজা করেছি তো, তাই ঘরে এসেছে।' নলিনীও তার 'শুধাংশুবালা' উপন্যাসে বিবৃতি দিয়েছিলেন, "এই যে প্রতিমাখানি একবার যে দেখিয়াছে সে আর ভুলিতে পারে নাই। যে ব্যক্তি যেরূপ অবস্থায় এ মূর্তি দেখিয়াছেন তিনি ঠিক সেই ভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিমেষশূন্য হইয়া নয়ন দুইটি ওই মূর্তির উপর রাখিয়াছেন। চক্ষু ফিরাইয়া লইতে হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন পর্বত দুহিতা কৈলাস ছাড়িয়া এই বাটিতে আসিয়া রহিয়াছেন।"[৭]

তাঁর অতীত ব্রহ্মানন্দগিরি জীবন এবং বর্তমানের এই ভালবাসার টানেই নলিনী জগদম্বাকে স্ত্রী রূপে দর্শন করলেন। প্রকৃত পুরুষ না হলে মহাপ্রকৃতি কখনও স্ত্রীরূপ ধরেন না। এটাই হল সনাতন হিন্দু-ধর্ম-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রে পড়েছি, যিনি মহামায়া-জগৎজননী, তিনিই শিবের পত্নী হয়েও শিবের জননী। এই মহামায়াই জায়া, জননী ও কন্যা এই ত্রিমূর্তিতে জগতে প্রকাশিতা।

৭। শ্রী নারায়ণী দেবী, **বাংলার সাধনা ও শ্রীনিগমানন্দদেব**, কলিকাতা, সাধনা প্রেস, তৃতীয় প্রকাশ ১৪০৩, পৃষ্ঠা-১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র শিবকল্পপুরুষের কাছেই এই মহামায়া পত্নীরূপে প্রকাশিত হন। এই মহামায়াই ঠাকুর নিগমানন্দকে নিগমানন্দ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জন্মান্তীণ রহস্য এর একটি অন্যতম কারণ। পূর্বজন্মে ব্রাহ্মানন্দগিরির (নিগমানন্দের) জীবনে এ মহাযোগ সংস্থাপিত হয়েছিল বলেই এবারে ঠাকুরের যোগমায়াকে স্ত্রী রূপে লাভ। শাস্ত্রে আরও বলা আছে, গুরুবাদ, অবতারবাদ, ঈশ্বরবাদ ও জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্ম দর্শন স্বীকার করে বলেই প্রারব্ধ সংস্কার এখানে এই ফল প্রসব করেছে। নলিনীকান্তের উত্তর জীবন যে ব্রহ্মানন্দ গিরির সাধন-সিদ্ধ-জীবন তারই প্রমাণ রূপে এখানে এবার উক্ত ফল প্রসব করেছে।

> জগদীশ্বরী বাম পদ সাধকের মস্তকে স্পর্শ করে বর প্রার্থনা করতে বললেন, তুমি এই মূর্তি ভালবাস বলেই আমি তোমার মনোময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছি। নলিনীকান্ত বর প্রার্থনার পূর্বে এই রহস্য জানতে চাইলেন, জায়া কি করে জননী হতে পারে? এবং তুমি যে জগৎ জননী তোমার স্বরূপ আমাকে দেখাও। দেবী অগ্রে তাঁকে বর চাইতে বললেন, নলিনী বললেন, 'তোমাকে আজ যে ভাবে যে রূপে দেখতে পাচ্ছি ইচ্ছে মাত্র যেন তৎক্ষণাৎ সে রূপে দেখি।' দেবী 'তথাস্তু'– তাই হবে। এবার আমার স্বরূপ দর্শন কর। প্রথমে দেবী তাঁর মাতৃ পরিচয় স্বরূপ– তিনি কে, কি তাঁর পরিচয় এসব তথ্য অগ্রে বিস্তারিত জানালেন নলিনী তাঁর তত্ত্বরূপ দর্শনে এবার উন্মুখ হলে দেবী সেই মুহূর্তে এক অলৌকিক কান্ড ঘটালেন। সাধক দেখলেন, তাঁর প্রতি লোমকূপ হতে বাষ্পের ন্যায় এক প্রকার তরল জ্যোতি নির্গত হয়ে জগৎ আচ্ছন্ন করছে। আবার সেই তরল জ্যোতি বাইরে কেন্দ্রীভূত বা পুঞ্জীকৃত হয়ে বিদ্যুতের ন্যায় আভাশালী ও কোটি সূর্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত এবং কোটি চন্দ্র তুল্য সুশীতল উপলব্ধিহতে লাগল। এই পরম তেজোরাশি উর্ধ্ব, পার্শ্ব বা মধ্যদেশে পরিচ্ছিন্ন হল না। এ আদি-অন্ত রহিত। এই জ্যোতিরাশির হস্তপদাদি অঙ্গ বিশিষ্ট স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক আকারও নেই। নলিনী এই তেজের প্রভায় প্রতিহত হয়ে নেত্র নিমীলন করলেন। অতঃপর যেমন দৃষ্টিপাত করলেন ওমনি সেই পরম তেজ দিব্য মনোহর রমণী

Dhaka University Institutional Repository

মূর্তিতে আভাসিত হল। তখন তিনি সর্বশৃঙ্গার বেশধারিণী, সর্বকামদ্রপ্রদায়িনী, নিখিল-জন-জননী, ভুবন মনোমোহিনী, ব্রহ্মজ্ঞান-বিনোদিনী, স্মেরাননী অকপট করুণাময়ী মূর্তি দেবীকে সম্মুখে দেখে কোন কথা বলতে পারলেন না, পরিশেষে আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'কে মা আপনি?' মা বললেন, আমি তোমারই সাধনকৃত মন্ত্রের আরাধ্যদেবী। অতঃপর নলিনী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বামা তাঁকে কোলে করে মন্দিরে নিয়ে গেলেন।[৮]

তন্ত্র সাধানায় সিদ্ধ নলিনীকান্তর জীবন ধীরে ধীরে শুধারূপী (স্ত্রী) মহামায়ার কৃপায় কিভাবে পরিবর্তিত হতে লাগলো, এখন আমাদের এটিই আলোচ্য বিষয়। একদিন নলিনীর স্মরণ হল, যখনেই তাঁকে স্মরণ করবো তখনি তিনি দেখা দিবেন, প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। তাই পরীক্ষামূলক স্মরণ করা মাত্র আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। দেখা গেল, নলিনীকান্তের ভিতর থেকেই এক তরল জ্যোতি বের হয়ে বৃত্তাকারে পরিণত হয়ে তাঁরই মনোময়ী স্ত্রীর রূপ ধারণ করে। দেবীকে অতি কাছের মানুষ হিসেবে পেয়ে নলিনী নিজেকে ধন্য মনে করলেন। অনেক কথা হল কিন্তু যখনই তাকে ধরতে গেলেন তখনি পূর্ব নিয়মে তাঁরই দেহে মিলে গেলেন। এই পাওয়া না পাওয়ার বেদনা ও অতৃপ্তি তাঁর দিন দিন বাড়তে লাগলো। দেখতে চাইলে দেখা পাই কিন্তু ধরতে চাইলে আমারই দেহের ভিতর থেকে বের হয়ে আমারই দেহের ভিতরে হারিয়ে যায়। নলিনীর কষ্টে প্রাণ ফাটে। প্রশ্ন জাগলো, তাহলে 'কোহং'। আমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য নলিনীকে বৈদিক সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের আদেশ জানালেন দেবী ।

সন্ন্যাস গুরু সচ্চিদানন্দ পরমহংসকে লাভ

শুরু হল, সন্ন্যাস গুরুর অনুসন্ধান। খুঁজতে খুঁজতে এলেন পুস্কর তীর্থে (রাজপুতনা)। কাছেই একজন বৈদান্তিক সাধু বেদান্ত বক্তৃতা দিবেন জানতে পারলেন। নলিনীকান্তের ইচ্ছা নেই কোন সাধুর কাছে যাওয়ার। কিন্তু যে বাড়িতে উঠেছিলেন সেই বাড়ির গৃহকর্তা নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁকে উক্ত ধর্ম সভায় নিয়ে গেলেন। বহু ধর্ম পিপাসু শ্রোত্রীর সামনে তিনি এক উঁচু মাচায় বসে বেদান্ত বক্তৃতা

৮। পূর্বোক্ত, শ্রী শ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী, পৃ. ১১,১২

Dhaka University Institutional Repository

দিচ্ছিলেন। তাঁকে দেখা মাত্র নলিনীকান্ত জনতার ভিড় অতিক্রম করে সেই বেদান্তবিদ্ -এর পায়ে পড়লেন। স্পষ্ট জানালেন, আপনি আমাকে যশোরে কুমিরায় একাক্ষরী মন্ত্র দান করেছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে আপনি সেই ব্যক্তি। আমি আপনার শরণাপন্ন। আপনি আমার তৃষিত তাপিত প্রাণে শান্তি বারি দান করুণ। আমাকে অনুগ্রহ করে আশ্রয় দান করুণ। বৈদিক সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দজী তাঁকে নানা ভাবে তিরস্কার করলেন। বাঙালী মহলিখোর বলে তাকে গালাগালি উপহাস ও উপেক্ষা করলেন। কিন্তু নলিনীকান্ত নাছোড়বান্দা, কিছুতেই তাঁর পাছ ছাড়লেন না। অবশেষে তিনি তাঁকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। শিষ্য রূপে গ্রহণ করলেন।

বলে রাখা ভাল, সন্ন্যাস অর্থ সম্যক্ উপায়ে ন্যাস। যত প্রকার ভোগ বাসনা ও ইন্দ্রিয়গত প্রবৃত্তি আছে সকল কিছু ত্যাগ করার নামই সন্ন্যাস। নিষ্কাম নিঃস্বার্থবান হওয়াই সন্ন্যাসের সাধনা। আত্মজ্ঞান লাভ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করাই হল সন্ন্যাস জীবন। পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই সন্ন্যাসীর জীবন দর্শন। গুরুর কাজ হল শিষ্যকে সংস্কার মুক্ত করা। এজন্য গুরু দিনের পর দিন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে তাঁর আত্মপরীক্ষা নিতে শুরু করলেন। সমস্ত স্নেহ- মায়া-মমতা বর্জিত হয়ে তাকে অবহেলা উপেক্ষা তাচ্ছিল্য করা, এমনকি গুরু তাঁকে চিমটা দিয়ে আঘাত পর্যন্ত করেছিলেন। কঠোর বিধি নিষেধের অনুশাসনে জর্জরিত ছাড়াও আত্মমর্যাদায় আঘাত করা থেকেও তিনি বিরত থাকেন নি। নলিনীকান্ত তিন বৎসর অম্লান বদনে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে যখন খাঁটি সোনা হলেন, তখনেই গুরু কৃপা লাভ করলেন। গুরু তাঁকে সংস্কার মুক্ত জেনে সন্ন্যাস দান করবেন বলে ঘোষণা দিলেন। নলিনীকান্তের নব জীবন লাভ হবে, খুশিতে তাঁর বুক ভরে গেল। এক শুভ দিনে শুভক্ষণে নলিনীর সন্ন্যাস দীক্ষা হল। জন্ম-রাশিগত সংস্কৃত নলিনী নামের পরিবর্তে গুরু এবার নাম রাখলেন 'নিগমানন্দ'। আজ থেকে তোমার পরিচয় 'নিগম', অর্থাৎ– বেদ বা জ্ঞান। অর্থাৎ নিজের জীবনে জ্ঞানালো ফুটিয়ে অপরের জীবনকেও আলোকিত করণ। এই আনন্দ লাভই হল নিগমানন্দ নামকরণ। তুমি নিজেকে জানতে চেয়েছিলে 'আমি কে'? এই নিগম বা জ্ঞানই তুমি। আর

Dhaka University Institutional Repository

এই জ্ঞান লাভ করে যে প্রেম বা আনন্দে অভিভূত হবে সেই তোমার স্বরূপ নিগমানন্দ জীবন ও দর্শন।

নিগমানন্দ জগৎগুরু শংকরাচার্যের চারিধামের মহাবাক্যবোধ ও মাহাত্ম্য বিচারের জন্য আপাত গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে চারি তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন, প্রাপ্ত পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা পরিমোক্ষণের হেতু খুঁজতে। কিন্তু চারিধাম ঘুরার পর বেদের চারি মহাবাক্যের অনুভূতি কী? দাবানলের মত তাঁর অন্তর উদ্দীপ্ত করে কে যেন বলে উঠলো– ব্রহ্মকে জেনেছ জ্ঞানে কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁকে দেখেছ কী? মরমিয়াগণের উপদেশ আছে 'যাহা আছে তোমার দেহভান্ডে তাহা আছে তোমার ব্রহ্মান্ডে'। ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবানের অপরোক্ষ দর্শনের জন্য নিগমানন্দ এবার অধীর হলেন। শ্রীনিগমানন্দের অবর ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান পাকা হলেও ব্রহ্ম যে 'সর্বম্খলিদং'এবং 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা', এই প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান বাস্তবে সর্বক্ষণ স্থির না থাকার জন্য তিনি বড় মনঃকষ্ট বোধ করতে লাগলেন। অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া ব্রহ্ম আত্মার মিলন যে সম্ভব নয় তা তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বুঝলেন। 'জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ' বা জীব যে ব্রহ্মই, এই বোধে-বোধ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে তিনি গুরু সচ্চিদানন্দজীর নিকট পরাজ্ঞান লাভের জন্য নির্বিকল্প সমাধি প্রার্থনা করলেন। পরম জ্ঞানী ক্রান্তদর্শী গুরু সচ্চিদানন্দজী অন্তযার্মীরূপে তাঁর অন্তর- বাইর দর্শন করে তাঁকে জানালেন, বেদান্তে নির্বিকল্প সমাধি আনা দুঃসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ। তুমি যোগপথ অবলম্বন করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ কর, তোমার পক্ষে এতেই সুবিধা বেশি। গুরু সচ্চিদানন্দ তাঁকে যোগীগুরু অনুসন্ধানের পরামর্শ দিলেন।

যোগীগুরু সুমেরুদাসজীর সাক্ষাৎ

Dhaka University Institutional Repository

আবার শুরু হল মহামায়ার ছলনা ও কঠিন পরীক্ষা। একটির পর একটি অতৃপ্তি তাঁকে প্রলোভিত করতেই লাগলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিগমানন্দের অন্তর বেজে উঠলো– "আর কত দুরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী বলো, কোন পারে ভিরিবে তোমার সোনার তরী।"[৯] শুরু হল যোগী গুরু অনুসন্ধান। পরিপূর্ণ তৃপ্তি ছাড়া নিগমানন্দও নাছোড়বান্দা। প্রবাদ বাক্যে আছে, 'যে যাহা ধায়, সে তাহাই পায়।' পূর্ব জন্মেই যে তাঁর ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী ও সার্বভৌম গুরু হওয়ার সংস্কার বাধা আছে, বাস্তব তো সেই রূপ ধরবেই। গুরু খুঁজতে গিয়ে তাঁকে কত রকমের ভেল্কিবাজ ভন্ড সাধুর হাতে যে পড়তে হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। কত ঠক সাধুর হাতে পড়ে যে নাজেহাল হতে হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। নির্ভিক নিরুদ্বেগ নিরব চিত্ত বলেই তিনি কখনও নিরুৎসাহিত হননি। পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক হিংস্র প্রকান্ড বাঘের সম্মুক্ষীণ হলেন। মৃত্যু এবার নিশ্চিত। আর এটাই ছিল তাঁর জন্য সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের চরম পরীক্ষা। মৃত্যু এখানে কার? দেহের (নিগমানন্দরূপ তাঁর নাম, রূপ ও দেহের) না আত্মার। 'অহংব্রহ্মাস্মি' তাঁর সন্ন্যাস মন্ত্র। অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম'। তাহলে ব্রহ্মের মৃত্যু কিভাবে সম্ভব? ভয়ঙ্কর বিপদের সময়ও তাঁর এই বিচার অনুক্ষণ মনে আলোড়িত হচ্ছিল বলেই বাঘটি কিছুক্ষণ চোখে চোখ রেখে শিশুর মত হয়ে– তাঁর গাত্র জিহবা দ্বারা চেটে গতিরোধ ত্যাগ করে লেজ গুটিয়ে চলে গেল। নিগমানন্দের সন্ন্যাস দীক্ষার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন হল এবং যোগীগুরু লাভে প্রাণ আরও উতলা এবং প্রত্যয় লাভ করল। কেউ বলেন, তিনি জ্ঞানীগুরুর কাছে এই ত্রাটক যোগটি শিখার ফলেই বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি চলে এলেন কোটা অঞ্চল সীমান্তে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে উঁচু পাহাড়ের ছায়ার আচ্ছাদনে, মূহূর্তে তিনি পথ ঘাট হারিয়ে ফেললেন। এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া বা আসার কোন দিকেই কুল কিনারা খুঁজে পেলেন না। সেই গভীর ঘন কালো অন্ধকারে ঢাকা এই অরণ্যে তিনি একটি মাত্র মানুষ আর তাঁকে আক্রমণের জন্য শত শত হিংস্র বন্যপ্রাণী এবং এই সাপদ

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঞ্চয়িতা অন্তর্গত সোনার তরী কাব্য গ্রন্থের নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতা, কলকাতা বিশ্ব ভারতী, , দশম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সংকুল বনভূমি। ভাবতে গিয়ে তাঁর নাড়ীর গতি থেমে যাওয়ার উপক্রম হল। মহামায়ার এই আরোপিত অবস্থাগুলি এক একটি ছায়াচিত্রের তুলনা সমান। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য রূপে দাঁড় করাই হল তাঁর কাজ। সম্ভবকে অসম্ভবে, অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করাই তাঁর কৃতিত্ব। বাস্তবতার চরমে না পৌছা পর্যন্ত তাঁর পরীক্ষার শেষ নেই। যেহেতু আত্মার মৃত্যু নেই তখন নিগমানন্দের নাড়ী থেমে যাবে কেন? তাহলে নিশ্চিই তাঁর আত্মবোধ পূর্ণ হয়নি। মহামায়া এই পরীক্ষা গ্রহণের জন্যই তাঁকে এখানে নিয়ে এসে তাঁর খেলা দেখছিলেন। জীবের চিত্তপটে চরম আঘাত উপস্থিত না করা পর্যন্ত জীবের মিথ্যা সংস্কারগুলি নষ্ট হয় না। এখানে নিগমানন্দের প্রতিও মহামায়ার সেই মহা পরীক্ষাই গ্রহণ। "কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিগমানন্দের সামনে সেই মুহূর্তে নূতন ছায়াচিত্র রূপে অদ্ভূত ভাবে উপস্থিত হল, এক সুন্দরী যুবতী যোগিনী। আদরের সাথে মেয়েটি তাঁর নাম ধরে ডেকে তাকে অবাক ও আশ্বস্ত করে বললেন, আর একটু সামনে এগিয়ে গেলেই একটি কুটির দেখতে পাবে। সেখানে রাত্রি যাপন করে সকাল হলে চলে যেতে পারবে।"[১০] বলেই যোগিনী অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। কুটিরে পৌছেই দেখলেন কুটিরের সামনে আর এক সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে। এই সুন্দরী যোগিনীও তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাঁকে ঘরের ভিতরে আসার আহবান জানালেন। বাইরের উপদ্রব হতে রাত্রিটি তাঁর নির্বিছেস কাটলো বটে কিন্তু একজন যুবক সন্ন্যাসীর সাথে একটি যুবতী নারীর রাত্রি যাপন আর একটি নূতন বিপদের ছায়া ঘনীভূত হয়ে– তাঁর হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করতে লাগল! পরম করুণাময়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর দয়ায় প্রতি শ্রদ্ধা বিগলিত অশ্রু বিসর্জন করে এই সান্তনা লাভ করলেন যে, তিনি যখন এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করেছেন তখন তিনিই সমস্যার সমাধানও করবেন। তার পরেও সারারাত্রি এপাশ ওপাশ করে রাত্রি কাটালেন।

পরদিন যোগনীর কাছে জানতে পারলেন তাঁরা দুই বোন কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছেন। এখানে এসেছেন তারা যোগাভ্যাস করতে। বয়সের কথা জিজ্ঞেস করায় যোগিনী

১০। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী, পৃঃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

জানান, তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। নিগমানন্দ অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হলেন যোগের প্রভাব দেখে। নিগমানন্দ তাঁকে যোগীগুরু করবেন বলে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাঁকে যোগশিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি তাঁকে যা বললেন তার মর্ম কথা এই যে, দেখ! 'যোগঃ চিত্ত নিরোধঃ'। চিত্ত নিরোধ না হলে যোগ হয় না। তোমার মন ও চিত্ত স্থির হয় নি। তোমার চিত্ত এখনও চঞ্চল। গতকাল রাত্রে এই কুটিরে আমি তোমার সাথে থাকায় তুমি সারারাত্রি ঘুমতে পারনি। এখানেই প্রমাণ হয় না কি, নারী তোমার গুরু হতে পারেনা। কারণ নারীর প্রতি তুমি দুর্বল। এক নারীকে পেতেই তুমি আজ এই পথের পথিক সেজেছো। এদিকে আর ঘুরাফিরা না করে তুমি যে দেশের সন্তান সেখানেই ফিরে যাও। আগে কলিকাতা পৌঁছ সেখান থেকেই তোমার যোগীগুরুর সন্ধান পাবে।

> যোগিনী নিগমানন্দের হাতে কিছু টাকা দিয়ে রেল ষ্টেশন দেখিয়ে দিলেন। নিগমানন্দ এগিয়ে চলছেন আর পিছনে তিনি দাঁড়িয়ে বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ফিরে দেখছেন আর তিনি হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছেন। ষ্টেশনে পৌঁছে গাড়ীর খবর ও কলিকাতার ভাড়া যাচাই করে– হাতের মুঠি খুলতেই দেখলেন প্রয়োজনীয় ভাড়াই তাঁর কাছে আছে, এক টাকাও বেশি নেই। বিষয়টি বুঝে আরও আশ্চর্য হলেন। ট্রেন আসার সংবাদ গ্রহণ, মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান– ফিরে তাকাতেই দেখেন মেয়েটি আর নেই। এত তাড়াতাড়ি তার অদৃশ্য হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। তাই কৌতুহলবশতঃ আবার ছুটলেন সেই রাস্তা ধরে– সেই কুটিরে। কিন্তু হায়! কোন কুটির, কোন মেয়ে, কোন বন সেখানে নেই। কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হতে পারে ভেবে কুলাতে পারলেন না। ফিরে আসলেন ষ্টেশনে, চলে এলেন কলিকাতায়।[১১]

১১। পূর্বোক্ত, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী**, পৃঃ ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

কালিঘাটে পৌঁছলে কয়েকজন সাধু সঙ্গী পেয়ে, নিগমানন্দ কামাখ্যা এলেন। অতঃপর পরশুরামতীর্থ। রাস্তায় ভীষণ জ্বর ও আমাশায়ে কাতর হয়ে পড়লেন। সাধুদের সঙ্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সাধুরাও তাঁর খোঁজ খবর না নিয়ে তাঁকে ফেলে চলে গেলেন। কোনভাবে এক পাহাড়ী পল্লীর কাছে গিয়ে পাহাড়ীদের দয়ায় তাদের তৈরিকৃত পাচন খেয়ে– তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ্য হয়ে উঠলেন। তাদের দয়া, সরলতা, পরোপকার ও আতিথেয়তা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। ছেড়ে চলে যাওয়া সাধুদের চেয়ে এই অসভ্য পাহাড়ীদেরকেই প্রকৃত সাধু ভাবতে লাগলেন। তিনি এই হাজং পল্লীতে থাকেন, খান আর সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তন্ময় হয়ে ওঠেন। কত নদ-নদী সুগন্ধি ফুলে ভরা গাছ। নরম সবুজ ঘাস, সুনীল আকাশ। তার মনে বিশ্বস্রষ্টার ছাপ গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো। ঈশ্বরের এই অপরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ রহস্যজনক সৃষ্টির চিন্তায় তিনি ডুবে গেলেন। এর পরেই তিনি ধ্যানের মানসপটে অতীত স্মৃতি ছায়া চিত্রের মত চিত্তপটে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। প্রেয়সীর মধুর প্রেম উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিশ্ব সমুদ্রেরস্রোত তাঁকে টানতে থাকলো নীচের দিকে। হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হলে দেখলেন, যেখানকার মানুষ সেখানেই আছেন। অথচ এতক্ষণ স্পষ্টভাবে তিনি দেখেছেন, যে কুতবপুর বাড়ীতে বিরাজ করছেন। বুঝলেন: মায়ার অসাধ্য কিছু নেই। এখনও তিনি খাঁটি সাধু হতে পারেন নি। তিনি যেখানে বসে এই প্রাকৃতিক শোভায় বিমুগ্ধ হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন তা হাজং পল্লী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। এতক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে স্থানটি। রাস্তা চেনার কোন উপায় নেই। পল্লীতে ফিরে যাওয়ারও কোন পথ না পেয়ে বন্য জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্মুখে প্রকান্ড বট গাছটির উপর এক গভীর গহ্বর দেখে সেখানে জায়গা করে নিলেন। এই স্থানটি ছিল পরশুরামতীর্থের নিকটবর্তি।

সারারাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটালেন। ভোরে বৃক্ষের নীচে তাকিয়ে তিনি দেখেন ধুনির আলোতে ঝলমল হয়ে উঠেছে স্থানটি। ধুনি জ্বালিয়ে এক সাধু আপন মনে গাঁজা ডলছেন, নিগমানন্দ নীচে নেমে সাধুর কাছে বসলেন। নিরুপায় হয়ে গাঁজা খেলেন। অতঃপর সাধুর ইশারায় পিছে পিছে মন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

মুগ্ধের ন্যায় ছুটে চলতে লাগলেন। এই সময় বঙ্কিম চন্দ্রের কপাল কুন্ডলা উপন্যাসের চরিত্রের চিত্রটি নলিনীর মনের মধ্যে ফুটে উঠল। নিশ্চিয়ই ইনি একজন কাপালিক, আমাকে মায়ের চরণে নবকুমারের মত বলিদানের জন্য নিয়ে চলেছেন। ভাবামাত্র নিগমানন্দের গা ছম্ ছম্ করে উঠল। বিশাল লম্বা চওড়া সেই সাধু। গাত্রবর্ণ গলিত-স্বর্ণের মত, সুপ্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত বক্ষপট, দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম ঝুলছে কাঁধের নীচে। আজানুলাম্বিত বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়, আয়ত অপূর্ব চক্ষু উজ্জ্বল ভাস্কর, স্নেহপূর্ণ গোলাপী অধর সুন্দর স্বর্গীয় দীপ্তি সমন্বিত বদন কমল এবং মনোহর অবয়র থেকে ঝরে পড়ছে শিশু সুলভ সরলতা। জীবনে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখেছেন কিন্তু ইনি তার ব্যতিক্রম। এতক্ষণ কোন কথা হয়নি উভয়ের মধ্যে। ইসারায় সব কাজ হয়েছে। এবার সাধু বললেন,

> বৎস! নিগমানন্দ, তুমি আমাকে বৃক্ষের নীচে হঠাৎ বসে থাকতে দেখায় ভয় পেয়েছিলে না? তুমি কে, কেন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কেন এই গাছের উপরে গত রাত কেটেছো। আমি সব জানি। আমিই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি- আমারই যোগবলে। তোমার মনের ইচ্ছা অবশ্য পূরণ হবে।' মহাত্মার মনোমুগ্ধকর উৎসাহব্যঞ্জক বাক্যে প্রগাঢ় ভক্তিজন্মে গেল তাঁর। এই যোগী পুরুষের নাম উদাসীনাচার্য শ্রীমৎ সুমেরুদাসজী। যোগীবর ব্রহ্মানন্দগিরিরূপে তাঁর অতীত জীবন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কথা যখন তাঁর জীবন-জন্ম-কর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁকে খুলে বললেন, নিগমানন্দ তখন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁকে গুরুত্বে বরণ করে তাঁর মনোবাসনা ও সিদ্ধিলাভের কৌশল জানতে চাইলেন এবং তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলেন।[১২]

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, আমাদের মত অজ্ঞান জীব জানেনা কার ভিতর কি অব্যক্ত অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে নিহিত আছে। আত্মা এবং দেহের সংযোগেই জীবন। আমরা মনে করি এই আত্মশক্তি দেহগত ও মনোগত বলেই আমরা সকল কার্যে সিদ্ধিলাভ করি। কিন্তু এই আত্মশক্তি

১২। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী পৃঃ ৩২,৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দেহগত বা মনোগত কোন শক্তি নয়, স্বয়ং আত্মার শক্তি। আত্মাই সর্বশক্তি, সর্বক্ষমতা, সর্বজীবন। অবিদ্যা ও মায়ার কারণেই প্রতি জীব নিজেকে আলাদা মনে করে তার স্বরূপ ভুলে থাকে। আত্মজ্ঞানের অভাবে জীব সর্বশক্তিমান পরমাত্মার সাথে যুক্ত থাকতে পারে না। যোগপথ সেই কাজটি করে, যার সাহায্যে আমরা আত্মা অনাত্মার জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হতে পারি। মূলতঃ যোগ হল, আত্মোপলব্ধির পূর্ণ চেতনা। যার আলোয় সে দেখতে পায় সে কিসের জন্য জন্মেছে– জানতে পারে তার আসল স্বাধিকার। যেহেতু যোগের গোড়াকার কথা হল, বাসনা ও অহংকারের অন্ধতা থেকে মুক্তি। ঠাকুরের যোগ-জীবন এই লক্ষ্যেই আদিষ্ট হয়েছিল। একমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপাতেই বা তাঁর যোগশক্তি ও জ্ঞানতরবারি দ্বারা এই কঠিন অজ্ঞান নাশ সম্ভব। সুমেরুদাসজী অতঃপর নিগমানন্দকে পাহাড়ের মাটির নীচে এক সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে– একটি কুটিরে নিয়ে গেলেন। দেখলেন সেখানে অজস্র শাস্ত্রগ্রন্থ সাজানো আছে। সেখানে থেকেই ভিক্ষাবৃত্তি ও আলু,কচু, ফল মুল খেয়ে দীর্ঘ ৬ মাস তিনি তাঁকে হাতে কলমে হঠযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ, নেতি, ধৌতি, নারীশোধন, প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রা ইত্যাদি শিখালেন। সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধি কিভাবে লাভ করতে হয় তার কৌশল শিক্ষা দিলেন। শ্রীনিগমানন্দের শরীর ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়ায় তিনি তাঁকে লোকালয়ে গিয়ে ভাল ভাল খেয়ে শরীর সবল করার উপদেশ দিলেন। কারণ সমাধি অভ্যাস করতে চাইলে দেহে ও মনে প্রচুর বল প্রয়োজন।

তিনি প্রথমে পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার রায় সারদা প্রসন্ন সিংহ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। এখানেই তিনি সমাধির ক্রিয়া ও অভ্যাসগুলি জীবন্তভাবে নিজ জীবনে ফুটে তুলতে লাগলেন। মনঃসংযম ও প্রাণায়াম দ্বারা জড় দেহকে লঘু এবং প্রাণ বায়ুকে নিরোধ করে আপান বায়ুতে সংযোগ পূর্বক– নাক, মুখ, পথের স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া সুষুম্না পথে পরিচালিত করার শিক্ষা করতে লাগলেন। অষ্টাঙ্গ যোগের সমস্ত ক্রিয়াগুলি অভ্যাস করে বিজ্ঞান ভূমিতে উপনীত হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। তাঁর যোগবিভূতি এই সময় স্বাভাবিক

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে যত প্রকাশ পেতে লাগলো ততই জনসমাগম তাঁর সাধন কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। সাধন বিঘ্নতার ভয়ে একদিন তিনি উক্ত গৃহ ত্যাগ করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন। এই জমিদার বাবুর বাড়ীর একটি যুবতি মেয়েও তাঁকে বেশ জ্বালাতন করেছিল। ঘুরতে ঘুরতে গৌহাটি শহরের অতিরিক্ত জেলা শাসক যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস বাবুর বাড়ীতে কাকতালীয়বৎ স্থান পেলেন। এই বিশ্বাস দম্পতি ছিলেন অপুত্রক। পরা-অপরা বিদ্যায় পারদর্শী, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, যুক্তিবিচারক বিশ্বাস বাবু বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর তাঁকে আশ্রয় দিয়ে পুত্রের ন্যায় বাৎসল্যভরে স্নেহ আদর করতে লাগলেন।

এখানেই তিনি প্রথম চব্বিশ ঘন্টার জন্য একদিন সমাধিতে বসলেন। প্রথমে স্থূল প্রাণক্রিয়া (শ্বাস-প্রশ্বাস) কে যোগ প্রণালীতে এর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধকরে সুষুম্না পথে পরিচালন পূর্বক আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগসংস্থাপন নিরীক্ষে সমাধি লাভ করে স্ব-দেহে ফিরে আসলেন। কয়েকদিন বিশ্রামের পর তিন দিনের জন্য সমাধিতে বসবেন সংকল্প করলেন। সমাধি কিভাবে ভাঙ্গতে হয় তা বিশ্বাস দম্পতিদ্বয়কে বুঝিয়ে দিলেন। এই পদ্ধতি ধৈর্য, বিশ্বাসের সাথে না করলে তাঁর দেহের মৃত্যু হবে তাও জানালেন। তিন দিন সমাধি পূর্ণ হল। বাইরের শ্বাসক্রিয়া সব বন্ধ। অথচ শরীর সুন্দর ও জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। হৃদস্পন্দন বন্ধ, অথচ বেঁচে আছেন। এই অসম্ভব, অবাস্তব ও অলৌকিক কান্ড বিশ্বাস বাবু জীবনে প্রথম দেখলেন। এই সমাধি লাভের মুদ্রাটি হল 'খেচরীমুদ্রা যোগ।' অর্থাৎ ব্রহ্মতালুতে জিহ্বা উলটিয়ে সংস্থাপন পূর্বক স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়াকে বন্ধ করে প্রাণবায়ুকে আপানবায়ু দ্বারা আকর্ষণ পূর্বক মূলাধার পদ্মের সুষুম্না পথ দিয়ে বায়ুকে প্রাণরূপে দর্শন করে– সহস্রারে উর্ধ্বপথে পরমাত্মার সাথে মিলন করাই হল সমাধি সাধন। সমাধি ভঙের পর সাধকের আড়ষ্ট জিহ্বাকে, দুধে সলতে ভিজিয়ে কণ্ঠ ও তালুতে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়ে সরস করণ এবং ঘি দ্বারা জিহ্বা মালিশ ক্রিয়ার ফলে শ্বাসক্রিয়াকে স্বাভাবিক পর্যায়ে চালু করতে হয়। বিশ্বাস দম্পতি মন্ত্র মুগ্ধের মত কান্না বিজড়িত কণ্ঠে ভগবানকে স্মরণ পূর্বক বারংবার উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই নিগমানন্দের দেহে চৈতন্যরূপী আত্মা ও প্রাণ ক্রিয়া সংস্থাপন হল।

Dhaka University Institutional Repository

এই তিন দিনের সবিকল্প সমাধিতে তাঁর আত্মা প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময় কোষগুলির সকল বন্ধন ছিন্ন করে আনন্দ পথে যাত্রা করলো। এবারের সাধনা আনন্দময় কোষে গমন ও অতিক্রম। সাত দিনের সমাধি। ফিরতেও পারেন নাও পারেন। এই সংকল্পের কথা যজ্ঞেশ্বর বাবুকে সবিষয় জানালেন। যদি সাত দিন পরেও সমাধি ভঙ্গ না হয় তবে ধৈর্য হারাবেন না। প্রাণবায়ু দেহে ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রদত্ত পদ্ধতিটি চালাতেই থাকবেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু অতি আদরের এই নবীন সন্তানরূপ সন্ন্যাসীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে এই সমাধিতে না বসতে অনুরোধ জানালেন এবং বললেন যদি তিনি ফিরে না আসেন তাহলে তারা এই অপুত্রক দম্পতি কাকে নিয়ে বাঁচবে। এই সম্পর্কে শ্রী নিগমানন্দের উত্তর ছিল–

'এ জগতে মানুষ কোন সুখ ভোগ করে– যে চরম তৃপ্তি অনুভব করে, সেই সুখ কোটিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও সমাধিলব্ধ আনন্দের তুলনায় তা তুচ্ছ। ভাষায় সে আনন্দের স্বরূপ বুঝিয়ে দেওয়া মুশকিল। একবার যে সেই আনন্দ পায়, জগতের অন্য কোন সুখের প্রলোভনই তাকে আকর্ষণ করতে পারেনা। মদের নেশার মত সে তো আরও পাবার জন্য পাগল করে তুলে।'[১৩] শ্রীনিগমানন্দের সাত দিনের সমাধিতে বসার উদ্দেশ্যই হল অপরোক্ষ দর্শন। আনন্দময় কোষে গমন ও অতিক্রম পূর্বক চির শান্তি তথা ব্রহ্মানন্দ লাভ। বিশ্বাস দম্পতি তাঁর ইচ্ছাকে দমন করতে পারলেন না। তিনি সকল প্রকার সমাধি প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে অতি গোপনে এই সাধানায় বসলেন। দম্পতিদ্বয় পালাক্রমে সারাক্ষণ তাঁর দেহ পাহারা দিতে থাকেন আর দিন গুণেন। যেই কথা সেই কাজ। সত্যি সাত দিনের নির্ধারিত সময় অতিক্রম হল কিন্তু দেহে চেতনা নেই। তারা আসন ভঙ পূর্বক হাত পা সোজা করে উল্লিখিত শিখানো পদ্ধতি অনুসরণ করতে লাগলেন কিন্তু কোন উপায় হচ্ছে না। তাঁর দেহ মুখ অপূর্ব জ্যোতিতে ফুটে উঠেছে। তাঁকে স্পর্শ করে আনন্দ ও সুখে বিশ্বাস দম্পতির হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠছে কিন্তু তাঁকে দেহে ফিরে পাচ্ছেন না। যজ্ঞেশ্বর বাবু নিরাশ হয়ে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে

১৩। পূর্বোক্ত, শ্রী শ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বানী, পৃষ্ঠা ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

জানালেন, তিনি আর এই দেহে ফিরবেন না। মৃণালিনী দেবী এই কথা শুনতে রাজী নন। তিনি তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার বিধান বাবুকে কলিকাতা থেকে গৌহাটিতে তাঁর বাসায় নিয়ে আসলেন। তিনি বহু পরীক্ষা নীরিক্ষা করে জানালেন, সন্ন্যাসী অনেক আগেই মৃত, এবং এও মন্তব্য করলেন, 'সাত দিন পরেও দেহ যখন জ্যোতির্ময় ও তাজা হয়ে আছে এবং কোন পচন ধরেনি তখন দেহে যদি কখনও প্রাণ ফিরে আসে তবে জানবেন, এ চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যতিক্রম পদ্ধতি।' এই বলে তিনি বিদায় নিলেন। তাঁর দেহকে শ্মশানস্থ করার জন্য যজ্ঞেশ্বর বাবু মন স্থির করলেন কিন্তু মৃণালিনী দেবী পূর্বে শেখানো প্রদত্ত পদ্ধতিতে মনোবলকে চরম ভাবে দৃঢ় করে বারংবার চেষ্টা চালাতে লাগলেন, আর ভগবানের কাছে মায়ের একমাত্র সন্তানের মৃত্যু যন্ত্রণা সইতে না পেরে– শোকে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। হঠাৎ ঠাকুরের বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী কেঁপে উঠল। ধীরে ধীরে হৃদ-স্পন্দন, নাড়ী-স্পন্দন শুরু হল এবং ধীরে ধীরে তিনি চক্ষু উন্মিলন করলেন। ঠাকুরকে বুকে জড়ায়ে ধরে মা মৃণালিনী দেবী বার বার সন্তানের চিবুকে চুম্বন দান করতে লাগলেন এবং আনন্দাশ্রুতে বুক ভাসতে লাগলেন। প্রায় ১৫/১৬ দিন লাগলো সুস্থ্য হতে। এর মধ্যে বিশ্বাস বাবু একদা জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজি কেমন বোধ হচ্ছে? কি করে বুঝাই? যে আনন্দ পেয়েছি সে আনন্দ কিরূপ তা প্রকাশ করতে পারছিনা। মনে হচ্ছে আনন্দ-সাগরে ডুব দিয়ে উঠেছি, জগৎটা যেন নূতন বোধ হচ্ছে। এর চেয়ে বেশি বলতে পারছিনা।"[১৪] তবে ঠাকুর তাঁর স্বীয় উপলব্ধি কিছুদিন পর বিশ্লেষণ করেছিলেন এইভাবে-

> যোগ শাস্ত্রে দেখে থাকবে বাহ্যবিরাট ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও সেই সব রয়েছে: এই সাত দিন সমাধিমগ্ন থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সাত স্তরে এক এক স্তরের এক একদিন অবস্থান করে, সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজে তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমার লাভ হয়েছে। চক্রের পর চক্র, স্তরের পর স্তর ভেদ

১৪। পূর্বোক্ত, বাংলার সাধনা ও শ্রীনিগমানন্দ, পৃষ্ঠা- ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

করে ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সব আমার দেখা– শেষ হয়ে গেছে। পরন্তু অপার আনন্দ সত্ত্বার অনুভব নিয়ে ফিরে এলাম।'[১৫]

নিগমানন্দ জ্ঞানী ও যোগীগুরু উভয়ের কাছে জেনেছেন,শেষ সমাধি নির্বিকল্প (Indeterminate) সমাধি। 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি', যেখান থেকে এসেছি সেখানেই মিলে যাওয়া। কোন সংকল্প থাকবেনা। যেমন নুনের পুতুল যদি সমুদ্র মাপতে যায় তবে তার পুতুলত্ব থাকবে কি? সে সমুদ্রে লীন হয়ে যাবেই। বেদান্ত বলেছে, 'ন পুনরাবর্ততে'– এখানে পৌছা যেমন কঠিন, কিন্তু পৌছলে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়– 'সমবলীয়তে'। দেহে ফিরে আসার আর কোন উপায় থাকেনা। তিনি এসব জেনেও সংকল্পে দৃঢ় হয়েছেন নির্বিকল্পে যাবেন। মৃত্যু ভয়হীন দৃঢ়সংকল্পী নিগমানন্দের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তিনি নির্বিকল্প সাধানায় বসবেনই। বেদান্ত পথে নির্বিকল্প সাধনা তাঁর চাই-ই। 'তত্ত্বমসি'– 'আমি সেই, সেই আমি'। অয়মাত্মাব্রহ্ম, আমার আত্মাই ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি ব্রহ্মছাড়া আর কিছু নই। প্রজ্ঞানাংব্রহ্ম, বেদান্ত শাস্ত্রের মহাবাক্যগুলি এই প্রমাণই করে। অতএব সিদ্ধান্তে স্থির হলেন,আত্মার শেষ অবস্থান কী তিনি জানবেনই। একদা কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে চলে এলেন। মাতা ভুবেনশ্বরীকে দর্শন পূর্বক মন্দিরের সেবায়েৎ নিত্যানন্দ স্বামীজীকে শুধু বললেন, তিনি আজ নির্বিকল্প সমাধিতে বসবেন। স্বামীজী বাধা দিয়ে বললেল, তুমি জান, এই সমাধি হতে কেউ ফিরে না। কেন আত্মমুক্তির জন্য অধীর হচ্ছ। তার থেকে জগৎ স্রষ্টার জগৎ মঙ্গলময় কল্যাণকর কর্ম করা অনেক বড় কাজ নয় কি? নিগমানন্দ জীবনের চিন্তা অনেক আগেই ত্যাগ করেছেন। তিনি কারও উপদেশ শুনতে অভ্যস্থ নন। তিনি বেদের 'পুরুষ সুক্তের' পুরুষ হয়ে থাকতে চান। তিনি চিনি খেতে চান না তিনি চিনি হতে চান। কথা না বাড়ায়ে তিনি ভুবনেশ্বরী মায়ের মন্দিরের পশ্চিম দিকে দ্বারভাঙা রাজার বাঙ্গলোর পেছনে অর্থাৎ উত্তর দিকে যে সরু জঙ্গলি রাস্তটি চলে গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে খানিকটা গেলে একটি প্রকান্ড চ্যাটালো পাথর দেখা যায়। ঐ পাথরের উপরই আসন নির্দিষ্ট করে

১৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

নিলেন। নদীর ওপারে উত্তর দিকে নাগরাজ হিমাচলের পাদদেশ পর্যন্ত সমতল ক্ষেত্র। উত্তরে লখিম পুর জেলা ঐ খানেই অবস্থিত। কামাখ্যা ধাম হতে হিমাচল পর্যন্ত দৃশ্য অতীব নয়ন-মুগ্ধকর এবং অনন্তের ভাবদ্যোতক। ঠাকুর এখানেই বেদান্ত সাধন প্রক্রিয়ামতে নিদিধ্যাসনে বসে প্রাণায়াম সাহায্যে প্রথমে আমিত্বের প্রসার ঘটাতে শুরু করলেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে বিশ্ব আমিত্বে আপনাকে বিলীন করে দিলেন। তাঁর মন উর্ধ্ব জগতে উঠতে থাকলো আর তিনি একটার পর একটা জ্যোতির সাক্ষাত পেতে লাগলেন। স্পষ্ঠ দেখতে লাগলেন, এক একটি বদ্ধ দরজা যেন তাঁর সামনে খুলে যাচ্ছে। যতই উপরে উঠছেন ততই জ্যোতিগুলি আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগলো। পরিশেষে উর্ধ্ব লোকের সপ্তভূমি অতিক্রম করে মহাশূন্যে অনন্ত জ্যোর্তিলোকে ডুবে গেলেন– নির্গুণ নির্বিশেষে। কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকলেন মনে নেই হঠাৎ ফিরে আসার জন্য মন সংকল্পিভূত হল। কিন্তু কী করে ফিরবেন কোন পথ নেই। তাঁর শ্রীমুখ থেকেই এখন শুনবো পরবর্তি ঘটনা কী ঘটল?

> এবার তো আর কিছু বলতে পারছিনা 'ফুরাইল বাক্ মোর'। ভাবটা মনে আসছে কিন্তু তোমাদের বুঝাতে পারছিনা।... না আর বলতে পারলাম না। তারপর যে কি অবস্থা হল তা বুঝাবার মত ভাষা নেই। কতক্ষণ এরূপ ছিলাম জানিনা। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা দৃঢ় সংকল্প জাগলো– 'আমি গুরু'। মুহূর্ত মধ্যে এই 'অনন্ত জ্যোতি', কেন্দ্ররূপী একটি বিন্দুর আকার ধারণ করল। তার উর্ধ্বে আর কিছুই নাই। সেই বিন্দুই আমি; ওই কেন্দ্রবিন্দুই গুরু (ব্রহ্ম)। আর ওই গুরুই (ব্রহ্মই) আমি। এই গুরু সত্তা (কালাতীত ব্রহ্ম) ছাড়া আর কোন সত্তাই আমার থাকলো না। ঠাকুরের ভিতর এখন থেকে শুধু 'আমিই গুরু'– এই ভাবটিরই অনুরণন চলতে লাগলো।[১৬]

উপনিষদে একেই বলা হয়েছে 'নীলং পরকৃষ্ণম্' আদিত্যের শুক্লজ্যোতি সদ্ব্রহ্ম এবং পরঃকৃষ্ণ জ্যোতি অসৎ বা জ্যোতির্ময় অব্যক্ত– মহাশূন্যতায় অনুভব অসৎ ব্রহ্ম। নিগমানন্দেরও সমভিব্যক্তি তাইঃ

১৬। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী, পৃঃ ৪০

Dhaka University Institutional Repository

হঠাৎ দেখি ঘোর অন্ধকার, এই অন্ধকার রাজ্যে কেমন করে এলাম জানিনা। এখন বের হই কেমন করে? বের হওয়ার পথ তো কিছু নেই। জানিনা পরমেশ্বরের কি ইচ্ছা। কিছুক্ষণ পরে দেখি, কতকগুলি ছিদ্রবিশিষ্ট একটা জালের মত জ্যোতির্ময় পদার্থ জ্বল জ্বল করছে। ঠিক তার মাঝখানে একটা ছিদ্রের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল, সেটা ক্রমে বড় হতে লাগল, আমি তার মধ্য দিয়ে গলে গেলাম। কিন্তু গলে পড়বার সময় গর্ভযন্ত্রণার মত বোধ হল। এইরূপে ক্রমশঃ নির্গুণ হতে সগুণে আসতে লাগলে। তাঁর সত্য প্রকৃতি লোকগুলি ফুটে উঠতে লাগল। শেষে যখন ভূলোকে এসে পড়লাম তখন সমগ্র পৃথিবীটা আমার দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়লো। হঠাৎ ভারতবর্ষটা দৃষ্টিতে পড়ল। অন্যান্য দেশ মহাদেশগুলিও বেশ দেখতে লাগলাম। তারপর আসাম দেশ, কামাখ্যা পাহাড়, ব্রহ্মপুত্র নদী আর পাহাড়স্থ বৃক্ষলতা আমার দৃষ্টিতে এল। ক্রমশঃ মন্দিরটি দেখতে দেখতে নিজের দেহটা হঠাৎ দৃষ্টিতে পড়ল। আমি ওমনি দেহের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কোন মুহূর্তে কি করে যে দেহে ঢুকলাম তা বুঝতে পারলাম না। আর বের হওয়ার সময় যে কিরূপে বের হয়েছি তাও বুঝতে পারিনি। দেহে ঢোকার পর জ্ঞান হল আমি অমুক। কিন্তু নিরোধ সমাধির সংস্কার এতটুকুও ম্লান হল না।[১৭]

সার্থক হল শ্রীনিগমানন্দের অপরোক্ষানুভব। ব্রহ্ম উপলব্ধি সত্য হল গুরুদত্ত বৈদিক সন্ন্যাসে। অপার আনন্দ নিয়ে তিনি কামাখ্যা পাহাড় থেকে নেমে এলেন। এবং ভুবনেশ্বরী মায়ের মন্দিরে গেলে স্বামী নিত্যানন্দজীর সাথে পুনঃ দেখা হল। স্বামীজি দেখামাত্র বললেন, তোমার যে আজ অপূর্ব জ্যোতিমূর্তি দেখছি, তা কেমন করে হলো? স্বামী নিত্যানন্দ তাঁর নিকট নির্বিকল্প সমাধির কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পূলকিতান্তঃকরণে বললেন, 'তুমিই ধন্য।' শাস্ত্রবাক্য আজ তোমাতে

১৭। পূর্বোক্ত শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী পৃঃ ৪১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পূণ্যবতী চ তেন। অপারসম্বিৎসুখ-সাগরেহস্মিন্। লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ। আজ থেকে তোমার কুল-শীল-জন্ম ও জন্মভূমি পবিত্র ও পূণ্য হল। অপার সুখ সাগরে অবগাহন করে তোমার জীবন ধন্য হল।

এই সমাধির পর হতে বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে তিনি নিজেকে দেখতে লাগলেন, 'সর্বভূতাত্মমাত্মবৎ'। সারা দেহখানি তাঁর দিব্য জ্যোতিতে ভরা, থম থম করছে যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তি। যেদিকে হাঁটছেন সেদিকেই জ্যোতি ঘিরে থাকছে তাঁকে। ভিতরে সারাক্ষণ একটা আনন্দের দ্যুতি, তাঁকে অভিভূত করে– তাড়িত করতে লাগলো, কিন্তু এর উৎস খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আবার সন্ন্যাস সাধনার আকাশবৎ তাঁর শূন্য-চিত্তের এই আনন্দকে মুহূর্তে উপহাসচ্ছলে বিচার এসে উড়িয়েও দিত। এমতবস্থায় তিনি একদিন ভাবলেন জ্ঞানীগুরু সচ্চিদানন্দজীর সাক্ষাত দরকার। এই চরম সাধনার পরেও কেন এমন বোধ হচ্ছে জানা দরকার।

তিনি গুরুর আশ্রম পুষ্কর অভিমুখে যাত্রা করলেন। আশ্রমে যাবার জন্য তিনি প্রথমে কলিকাতা এলেন এবং এখানে জানতে পারলেন উজ্জয়নীতে এবার কুম্ভমেলা। কুম্ভে বহু সাধু সমাগম হয়, হয়তো গুরুদেবের সাথে দেখা হতেও পারে। সৌভাগ্যক্রমে তাই হল। এখানেই তিনি 'পরমহংস' উপাধি লাভ করেন। যা পরিবর্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। এই সময় তিনি একদিনের জন্য কাশীর বারানসীতে অবস্থান করেন নিগমানন্দ আগেই শুনেছেন কাশীর বারানসীতে কোন নবাগত অভুক্ত থাকেন না। কারণ স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা এখানে বিরাজিত। এ কথা মনে পড়াতেই তাঁর অবজ্ঞার হাসি চিত্তপটে ফুটে উঠল। কারণ; তিনি এখন ব্রহ্ম, দেব দেবীর মাহাত্ম্য তাঁর কাছে কী মূল্য?

প্রেমিক গুরু লাভ

দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য পরীক্ষার জন্য তিনি দশাশ্বমেদ ঘাটে বসে গঙ্গা দেখতে দেখতে ধ্যানস্ত হয়ে গেলেন। স্মরণে নেই তিনি অভুক্ত অনাহারী। অন্নপূর্ণাকে পরীক্ষার জন্য এখানে এসে

Dhaka University Institutional Repository

বসে আছেন। সন্ধ্যা হয় হয়, এ সময় এক বৃদ্ধা মহিলা নিগমানন্দকে বসে থাকতে দেখে– কাছে এসে জানায়– বাবা এই ঠোঙাটি ধর তো, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এক্ষুণি আসছি। বলে তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। নিগমানন্দের যখন ধ্যান ভঙ হল তখন অনেক রাত্রি। প্রকৃতিস্থ হয়ে নিগমানন্দ বৃদ্ধার ঠোঙা দেখার দায় আবছা আবছা স্মরণে এলে ভাবলেন, দেবীর কোন পরীক্ষা নয় তো? আবার মনে এও হতে লাগলো– এখন তো আর তার ফিরে আসার সুযোগ নেই। দেখি তো কি আছে এর মধ্যে? খুলে দেখেন, বর্ধমানের টাটকা আটটি সীতা ভোগ। তিনি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলেন, বিচার বিবেচনা আর বেশি না করে পূর্ণতৃপ্তি সহকারে সীতাভোগগুলি খেয়ে ক্ষুধা মেটালেন। যাই হোক, যেই দিক, স্থানের মাহাত্ম্য সত্য হলেও হতে পারে। এপর্যন্তই চিন্তা ত্যাগ করলেন। রাত্রিতে কোথায় যাবেন? নিকটেই একটি নোংরা ঘরে রাত্রিটুকু কাটার জন্য বিশ্রামের জায়গা করে নিলেন। মাঝরাতে স্বপ্ন দেখলেন, বিশ্বেশ্বরী বিশ্বের সমস্ত যৌবন ভার বক্ষে নিয়ে সেই দেবী অন্নপূর্ণা পবিত্র দীপ্তিতে সারা ঘর আলোকিত করে, অসীম করুণায় মধুর সৌরভ ছড়িয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, তুমি কি এখনও বুঝতে পারনি, আমি অন্নপূর্ণা স্বয়ং তোমাকে জড়তি-বেশী বুড়ি রূপে খাওয়ালাম।

তুমি বেদে ও গুরুর কাছে শুনোনি– সাধাকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণ, রূপকল্পনা। সাধকের হিতের জন্যই ব্রহ্ম নানারূপ ধারণ করে থাকেন। তুমি তত্ত্বজ্ঞানে জেনেছ, সত্য বলতে একটিই বস্তু। হয় এক, নয় বহু। আধুনিক বিদ্ধান দার্শনিকগণ বলেন, বহু দেবতা স্বীকার করলে এক ঈশ্বর যুক্তিতে টিকেনা। আবার বহুর মূল্য দিতে গেলে একের মূল্য হারাবেই। আবার একের প্রাধান্য দিতে গেলে বহু অন্তর্হিত হবেই। অতএব এক এবং বহু পরস্পর বিরোধী। এটি যেমন এক অর্থে সত্য, ব্যাপকার্থে কিন্তু ভিতরে এক সত্যেরই এসব বিভূতি। 'একং সত্য' যদি বহুর মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ না করে তবে তা একটি নিরেট শব্দ মাত্র নয় কি? যেমন একটি সুতোতে বহু রকমের ফুলের মালা, দেখতে মনোহর নয় কি?যেমন অগ্নি, তাপ,কিরণ,সূর্য একই বস্তু-শক্তি, কিন্তু নাম রূপ আকৃতি প্রকৃতি শুধু আলাদা। দেবীর মর্মার্থ বাণী তোমার ভিতর বাইর যুগপৎ ঋষিদৃষ্টির মত– তন্ত্র, জ্ঞান ও

Dhaka University Institutional Repository

যোগ সাধনা করে যদিও এই নিখিল বিশ্ব উপলব্ধি হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়িত হয় নি। বাস্তবতার সাথে মেলামেশা না করলে ভাবের সত্যটি যথার্থ হয় না।

> ভালবাসাই যে ভগবান্, এবং ভগবানের সাধনাই যে ভালবাসার সাধনা। এই সত্যটি উপলব্ধির জন্যই আমি তোমাকে কাশীতে নিয়ে এসেছি। তুমি প্রেমিক গুরুর অনুসন্ধান করে প্রেম সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর, তখনই বুঝবে মানুষ প্রকৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যে কি সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক? তুমি এখনও পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করনি। নিরাকার নিগুর্ণ ব্রহ্ম যে সাকার ও সগুণে এসে লীলা করতে পারেন তোমার এই জ্ঞান না থাকায় তুমি আমাকে চিনতে পারনি।[১৮]

এই বলে দেবী অন্তর্হিত হলে নিগমানন্দের স্বপ্ন ভঙ হল। ভাবতে লাগলেন, নিজের স্বরূপ জানলাম, নিজের ভিতর সব কিছুকে দেখলাম। আত্মা পরমাত্মায় মিলন দেখলাম। এখনও আমার সাধনা সিদ্ধ হয় নি। এর শেষ দেখার জন্য দৃঢ় সংকল্পী নিগমানন্দ এবার প্রেমিক গুরুর ভাবনায় মনোনিবেশ করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায়, একদা জ্ঞানী গুরু সচ্চিদানন্দর সঙ্গে কেদারবদ্রির পথে প্রেমসিদ্ধা গৌরিমার সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। গৌরিমা সেদিন গুরু সচ্চিদানন্দকে বলেছিলেন, এই বাচ্চা তোমার যেদিন নির্বিকল্প সমাধি লাভ করবে তখন আমার কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দিও। অতীত স্মৃতি রোমন্থন ও স্মরণে আসার সাথ সাথ নিগমানন্দ ছুটলেন হিমালয়ে গৌরিমার সান্নিধ্য লাভ প্রত্যাশায়। অবশেষে সাক্ষাত করলেন। সাধন সিদ্ধা গৌরিমা তাঁর আগমন দেখেই মর্ম উপলব্ধি করলেন। এখানে প্রেম কী? প্রেমের সাথে জগতের, জীবের ও ঈশ্বরের কী সম্বন্ধ ও সম্পর্ক? আলোচিত বিষয়টি আলোচনার পূর্বেই তা জেনে রাখা ভাল। নইলে নিগমানন্দের সাথে জগৎ জননীর ও তাঁর মনোময়ী মূর্তি রাণীর (শুধাংশু) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বুঝতে আয়াস সাধ্য হতে পারে।

১৮। পূর্বোক্ত, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী**, পৃঃ ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

উপনিষদে আছে, আনন্দং ব্রহ্মেতি-ব্যজনাৎ, ব্রহ্মের আরেকটি স্বরূপ হল, আনন্দং ব্রহ্মম্, ব্রহ্ম আনন্দময়। এই আনন্দকে উপলব্ধি করার জন্যই তাঁর জগৎ ও জীব সৃষ্টি। তিনি একোহপি সন বহুধা য়ো বিভাতি, তিনি যেমন এক তেমনি আবার বহু। উপনিষৎ তাই জানালেন, একাকী নৈব রেমে– একা একা আনন্দ হয় না বলেই তিনি নিজেকে বহুরূপে সৃষ্টি করেছেন। এই বহুরূপকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখার জন্যই তাঁর ভাব জগতের এই জগৎ লীলা। এই রস ও লীলা না থাকলে তাঁর আনন্দ স্বরূপত্ব কেউ জানতো না। যদিও এক দৃষ্টিতে জগতে আনন্দ বা সুখ অতিসামান্য সেই তুলনায় দুঃখের অংশ অনেক বেশি। এই দুঃখের জ্বালায় জীব তাঁকে ডেকে তৎক্ষণাৎ সাড়া পায় না বলেই তাঁকে ভুলে থাকে। কিন্তু জীব জানেনা যে, অয়মাত্মাব্রহ্ম। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং–। আমার আত্মাই ব্রহ্ম। আমার আত্মারূপ ঈশ্বরই সর্বজীব ও জগৎ। উপনিষদ্ও বলেছেন, সর্বম্খলিদং ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ। এমন কোন পদার্থ, প্রাণ বা স্থান নেই যেখানে ব্রহ্ম নেই। আর জীবতো ব্রহ্ম ছাড়া নয়ই। অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বর এই জগৎ জীব সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর নাম সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম বলেন, ঈশ্বর স্রষ্টা নন, তিনি সৃষ্ট হয়েছেন। তিনি এক বহু হয়েছেন। অতএব জীবের দুঃখ কষ্টের জন্য জীব ঈশ্বরকে দায়ী করবে কেন? ঈশ্বরই সুখ ভোগ করছেন। ঈশ্বরই দুঃখ ভোগ করছেন। আমাদের যে ব্যক্তি-আমি বা অহংকার-আমি মূলতঃ এই 'আমি'-ই হল আমাদের 'প্রকৃত আমি বা ঈশ্বর আমি', দেহাস্থিত নাম রূপ আমি প্রকৃত আমি নয়। ঈশ্বরের এই আমি জ্ঞান লাভ করাই হল প্রকৃত আত্মস্বরূপ 'আমি জ্ঞান' লাভ। বেদ এই শিক্ষাই দান করেছেন। গীতা, উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র এই প্রস্থানত্রয় শাস্ত্রও এই শিক্ষাই দান করেছেন। আমরা জীবত্বের ক্ষুদ্র অহংকার অভিমান বশতঃ নিজেকে কর্তা ভাবি বলেই স্বরূপ ভুলে থাকি। বিশ্ব অন্নদাত্রী মাতা অন্নপূর্ণা এই শিক্ষা দান করার জন্যই নিগমানন্দকে প্রেম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে বললেন। প্রেমই হল পূর্ণ অভিজ্ঞান। প্রেমের মাধ্যমে যে আত্মস্বরূপ লাভ– সেই হল প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ। আত্মজ্ঞানে মুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

হলেও প্রেম কিন্তু মুক্তির চেয়েও বড়। ভালবাসা জীবনের সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক শক্তি। প্রেমহীন জীবন অন্তঃসারশূন্য।

একদা ঠাকুর তাই বলেছিলেন, সুন্দরী মেয়ে এ জীবনে কম দেখিনি, কিন্তু রাণীর মত কাউকে দেখিনি। মূলতঃ এ রাণী ঠাকুরের অচিন্তনীয়, অজ্ঞাত, অকল্পনীয়, অপ্রাকৃত প্রেমের রাণী। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে এটি মন ও মুখের কথা। কিন্তু এ অনেক সত্যকথা, যেমন হঠাৎ অজান্তে মুখ থেকে অনেক সত্য কথা সাধারণ ভাবে বের হয়ে যায়, এও তদ্রূপরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ঠাকুর একদিন বেদের পুরুষ-সুক্তের মুক্ত পুরুষ হবেন। তাঁরই আনন্দ; আনন্দ শক্তিরূপে মাতা ঠাকুররাণীর রূপের মাঝে প্রকাশ পাবেন। অগ্নি ও তার দাহিকা-শক্তি। দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নির যেমন মূল্য নেই। ব্রহ্মনিগমানন্দেরও জীবন বিবৃতি এখানে সেই। ভিতরে তিনি অর্ধনারীশ্বর। কিন্তু বাইরে তিনি পুরুষ, আর জগৎ জননী তাঁরই অন্তরঙ্গা। আসলে মাতা ঠাকুরাণীর মর্ত্যবিগ্রহ ছিল সিদ্ধভাবতনু। মহাদেবীর ভাব-কান্তি প্রতিবিম্বিত হয়েছিল– ওই আধারে। তাই তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হলেও বস্তুত তা অপ্রাকৃতধামের সত্ত্বতনুতে পরিণত হয়েছে। তারাপিঠে মহাবিদ্যা তারাদেবী তাই শুধাংশুবালার রূপ ধারণ করে শ্রীশ্রী ঠাকুরকে দর্শন দেন ও বলেন, 'তোমার মনোময়ী মূর্তিতে এসেছি।'

প্রেম সিদ্ধা গৌরিমা এই সিদ্ধিই লাভ করেছিলেন। ভিতরে তিনি জগৎজননী বাইরে তিনি গৌরিমা। যেমন ঠাকুর ছিলেন বাইরে নলিনী ভিতরে নিগমানন্দ। তথ্য ও তত্ত্বের মিলনে তত্ত্বত। এরই নাম ভাব-সাধনা। বেদান্তের সাধনা ।ভাবতে ভাবতেই তৎস্বরূপ লাভ করা। ব্রহ্মকে দর্শন করা ও তাঁকে পাওয়া যুগৎপৎ না হলে প্রাণের হাহাকার মিটেনা। শুধাংশু মরে গিয়েও শুধাংশুকে লাভ করা। ইনিই ঠাকুরের ভগবান্ বা সগুণব্রহ্ম। এজন্যই ঠাকুর বলেছিলেন, পর অবর সব– পরাবর ব্রহ্মই হয়ে গেলাম। এই লক্ষ্যেই প্রেমসিদ্ধা যোগমায়া গৌরিমা ঠাকুরকে স্পর্শ মাত্র তাঁর ভিতরে প্রেমের বন্যা, আনন্দের লীলা লহরী বইয়ে দিলেন। তিনি প্রেমবশে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। সর্বত্র তিনি পুরুষোত্তম রূপে নিজেকে দেখতে

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেন। আর তাঁরই আহলাদিনী শক্তি রাধারূপে শুধাকে ভালবাসতে পেরে নিজেকে ধন্য হলেন। এরই নাম আরোপ সাধনা। ঠাকুরের ভাষায়– "এ যেন মানুষের ভিতর ভগবান্‌কে দেখতে যাওয়া নয়, ভগবান্‌কেই মানুষ ভাবে দেখা।"[১৯] যাকে বাইরে পেয়েছি তাকে অন্তরে পাওয়া। স্মরণ রাখা কর্তব্য– প্রেম সাধ্য বস্তু নয়, অর্থাৎ প্রেম কোন সাধনায় সিদ্ধ হয় না। প্রেম সিদ্ধ হয় মহতের কৃপায়। এজন্যেই প্রেম স্বয়ং সিদ্ধ। প্রেমের গুরু গৌরিমার মহতি কৃপাতেই তাঁর অন্তরে প্রেমের স্ফূরণ হয়। এই প্রেম লাভ করার পরেই ঠাকুরের দিব্য দৃষ্টির দ্বার উন্মেচিত হয়। বিশ্ব জগৎ তাঁর সামনে প্রেমময়ী রূপে ফুটে ওঠে। ঠাকুরের বাণী এখানে লক্ষণীয় 'আমি জগৎ জননীকে বুকে করিয়া তোমাদের (শিষ্যদের) হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছি।' একমাত্র শিবসাযুজ্য উপলব্ধিতেই এটি সম্ভব। অন্য কোন ভাবে এ বক্তব্য সম্ভব নয়।

পূণ্যময়ী গৌরিমার প্রেমভক্তির অনুপ্রবিষ্ট তেজ এভাবেই সার্থক হল। নিগমানন্দ এখন যতই প্রেমের বিষয় চিন্তা করতে থাকেন, ততই ঈশ্বরের মধুর প্রেমের ভিতর মিশে যেতে থাকেন। যতই তিনি ভগবানের জন্য পাগল হতে থাকেন ততই তাঁর প্রতি অনুরক্তিতে গলে যেতে থাকেন। নিগমানন্দ এতদিনে বুঝলেন, শুধাংশু কে? ভগবান্‌কে না চেয়ে কেন তাকে চাইতে হৃদয় মন আকৃষ্ট হয়েছিল? ব্রহ্ম হলে হবেনা ভগবান্‌ও হওয়া চাই। এতদিনে বুঝলেন, কেন তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়নি? এখন জগতের প্রতি ধুলিকণা তাঁর কাছে অমৃতময়। 'প্রতি কঙ্কর প্রতি শিলা এক শঙ্কর পরমেশ।' ফুল দেখলেই তিনি মনের আনন্দে অজান্তে নাচতে থাকেন। সর্বত্রই দেখতে থাকেন শাশ্বত সৌন্দর্য। প্রভাত সূর্যের নির্মল কিরণ, বর্ষার কৃষ্ণ মেঘরাশি, মাঝ রাতের উজ্জ্বল তারা, কাননের সুন্দর সুন্দর ফুল, অসীম আকাশে ওড়া পাখীদের কলকাকলি এবং শান্ত পর্বতশ্রেণী তাঁকে সৌন্দর্যের দেবতার কথা মনে করিয়ে পাগল করে তুলে। তিনি প্রেমানন্দে বিগলিত হয়ে হারিয়ে ফেললেন– নিজের বাহ্য প্রকৃতি, আচার নিয়ম শুচিতা ও বাধ্যবাধকতা। সর্বত্রই দেখেন তাঁর মনোময়ীমূর্তি রাণীকে। ভাবের

১৯। শক্তি চৈতন্য ব্রহ্মচারী, অভয় বাণী , কোকিলা মুখ, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হতে প্রাকাশিত, সপ্তম সংস্করণ ১৪১২ পৃষ্ঠা নং- ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

তনু ধারণ করে রাণী আসেন তাঁর কাছে। কত কথা, কত ভালবাসা, শেষ হয়েও যেন হল না শেষ। এত দিনে মনে হল যা চাইছি আজ তাই পেয়েছি। এই ভাব সম্বরণের জন্য মাতা ঠাকুরাণী অন্যান্য দিনের মত না এসে এক বর্ণনাতীত, অবাকপূর্ণ, রহস্যময় ঘটনা ঘটালেন আজ। গারোহিল যোগাশ্রমে ঠাকুর শুয়ে আছেন হঠাৎ অনুভব করলেন তাঁর অধিষ্ঠাত্রীদেবী একটি ছোট ফুট ফুটে বালিকা রূপে তাঁর বিশাল বক্ষে শুয়ে আছেন। ঠাকুর বাৎসল্য ভাবে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সন্তান হারা স্নেহচ্যুত পিতার এ যেন কত আদরের সন্তান স্নেহ -প্রীতি ও আকূতি। কিছুপর দেখলেন এই মেয়েই ক্রমে তাঁরই প্রিয়তমা পত্নীতে পরিবর্তিত হলেন। শেষে তাঁর প্রিয় জননী মানিক সুন্দরী দেবীর আকার ধারণ করলেন। ঠাকুরের বিরক্তি ও অসহ্যবোধ হতে লাগল। ঠাকুরের মাঝে এই ভাবের তারতম্য ঘটানোর জন্যই জগৎ-জননীর এই খেলা-খেলা। তিনিই যে যুগপৎ কন্যা, জায়া ও জননী এই তথ্যের নিরেট সত্য ভাবনা স্থাপন দ্বারা বুঝাতে চাইলেন, তোমার প্রেম পলি যেন শুধু শুধাংশু রূপেই নিবদ্ধ না থাকে। জগৎময় তোমারই আত্মবোধে আত্মীয় ও প্রিয় হয়ে ওঠে। নাম, রূপ ও আকৃতি মূল্যহীন। নামরূপ বাইরের বস্তু, আত্মা অন্তরের বস্তু। আত্মারই প্রকাশমান দীপ্তি বা বিভূতি এই নাম রূপ। তুমি আত্মজ্ঞানে আমার মত সবাইকে ভালবেসে কোল দাও। শুধু আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থেকো না। আমি যেমন তোমার মনোময়ীরূপে, আবার কন্যা, জায়া, জননী ও ত্রিভুবনেশ্বরী-জগৎ-জননী রূপেও। আবার আমি জড় এবং চেতন সবকিছুতে। আমিই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্মময়ী মা ও প্রেমিকা।

জড় ও চেতন নিয়ে আধুনিক পন্ডিতদের যত যুক্তি, মত ও বিচার তাতে আলোচিত এ দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী আলাদা তত্ত্ব। ক্রান্তদর্শী বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ কিন্তু এ নিয়ে কোন মতবাদ বা মতবিরোধ করেন নি। তাঁরা জানতেন, আমি ও আমার দেহ, এখানেও সেই তত্ত্ব নিহিত। একই অখন্ড সত্তার এ দুটি সুমেরু ও কুমেরু। দুইয়ের মধ্যেই বইছে শক্তি প্রবাহ– যা জড়ের মধ্যে প্রাণ ও চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে ক্রমশ তাকে চিন্ময় করে তুলছে। অতএব জড়, শক্তি ও চৈতন্য তিনের

Dhaka University Institutional Repository

সমাহারে যে অখন্ড তত্ত্বটি পাই; তাই হল বিশ্বের মূল। ঠাকুরের ভাবজগতের সাথে বস্তুজগতের এক মহাবিপ্লবের সমন্বয় সাধিত হল। ঠাকুরের মাঝে ঋষিদৃষ্টি অন্তর বাইর একাকার ও জীবন্ত হয়ে গেল।

মাতা ঠাকুরাণী ঠাকুরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তুমি নির্বিকল্প সমাধিতে একমাত্র গুরুসত্তা বা গুরুবোধ নিয়ে ফিরে এসেছ। তুমি এখন সার্বভৌম গুরু। সংসারের ত্রিতাপদগ্ধ আর্ত-ক্লিষ্ট-রুগ্ন-পীড়িত মানুষের প্রাণে দুঃখের অবসান ঘটিয়ে জ্ঞানসুখের জ্ঞানের আলো দান কর, দূর কর তাদের জীবনের অন্ধকার, মুক্ত কর তাদের পার্থিব বন্ধন থেকে। আমি তোমার সঙ্গেই আছি। তোমার প্রিয় প্রতি ভক্ত শিষ্যের মাঝেই আমাকে দেখতে পাবে। তুমি নিমিত্ত ও সাক্ষী স্বরূপ অবস্থান করে আমাকে দিয়ে জগতের কাজ করিয়ে নাও। আমি মাধুর্য ভাবে তোমার সাথে সারাক্ষণ আছি ও সহায়তা করবো বলে প্রতিজ্ঞা করছি। ঠাকুরের সাথে ঠাকুরাণীর এই অভিব্যক্তিগুলি গারোহিল যোগাশ্রমে হয়েছিল। ব্রহ্মময়ি জানেন, শুধাংশুবালা যে মিথ্যা নয়, ছায়া নয়, তাঁরই এক প্রতিরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত– বিলাস, একথা তত্ত্বত জানার জন্যই নিগমানন্দের জীবনে তিনি একের পর এক অধ্যায় তৈরি করে নির্বিকল্পে নিয়ে আসেন। এবং নির্বিকল্পের পর এই প্রেমসিদ্ধি অভিজ্ঞতা দান করে– যুগপৎ ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঠাকুর ও ঠাকুরাণী আজ মহাভাবে লিপ্ত। তারই ফলশ্রুতি রূপে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান ও লাভ।

ঠাকুর এবার বললেন, গুরু যদি সাজতেই হয় তাহলে বল, আমার আশ্রিত শিষ্য ভক্তগণ তিন জন্মে মুক্তি পাবে? দেবী বলবেন, 'তথাস্তু'। যারা আমার বিরোধিতা করবে– তারাও মুক্তি পাবে তো? দেবী 'অবশ্য পাবে'। 'আর যারা তোমাকে জীবন দিয়ে এই জীবনেই ভালবাসবে তারা এই জীবনেই এই দেহেই মুক্তি লাভ করবে। দেবীর ত্রিসত্য প্রতিশ্রুতি ও গুরুগিরির আদেশ নিয়ে ঠাকুর প্রেমে গদ গদ হয়ে গুরু সচ্চিদানন্দজীর সাক্ষাত প্রয়োজন অনুভব করেন। সময়টি ছিল বাংলা ১৩১২ সাল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। এলাহাবাদে– তখন চলছে কুম্ভমেলার প্রস্তুতি। ঠাকুর কুম্ভ মহামেলায় যোগদান করলেন। এই মহতি বিশাল সাধু সংঘে শৃংঙ্গেরী মঠের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সর্বসম্প্রদায়ের সাধুদের সভাপতি

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম পুরুষ আচার্য শংকরাচার্যজী এবং গুরু সচ্চিদানন্দজী ও অন্যান্য সাধুবৃন্দ তাঁকে বহু পরীক্ষা পূর্বক 'পরমহংস' উপাধি দান করেন। গুরু সচ্চিদানন্দজী এখানেই তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস প্রদত্ত দন্ডটি গ্রহণ করে গঙ্গায় বিসর্জন ও তাঁকে গুরুদায় মুক্ত করেন। অতঃপর গুরু দক্ষিণা স্বরূপ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত গদি তাঁকে প্রদান করতে চাইলে তিনি তার পরিবর্তে বাংলায় গুরুগিরি ভার গ্রহণে স্বীকৃত হন। এ সম্পর্কে ঠাকুর নিজ মুখেই উচ্চারণ করেছেন।

"আমি অবতার নই, আমি সদ্‌গুরু। অবতারের মত পথকে সাধারণের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠা করাই আমার কাজ।"[২০] এছাড়াও তাঁর পরিব্রাজকাচার্য উপাধি লাভের পশ্চাতে 'দূর্গম পথস্তাৎ'– 'দূর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'-সম সমগ্র ভূ-ভারতের উল্লেখযোগ্য ও উল্লিখিত দুর্গম কঠিন কঠিন পূণ্যক্ষেত্রসমূহ যেমন হৃষিকেশ, হরিদ্বার, ব্রহ্মকুন্ডঘাট, হরকীপ্যারী, কনাখল, কেদার, বদরীনারায়ন, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, কিরাত অর্জুনের যুদ্ধস্থান, কর্ণপ্রয়াগ ইত্যাদি নানা স্থান ও বহু ধর্মশালা, আশ্রম, চট্টি, মঠ, সঙ্গমস্থল এবং বহু তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণে ভূয়সী কৃতিত্ব ও অপার আনন্দ লাভ– আমাদের আরও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে।

তাঁর নিম্নলিখিত অভয় আশ্বাসবাণী আমাদের সবচেয়ে ধন্য ও কৃতজ্ঞ করে– "কে কোথায় পাপী-তাপী, পচা-গলা আছে সব নিয়ে আয় আমার কাছে, আমি তাদের মুক্ত করবো। তাদের মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি মুক্ত হব না।"[২১]

বলে রাখা ভাল, প্রেমসিদ্ধা গৌরিমার নিকট হতে সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুর যখন ফিরে আসেন এ সময় প্রেমসিদ্ধ ঠাকুরের প্রেমের অবস্থাটি ছিল অতিরিক্ত মদ্যপানে বিবশতনু মাতালের মত। প্রেমের নেশায় টলতে টলতে ঠাকুর যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাসায় এসেছিলেন। এখানে তিন মাস ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান শূন্য ছিলেন। নির্গুণ সগুণের মাঝখানে এই ভাবলোক প্রাপ্ত হয়ে ঠাকুর প্রকৃত স্বরূপ লাভ

২০। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী, পৃঃ ২২৫

২১। ঐ, পৃঃ ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

করে বিশ্ববরেণ্য সদ্‌গুরু হলেন। বিশ্বাস দম্পতিকে ঠাকুর খুব ভালবাসতেন এবং প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন। তার প্রমাণ ঠাকুরের বাণীতেই পাই।

"যজ্ঞেশ্বর, বিশেষতঃ তার স্ত্রী, আমার জন্য যা করেছে,তাতে আমি চিরকাল তাদের কাছে ঋণী থাকব। তবে তারা পরে যখন আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করে দীক্ষিত হল, তখন আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলাম।"[২২] গুরু সচ্চিদানন্দজী ঠাকুরকে দিয়ে এদেরকে প্রথম দীক্ষা দান করিয়ে ঠাকুরকে গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা পূর্বক গুরু শক্তি অর্পন পূর্বক গুরুদায় থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। তারপর হতে ঠাকুর জীব-জগতের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেন এবং একের পর এক এক-এ মুক্তি মোক্ষের ভার গ্রহণ করে শিষ্যেত্বে বরণ করে নেন। পরবর্তিতে যোগীগুরু সুমেরুদাসজীকর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহের তুরা পাহাড়ে গারো পর্বতে 'গারোহিল যোগাশ্রম' নামে ঠাকুরের এই ভাবের আশ্রমটি থেকেই ব্রহ্মময়ীর নির্দেশে যোগীগুরু পুস্তক প্রকাশ ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে জগৎহিতকর কল্যাণময় কর্মে আত্মনিয়োগ শুরু করেন। নিজেই বিদ্যালয়টির শিক্ষক হন। বালকদের ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা; জীবন গড়ার মূল ভিত, এই চিন্তা করেই– এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তিতে 'ব্রহ্মচর্য সাধন' পুস্তক রচনা করেন। এখান থেকেই শুরু হল তাঁর সরস্বতী নামা সন্ন্যাসীর মহিমা ও কৃতিত্ব। তিনি হলেন আজ হতে 'ঠাকুর নিগমানন্দ'। শ্রীশ্রী নিগমানন্দের তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা পাঠক সমাজে একটি গোপনীয় সত্য উল্লেখ করে ঠাকুরের জীবন কাহিনী সমাপ্ত করতে চাই।

বেদান্ত দর্শন বলেন, এক আত্মাই আছেন বিশ্বজুড়ে। সবই তাঁর আত্মশক্তির স্ফূরণ। তিনি এক, তিনিই বহু হয়েছেন। যাঁরা কট্টর অদ্বৈতবাদী তাঁরা 'বহু' স্বীকার করেন না। যাঁরা কট্টর দ্বৈতবাদী ,তারা 'এক' স্বীকার করেন না। কিন্তু বেদান্ত বলেন, সত্তায় স্থিতি, চৈতন্য-দীপ্তি, শক্তিতে স্ফূরতা এবং আনন্দ এই হল একং ব্রহ্মের স্বরূপ। বহুকে বহুরূপে দেখা গেলেও তিনি বহু নন। বহুরূপে

২২। পূর্বোক্ত, **শ্রী শ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী**, পৃঃ ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত নন। প্রকাশিত এক আত্মবস্তু দ্বারা। সত্য সত্যই তিনি নিজেকে বিভক্ত করেন না। বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে কেবল মাত্র প্রকাশ করে দেন। এখানে বহুত্ব মূলতঃ এক নিবিড় ঐক্যে তাঁরই একক-রূপ প্রকাশ করেছে মাত্র। তিনি এক, কখনও বহু নন। তবে বহু হন বিচিত্র পরিণামের ভিতর দিয়ে। সোজাসুজি হন না। যেমন এক সূর্য সারা জগতকে আলোকিত করে। আলোর প্রকাশ বৈচিত্র্যরূপে দেখা গেলেও আসলে সূর্য বহু হয় নি। সূর্য মন্ডল, সূর্য কিরণ, ও সূর্যের তেজ কি এক সূর্য থেকে পৃথক? শ্রুতি এজন্যই ব্যক্ত করেছেন, একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি। আরও ব্যক্ত করেন তিনি অনরণীয়ান্ মহতোমহিয়ান্ তিনি সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে ছোট– বলেই তাঁর এই দ্বিধা বৈশিষ্ট্য। এক কথায় তাঁর স্বরূপ তিনি যুগপৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ ও শক্তি স্বরূপ বলেই– বহু মনে হয়। তিনি নিজেকে মায়া দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন।

নির্বিকল্পে এই সত্যটি উপলব্ধির জন্যই শুধাংশুবালা তাঁর প্রেমকে সত্যে রূপায়িত করার লক্ষ্যেই তাঁকে স্বরূপে আনন্দবোধে বোধিত ও প্রতিষ্ঠিত করে জগতে ফিরে আসার সংকল্প সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি যে শুধুই তাঁর শুধাংশু বা ছায়া নয়; তিনি যে ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মের বির্বত বিলাস, তত্ত্বতঃ এটি জানানোর জন্যই এই প্রেমের লীলা। এরই সূত্র ধরে– গোপনীয় সত্যটি ঠাকুরের মুখেই পরিবর্তিতে জানতে পাই-

> আমি তার রূপে নয়, গুণে মুগ্ধ ছিলাম। প্রায় সারারাত বসে আমার সেবা করত। আমি বললে শুয়ে পড়ত। আবার ঘুমালে উঠে সেবা করত। যখন বিদেশে থাকতাম চুলে তেল দিত না, ময়লা কাপড়ে থাকত। আমি বাড়ি এসে কারণ জিজ্ঞাসা করলে 'বলত কার জন্য করব'? আরও একটি কারণ ছিল, ঠাকুর একদা বন্ধুবর যদুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কখনও যদি তোর বৌদিকে আগের মত আবার ফিরে পাই তবে ফিরব, নইলে এই শেষ। জগৎজননী শুধাংশু এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই তাঁকে নির্বিকল্প থেকে ফিরে এনে প্রমাণ করে দেখালেন ও জানালেন, 'আমি যেমন ওখানে আবার এখানেও।'[২৩]

এই লক্ষ্যেই স্থূলে, সূক্ষ্মে ও কারণে ধর্ম-পত্নী, মানসী এবং প্রিয়া স্ত্রী হয়ে যিনি সদ্‌গুরু নিগমানন্দের দিব্যজীবনের শাশ্বত সঙ্গিনী,তাঁকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদে অন্বিত গুরুব্রহ্মেরই বৈভব প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা চলে কি? আমাদের মত অধম অধিকারীদের ঠাকুর মহারাজ এজন্যই তাঁর ব্যক্ত ব্যক্তিরূপ: তথা তাঁর প্রকট বিগ্রহের ধ্যান পূজাদি করতে বলেছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর দিব্য-জীবনও আমাদের অনুধ্যানের বিষয়। আর সেটি করতে গেলেই ঠাকুরাণীর কথা মনে পড়া অনিবার্য। ঠাকুরের জীবন চরিত্রে এজন্য শুধাংশু চরিত্রই বেশি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীনিগমানন্দের জীবন শ্রীমাতা ঠাকুরাণীরই লীলা প্রকাশ। তিনিই তাঁকে ঘুরে ফিরে এই মর্ত্য জগতে অমৃতের সন্ধান দানের জন্য এবারে লীলা করলেন। এই লীলার একমাত্র সূত্র হর-গৌরির মিলন। জ্ঞান-প্রেমের মিলন। কীর্তনের পদেও এর সূত্র খুঁজে পাই– "কি রূপ হেরিনু মধুর মুরতি পিরিতি রসের সার। হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা মিলেনা তার।"[২৪] সত্যিই তিনি অপরূপ, অতুলনীয় এবং পরমভাগ্যবান।

২৩। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী, পৃঃ ৭৭
২৪। ঐ, পৃঃ ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীনিগমানন্দের ধর্মীয় চিন্তা

তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ এবং প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে স্বামী নিগমানন্দ ধর্মের সকল শাখায় সম্পূর্ণতা অর্জন করেন। যে স্বর্গীয় অমৃতে তিনি হৃদয় পাত্র পূর্ণ করেছেন কানায় কানায়, এখন সেই সুধায় বহু পিপাসিত প্রাণে তৃষ্ণা নিবারণই তাঁর ধর্মমত দান। তাঁর ধর্মমতগুলি হল-

(১) "সনাতন ধর্ম প্রচার ও সৎ শিক্ষা বিস্তার।"[১]

(২) "সর্বধর্মসমন্বয় অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম বিস্তার।"[২]

(৩) আর্ত-ক্লিষ্ট-অনাথ-রুগ্ন-দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। সেবা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ।

(৪) "নররূপে-নারায়ণের সেবা।"[৩]

(৫) গৃহী-সন্ন্যাসীর মহামিলনে মঠাশ্রম পরিচালন।

(৬) "আর্যঋষিদের ভাবধারাকে পুনঃ অবতারিত করণ।"[৪]

(৭) "আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন।"[৫]

(৮) ভক্তিগঙ্গার সাথে ভাবগঙ্গার মহামিলনের জন্য ভক্ত-সম্মিলনী উদ্‌যাপন।

(৯) সাপ্তাহিক সংঘ মাধ্যমে সববেত শক্তির উদ্‌বোধন ও পারস্পারিক ভাববিনিময়। সংঘ শক্তি কলিযুগে–এই ভাব সংরক্ষণ।

(১০) দেশে সনাতন ধর্মপ্রচার ও আত্মগঠনের জন্য তাঁর অমূল্য কীর্তি– ব্রহ্মচর্যসাধন, যোগীগুরু, জ্ঞানীগুরু, তান্ত্রিক গুরু ও প্রেমিকগুরু গ্রন্থ রচনা।

১। নিগমানন্দ পরমহংসদেব , অমৃত সুধা, মেহেরপুর শ্রীশ্রী গুরু ধাম প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ ১৪১০, পৃঃ নং- ৩
২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩
৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩
৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩
৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ২২

Dhaka University Institutional Repository

(১১) মানুষের মাঝে ঐহিক ও পারলৌকিক জ্ঞানের প্রকাশ জন্য আর্য ঋষিদের স্মরণে-আর্যদর্পন নামে তাঁর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ।

(১২) গুরু-করণ মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ। এই লক্ষ্যে তাঁর অসাম্প্রদায়িক নাম রূপে বিশেষ উপহার, 'জয়গুরু' মহানামের সম্ভাষণ ও প্রচার।

(১৩) নামরূপহীন বিমূর্ত গুরু ব্রহ্মের আসন মঠাশ্রমে প্রতিষ্ঠায় সকল ধর্মের সাথে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অর্জন ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ দান।

(১৪) বেদান্ত ধর্মমত প্রচারই তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

(১৫) এক আত্মবোধেই সকল ধর্ম, মত পথের সাথে মহামিলন ও ভালবাসার সূত্র স্থাপন। 'মদাত্মাসর্বভূতাত্মা' 'সর্বাত্মভূতমদ্আত্মৈব', এই মহামিলন মন্ত্র তাঁরই রচনা।

(১৬) তাঁর ধর্মমতের মূলমন্ত্র– ভালবাসাই ভগবান, ভালবাসার সাধনাই ভগবানের সাধনা।

(১৭) তিনি যুগপৎ ঋষিপন্থা ও মুনিপন্থা গ্রহণ করেছেন। আত্মযাযী ও পরার্থযাযী উভয়ের সংঘবদ্ধ মিলনে দেশ, জাতি, সমাজ ও পরিবারের কল্যাণ সাধনই তাঁর ধর্মমত। 'আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ– নিজেরও মুক্তি জগতেরও হিত।

(১৮) শ্রীনিগমানন্দের ব্রহ্মত্বলাভের মহামন্ত্র ছিল, 'অহংব্রহ্মাস্মি' বেদান্তের শ্রেষ্ঠ মহাবাক্য। এর সারাংশ-আত্মসমর্পণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রতিষ্ঠার অপর নাম আত্মবিলোপ (অহংবিসর্জন)। আত্মসমর্পণ ও আত্মবিলোপই বিরাটকে পাওয়ার উপায়। যেমন বেদের প্রতি মন্ত্রের প্রথমে 'ওঁ' শেষে 'স্বাহা'। 'স্বাহা' হল আত্মসমর্পণ 'ওঁ' হল, আত্মপ্রতিষ্ঠা।

(১৯) তিনি পুরুষদের মুক্তির জন্য যেমন মঠাশ্রম স্থাপন করেছেন অনুরূপ নারীদের মুক্তির জন্য নীলাচল মহিলা সারস্বত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২০) তিনি এক এবং বহুর সমন্বয়কারী ছিলেন। তিনি এক কে গ্রহণ করে বহুকে উপেক্ষা করতেন না আবার বহুকে গ্রহণ করে এককে ত্যাগ করার উপদেশও দিতেন না। তিনি চাইতেন, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে– এক বিরামহীন ওঁঙ্কার ধ্বনীর মহামিলন।

(২১) শিক্ষার প্রতি তাঁর উদার আহ্বান বাণী ছিল, "আমি অন্য কোন আন্দোলন বুঝিনা, আমি চাই শিক্ষার প্রসার। আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোল, এই আমার আশা ও আশীর্বাদ।"[৬] বালকদের ব্রহ্মচর্যের প্রতি তাঁর ছিল পূর্ণ উদ্দম। তিনি জানতেন, ভিতহীন অট্টালিকা ক্ষণভঙ্গুর। ঋষিধারায় বালকদের আত্মগঠনে তিনি ছিলেন পূর্ণ উদ্দমী ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। তিনি বনে জঙ্গলে গিয়ে ভগবান্ লাভের চেয়ে ঘরে বসে আর্দশগৃহী হয়ে ঈশ্বর লাভকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এতেই নিজের ও দেশ, জাতির মঙ্গল বেশি। জীবন গঠনে পিতা-মাতা মানব জীবনের প্রথম আদর্শগুরু, শিক্ষা জীবনে শিক্ষক– শিক্ষাগুরু, ধর্ম জীবনে– আচার্যগুরু, তেমনি মুক্তি মোক্ষে– সদ্গুরু। অর্থাৎ যা কিছুই করি গুরু ছাড়া জীবন অচল। সকল কাজেই গুরু-করণ প্রয়োজন, গুরু বলতে ব্যক্তি নন নৈব্যর্ক্তিক ঈশ্বরই একমাত্র গুরু। গুরু হলেন স্বচ্ছ কাঁচ, শিষ্য হলেন, যোগ্য আধার। গুরু শিষ্য প্রকৃত অর্থে ছায়া ও কায়া। এক প্রকাশমান আত্মার সাথে অপ্রকাশ অস্বচ্ছ আত্মার সান্নিধ্যকরণ। শ্রীনিগমানন্দ গুরু বলতে সদ্গুরুকেই বুঝাতেন। তিনি ইহ জীবনে ইহলোকে ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গুরু বলতে 'স পূর্বষামপি গুরু কালেনান ব্যবচ্ছাদ্ (বেদ)। এক অদ্বৈত কালাতীত ব্রহ্মকে বা এরূপ মহৎ আদর্শ সদ্গুরুকেই বুঝাতেন। গুরুর জয় অর্থে ঈশ্বরের জয়। এজন্য ঈশ্বরের করুণা লাভে অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গুরুরূপী শিক্ষকের গুণরাশি বিতরণ মাহাত্ম্য সবার প্রয়োজন বলেই তিনি গুরুকরণ সকলের জন্য একমাত্র কাম্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি এই লক্ষ্যেই শ্রীভগবানের গুরুনামের মর্যাদা ও মহিমা কীর্তন করেছেন বেশি।

৬। পূর্বোক্ত, অমৃত সুধা, পৃষ্ঠা নং- ৩

Dhaka University Institutional Repository

(২২) তিনি সমাজের অসহায়, অনাথ, এতিমদের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি। অনাথদের যোগ্য মানুষ রূপে তৈরি করার জন্য তিনি 'শ্রী গৌরাঙ্গ অনাথ নিকেতন' বা সেবাশ্রম নাম দিয়ে মঠে একটি সেবা কেন্দ্র খুলেছিলেন। ব্যবহারিক শিক্ষা তথা স্কুল এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য পরা অপরা বিদ্যায়– বিশিষ্ট বিদ্বান্ গুরু তৈরি লক্ষ্যে ঋষি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কষ্ট ব্যধি।এই ব্যাধি নিরাময়ে তিনি নিজেই উপযুক্ত বৈদ্য ছিলেন। এবং সর্বক্ষণ মঠে একজন খ্যাতনামা ডাঃ (এ্যাসিস্টেন্ট সার্জন) (স্বামী স্বরূপানন্দজী), তাঁর ডান হাত রূপে আত্ম-ক্লিষ্ট-রুগ্নের সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

(২৩) "সেবা-সহায়ে চিত্তশুদ্ধি-করণ ছিল তাঁর ধর্ম লাভে সাধনার একটি অঙ্গ। এখানে সেবা বলতে কাউকে দয়া করা নয়। সেবা-সুযোগ লাভ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করা । ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্যই জীবের সহায় হওয়া।"[৭]

(২৪) জগতের অসহায় মানুষকে সান্তনা দান ও ভালবাসতে গিয়ে তিনি ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেও তাদের মুক্তিমোক্ষের জন্য গুরুগিরি করেছেন। দীক্ষা দানে উদ্ধার করেছেন কত শত সহস্র পাপী-তাপীকে। গুরুগিরি বলতে একশ্রেণীর পন্ডিত ভাবেন, ব্যক্তি স্বার্থ আদায়ের এটি একটি শ্রেষ্ঠ ফন্দি। মূলত গুরুগিরি বলতে অধম, পতিত, শোকগ্রস্ত, ব্যধিগ্রস্ত দুর্দশাগ্রস্ত, নিপিড়িত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও পাপগ্রস্তদের আপন শক্তি দ্বারা উদ্ধারকরণ বুঝায়। যিনি পরের দুঃখ, পরের পাপ আপন কাঁধে লওয়ার যোগ্যতা ও শক্তি রাখেন, তিনিই সদ্গুরু। শ্রীনিগমানন্দ নিজ মুখেই বলেছেন, "তোমরা আমাকে সদ্গুরু বলে জানবে।"[৮] তিনি জীব জগতকে অধিক ভালবাসতে গিয়ে ব্যক্ত করেছেন, "তোমাদের– মুক্ত

৭। পূর্বোক্ত, অমৃত সুধা, পৃঃ নং- ৮

৮। শ্রীশ্রী গুরু অর্চনা ও বন্দনা বিধি, স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী, , রংপুর নলঝুড়ি আশ্রম থেকে প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ ১৪১৫, পৃঃ ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

না করা– পর্যন্ত আমিও মুক্ত হব না।"[৯] তোমাদের মুক্তি মোক্ষের জন্য আমি শত শত বার জন্মলাভ করতে প্রস্তুত।

(২৫) তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাধক রূপে বাঙলার যে মর্যাদা দান করেছিলেন তা অতুলনীয়। জগদ্‌গুরু শংকরাচার্যের আবির্ভাবের পর বিগত বার শত বৎসরের মধ্যে যুগাবতার শ্রী রামকৃষ্ণদেব ছাড়া কোন বাঙালী সাধক আজ পর্যন্ত নির্বিকল্প থেকে ব্যুত্থিত হন নি। তাঁর মত শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ সাধক বাংলায় অদ্যাবধি জন্মেন নি। তিনি আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বিষ্ঠাজ্ঞান করতেন এবং অহংকার ও অভিমানকে সুরাপান মনে করতেন। তিনি শিষ্য-সম্মিলনী না করে ভক্ত-সম্মিলনী গঠন করেছিলেন। তিনি শিষ্যের চেয়ে ভক্তের মূল্য দিয়েছিলেন বেশি। এছাড়াও তিনি বলেছেন, আমি যে চারিখানি পুস্তক রচনা করেছি সনাতন হিন্দুধর্মের অজস্র ধর্মপুস্তকের সার এতেই নিহিত আছে। অর্থ ব্যয় করে– অন্য কোন শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন নেই। এই চারিখানি মহান দার্শনিক গ্রন্থ বাক্‌বাদিনী বিনাপাণি স্বয়ং তাঁর কণ্ঠে বসে তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে জগৎ কল্যাণে প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বেচ্ছায় বহু পাপগ্রস্ত, কুষ্ঠব্যধিগ্রস্ত মানুষকে শান্তির সুশীতল বারি দানে সিঞ্চিত করেছিলেন। মৃতকে জীবন দান করেছিলেন। মৃত্যু, পরকাল ও গতির তিনি ছিলেন জীবন্ত আদর্শ ও পথদ্রষ্টা। তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাত্মবোধের অধিকারী ছিলেন। অতি উত্তম সাধকত্বের পরিচয় স্বরূপ তাঁরই রচিত ও অংকিত অভাবনীয় অসম্ভব সাধনযজ্ঞ জ্ঞানচক্রের চিত্রটি সকলের ধ্যানানুকরণীয়, দর্শনীয় ও অনুধাবনযোগ্য এবং জগৎ কল্যাণে বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার।

(২৬) জন্মান্তরবাদ, পরলোকতত্ত্ব অনেক ধর্ম মত স্বীকার না করলেও জন্মান্তরবাদ ও পরলোকবাদ আছে। সনাতন হিন্দুধর্মের বেদান্ত পথের পথিক ব্রহ্মবাদীগণই স্বয়ং জন্মান্তর ও পরলোকবাদ স্বীকার করেন না। সাধনার দৃষ্টিভক্তিভেদে– 'আছে', 'নেই' প্রকাশ পেয়েছে এক-এক ধর্মে

৯। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রী গুরু অর্চনা ও বন্দনা বিধি, পৃঃ ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

এক-এক ভাবে। যা আছে, তারই নাই বলা সম্ভব। যা নাই, তা আছে বলা সম্ভব কি? এই প্রমাণই করলেন, বেদান্তবিদ্ বেদান্ত বরিষ্ঠ স্বামী নিগমানন্দ– আপন পরলোকগতা স্ত্রীর মাধ্যমে। অনন্তের কখনও অন্তঃ হতে পারে না। সবই যখন তিনি, তখন তিনি কোথায় নেই? কোথায় তাঁর ক্ষমতার অভাব? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈচিত্র্যভেদে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসত্য, আবার বিরাটভাবে অখন্ড রূপে তাই সত্য। তিনি যখন বৈচিত্র্যের পরিণামে 'বহু'; তখন পরলোকবাদ জন্মান্তরবাদ সত্য। আবার যখন অখন্ড ভাবে এক, তখন কার জন্ম, কার পরলোক সবই অসম্ভব হাস্যকর কল্পনা। সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্ম এক এবং বহু উভয় স্বীকার করে বলেই দুই মতই স্থান পেয়েছে, শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের ধর্ম মত ও পথে।

(২৭) ব্রহ্ম যদি শুধু সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তরূপ হতেন তবে সৃষ্টি হত না। তিনি আনন্দস্বরূপ, ভালবাসার শ্রেষ্ঠ প্রতীক বলেই জীব তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছে। ভালবাসার অসীম অভাবনীয় অনন্ত শক্তির আধার বলেই তিনি বহুরূপে, বহুনামে, বহুগুণে প্রকাশিত হতে বাধ্য হয়েছেন। হিন্দুধর্মের অবতারবাদ এখানে স্বীকৃত হয়েছে। অপ্রপঞ্চ থেকে প্রপঞ্চে মায়াশরীর অবলম্বনে ব্রহ্ম যখন অবতারিত হন তখন তাঁর নাম অবতার। আর জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলে জীব যখন শুদ্ধ পবিত্র হতে হতে ব্রহ্মে মিলিত হন তখন তিনি হন সদ্‌গুরু। মূলতঃ অবতার ও সদ্‌গুরুতে কোন পার্থক্য নেই, কার্যত ভেদ পরিলক্ষিত হয়। অবতার আসেন সমষ্টির জন্য, সদ্‌গুরু আসেন ব্যষ্টি কল্যাণের জন্য। ব্যষ্টি-সমষ্টিকে কার্যত ভেদ পরিলক্ষিত হলেও মূলে এক। অবতারের মত পথকে সাধারণের মাঝে রূপ দান করাই সদ্‌গুরুর কাজ যা শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মত রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

(২৮) জগতে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির অবতার পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছেন, বাকি ছিল প্রেমাবতার। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে তা পরিপূর্ণ করলেন, তাই প্রেমাবতারই শেষ অবতার। স্বামী নিগমানন্দ এলেন জ্ঞানের সাথে প্রেমভক্তির মিলন ঘটাতে এবং নিজে আচরণ করে

Dhaka University Institutional Repository

জীবকে শিক্ষা দিতে। তিনি জ্ঞানপথে সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে ভক্তি গঙ্গায় আপ্লুত হয়ে প্রেমের বন্যা জীব জগতে প্রবাহিত করে দিলেন। তিনি অপরোক্ষ দর্শনে দেখলেন, জ্ঞানের মাঝেই প্রেম এবং প্রেমের মাঝেই জ্ঞান। দুইটির ব্যবহারিক মত পথ আলাদা হলেও মূলে প্রাপ্তি এক। শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মতের এটিই হল শ্রেষ্ঠ অবদান। এছাড়াও ভারতীয় সনাতন বৈদিক ধর্মের সার্বভৌম ৪টি শ্রেষ্ঠ সাধন– তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেম পথে চারিখানি পুস্তকে পূর্ণাঙ্গ দিক্ দর্শন তাঁর ধর্মমত পথের একটি অন্যতম দিক।

(২৯) শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মত সামান্য নয়, অসামান্য ও অসাধারণ। 'পুরুরূবা' একটি বৈদিক শব্দ যার অর্থ অনেক রূপ বিচিত্র রূপ। শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মত ছিল ঠিক তেমনি সর্বতোমুখী বিশ্বব্যাপী বৈচিত্রতায় পরিপূর্ণ 'একংসত্তা'-রই বিচিত্র রূপের মত। অর্থাৎ তিনি বিরাট ব্রহ্মের মত নিজেকে বীজাকারে গুটিয়ে আবার বনস্পতি আকারে বিস্ফারিত হয়েছেন। এখানে আর ওখানে যে একই সত্তার অভিব্যক্তি, মানুষ নির্দিষ্ট কালে তা 'আত্মনি বিন্দতি'; তিনি এই মহান্ ধর্ম মত প্রচার করেই অসাম্প্রদায়িক হয়েছেন। সর্বধর্মের সমন্বয় করেছেন। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন– উপনিষদের এই বাণী দ্বারা নিজ জীবনে বুঝিয়েছেন এখানে আর ওখানে কোন ভেদ নাই। একথা তাঁর সাধারণ মুখের কথা নয়। এ পাওয়া তাঁর হয়েছিল বোধে বা বোধিতে। মনের দ্বারা যারা অভেদ জ্ঞান কথা বলেন তারা প্রকৃত বিদ্বান্ নন। তাঁর ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য এখানেই: প্রকৃত philosopher যিনি তিনি তার্কিক নন, মরমীয়া।

(৩০) শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মত আরও স্বীকার করে– অধ্যাত্মানুভব স্বতঃ প্রমাণ। তবে আমরা সাধারণ জ্ঞানদৃষ্টিতে যে কারও অনুভবকে অপরের অনুভবের সাথে তুলনা করি এবং তারতম্য দেখাই এটি কখনও সমীচীন নয়। অনন্তকে অনুভব অন্তঃ না পেয়েই বলা এবং করা উচিত। শ্রীনিগমানন্দ ধর্ম মত আরও স্বীকার করে– পরমধাম ওখানে আর ইহধাম এখানে এ রকম ভেদবুদ্ধি ঠিক নয়। বরং বলা উচিত সব কর্মই পরমধামের অন্তর্ভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(৩১) স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে শ্রীনিগমানন্দের অভিমত– "দুই একটি ছেলে-মেয়ে হলে তোমরা ভাই-বোনের মত জীবন যাপন করবে। এটাই আর্যরীতি। পতি-পত্নী কামবিকার দূর করে প্রেমের নির্মল আলোয় দু'জনে উদ্ভাসিত হও। এটাই গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য লক্ষ্য। ঋষি ও ঋষিকার মত জীবন যাপন কর।"[১০]

(৩২) শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মত আরও জানায়– অরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকেই রূপে নামতে হয়। অদ্বৈতের শিখরে থেকেই দ্বৈতকে দেখবে। সাধারণের প্রতি বলেন– তোমরা ভক্তি পথে জ্ঞান লাভ করবে, এটাকেই আমি বলি– 'শংকরের মত গৌরাঙ্গের পথ'। শ্রীশ্রী ঠাকুর সকল ধর্মমতের উর্ধ্বে একটি মূল্যবান মতদান করেছেন– "তোরাই তো আমার ভগবান্। আমি তোমাদের মধ্যে ভগবানকে দেখতে চাই। আর সত্য সত্যই তোমরা ভগবান্।"[১১] মানুষকে ভগবান্ স্বীকার অনেকের ধর্মবিরুদ্ধ। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবমাত্রেই শিব। প্রকৃতির গুণাবরণে শিবই জীবরূপে প্রতিভাত। এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কখনও ভগবান্ সাজতে পারেন না। যখন পরিস্ফুট হয় তখনেই বুঝে উঠি সদ্‌গুরুর বাণী– মানুষগুরুর কাছে প্রার্থনা করলে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ সবকে পাওয়া যায়। এই মানুষগুরুর সবই দেবার ক্ষমতা আছে। এই লক্ষ্যেই শ্রীনিগমানন্দের আরও বলিষ্ঠ বাণী– "আমিও তোমাদের মত একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু মানুষ হয়েও সিদ্ধিলাভ করে আমি জীবন্মুক্ত হয়েছি। আমি এক সঙ্গে ব্রহ্ম আত্মা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছি, আমি যুগপৎ তিনটিতেই প্রতিষ্ঠিত আছি। আমাকে ধরলে তোমাদের ভিতর ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানের জ্ঞান আপনা-আপনি ফুটে উঠবে।"[১২]

(৩৩) বুদ্ধি ও বোধি বিষয়ক সম্পর্কে শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মত এরূপ– বুদ্ধির অনুশীলন বোধির বিরোধী নয়। বোধিই মূল, বুদ্ধি তাকে অলঙ্কত এবং ঐশ্বর্যশালী করবে– এটাই লক্ষ্য হওয়া

১০। স্বামী সত্যানন্দ, **আদর্শ গৃহস্থ্য জীবন গঠনে শ্রী শ্রী ঠাকুর**, কোকিলা মুখ, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ৩য় সংস্করণ ১৩৯০,পৃ:- ৮০

১১। পূর্বোক্ত, **শ্রী শ্রী গুরু অর্চনা ও বন্দনা বিধি**, পৃ: ১১৩

১২। পূর্বোক্ত, **অভয় বাণী**, পৃ: ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

উচিত। বোধি থেকে উৎসারিত বুদ্ধিই কল্যাণী। আমি বোধির উপর জোর দেই বেশি, কিন্তু তা বলে বুদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করি না।

(৩৪) Freedom of will- স্বাধীন ইচ্ছা প্রত্যেকের মজ্জাগত। ব্যক্তি মাত্রেই স্বাধীনতাকামী, অধীনতা তার লক্ষ্য নয়। এজন্য আমরা কেউ কারও অধীন থাকতে চাই না। কারও অধীন হয়ে জয়ী হতে চাই না। আত্ম প্রচেষ্টার মূল্যকে অবহেলা ও উপেক্ষা করতে পারি না। এই স্বাধীনতা ব্যক্তির নয়, সত্তার কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তি তা বুঝে না। প্রকৃতিতে Freedom নেই, সেখানে সবই নিয়মের অধীন। জড় প্রাণ, মন, বুদ্ধি– সবারই Process ধরা বাঁধা একেবারে। এজন্যই সাংখ্যে প্রকৃতিকে জড় বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতির পরিণামের (evolution এর) সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ প্রথমেই প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হয়ে নিজেকে free বলে অনুভব করে। অতএব অনুভবই Freedom , কর্মে নয়। কর্মের কর্তা আমরা না বুঝেই সেজে থাকি। এই অনুভবের স্তর হল– উপদৃষ্টত্ব, অনুমন্তৃত্ব, ভর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং অবশেষে প্রকৃতির সাথে এক হয়ে– স্বচ্ছন্দ কর্তৃত্ব।

যদৃচ্ছাবাদ, স্বভাববাদ এবং কর্মবাদ প্রকৃত পুরুষের বেলায় খাটে। সে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত বলে free নয়। শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মত এখানেই প্রযোজ্য এই কারণে যে, তিনি প্রকৃত স্বাধীন ছিলেন বলেই ব্যক্ত করেছিলেন,– আমার রাজ্যে মায়ার প্রবেশাধিকার নিষেধ। ঠাকুর নিজের সাধনা দিয়ে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তিনি সত্যিকার বেদের পুরুষসুক্তের পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতিকে নিজের বশে রেখেছিলেন। বাংলায় এমন শিবকল্প সিদ্ধ সাধক পুরুষ বিরল– নাই বললেই চলে।

(৩৫) শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মত আমাদের আরও অবগত করায়– এই উপস্থিত সাম্য ও উদার যুগে বেদান্তধর্ম ব্যতীত আর কোন্ ধর্ম সকলের সমানভাবে তৃপ্তি সাধন করিবে? বেদান্ত পৃথিবীর সকল জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র সম্প্রদায়ের একক ধর্ম। পৃথিবীতে সমান ভাবে যদি আমরা

Dhaka University Institutional Repository

পরিতৃপ্তি লাভ চাই তবে বেদান্ত ভিন্ন গতি নেই। কারণ বেদান্ত কোন জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র সম্প্রদায়ের ধর্ম বিষয়ক বাধ্যবাধকতার বালাই নেই। এখানে 'মদত্মা সর্বভূতাত্মা' যে অর্থে– বিশ্বপ্রেম বুঝায় তা এই সামান্য মহাবাক্যেই আবদ্ধ। তুমি আমিই, আমি তুমিই। বেদান্তের এটাই সার কথা। এর চেয়ে বৃহৎ উদার বক্তব্য আর কোন্ ধর্মে আছে? –যে ভালবাসা দ্বারা জগৎ আবদ্ধ। বেদান্ত সেই বিশ্বজনীন জ্ঞানই দান করে। আর অজ্ঞানতা দূরিকরণের জন্য মনকে জয় করার কথা বলে। আরও বলে– 'কোহং'– 'আমি কে', অর্থাৎ নিজেকে চেনার কথা বলে (আত্মানাং বিদ্ধি)। এই বেদান্ত ধর্ম প্রচারের জন্যই তিনি বাঙলার সদূরপ্রান্তে মঠ স্থাপন করেছিলেন। শুধুমাত্র নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে এখান থেকে শক্তি সঞ্চারের লক্ষ্যে।

(৩৬) স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই নিয়েই জগৎ। যেমন অন্তর ও বাইর। কাউকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে কেউ একক বা স্বাধীন নয়। বরং পরস্পর অভিন্ন ও অনুগত। আমরা যতখানি স্থূলের দাম দেই সেই অনুপাতে সূক্ষ্মের মূল্য দেই না বলেই সূক্ষ্মের প্রাবল্য বুঝতে পারি না। সূক্ষ্মকে ফুটানোর জন্যই যে স্থূল তা বুঝতে পারি না। আবার– স্থূলে যোগ না হলে সূক্ষ্মে যোগ কখনও সম্ভব না। বাইর ধরেই তো ভিতরে ঢুকা? শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম মত এটিকেও উপেক্ষা করার শিক্ষা দান করেনি বরং বিচার করে বস্তুর গভীরে প্রবেশ করারই উপদেশ দান করেছেন বেশি। তিনি এক অখন্ড অদ্বয় বৃহতের প্রতি আত্মবিসর্জন করার আহ্বান সকলকে জানিয়েছেন।

(৩৭) শ্রীনিগমানন্দ বিশ্বের জড় চেতন সবকিছুর মাঝে ভগবদ্দর্শন করতে বলেছেন, আরও জানিয়েছেন "তোমাদের দেহ ভগবানের মন্দির। এ মন্দিরকে তোরা কলুষিত করিস্ না।"[১৩] তাঁর ধর্মমতের আরও একটি বেশি প্রত্যাশা ছিল– 'সংঘ শক্তিরবোধন,' এবং 'আদর্শ গৃহস্থ' তৈরি হওয়ার কামনা। পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে জীবন গঠনই ছিল তাঁর এই মহতি প্রচেষ্টার লক্ষ্য। আর জীবনের উন্নতি যে এতেই বেশি তা সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রমাণ

১৩। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রী গুরু অর্চনা ও বন্দনা বিধি, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

করে বুঝিয়ে গিয়েছেন। 'সংঘ শক্তি কলিযুগে', এই সত্য প্রমাণ করে আজীবন কাজ করে গেছেন। বুদ্ধের 'সংঘং শরণং গচ্ছামি'-কে তিনিও তাঁর সংঘে রূপ দিয়েছেন।

(৩৮) তাঁর ধর্মমতের উদ্দেশ্য– 'আমরা চাই ধর্মের মধ্য দিয়ে এই অধঃপতিত জাতিকে উঠিয়ে তুলতে– এদের মধ্যে সেই ঋষিযুগের মহান আদর্শগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে, সে যুগের ঋষিদের মত মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠ দান আত্মার স্বরূপজ্ঞান দান করতে।'[১৪] তিনি দ্বাদশ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভূক্ত সরস্বতী নামা সন্ন্যাসী ছিলেন বলেই তাঁর মঠের নাম 'সারস্বত মঠ' নামকরণ করা হয়েছিল। সারস্বত মঠের অর্থ হল– জ্ঞানের পীঠস্থান।

(৩৯) তিনি সর্বক্ষণ চাইতেন– জগতের সকল মানুষের সাথে প্রকৃত ভাতৃত্ব ভাব, এজন্য শুরু করেছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নিজ হাতে শিষ্য-ভক্ত তৈরি করতে। তিনি একাএকা পথ চলার চেয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করাতে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি। যেমন এক মন, এক প্রাণ ও এক লক্ষ্য প্রস্তুত হলে সকলের প্রাণে সমভাবে এক আকর্ষণীয় ব্যাকুলতা ও আকুলতা সৃষ্টি হয় এবং পরিশেষে পরিনতিতে আসে অখন্ড শক্তি– ইষ্ট সিদ্ধি। তিনি জগদ্‌জীবকে একই পিতার সন্তান বলে অভিহিত করেছেন এবং আমাদেরকে পরস্পর একই পরিবারের ভাই-ভগ্নী বলে গ্রহণ করার অনুমতি দান করেছেন। তিনি এই মহতি উদ্যোগকে যে সত্য লাভের বিনিময়ে মূল্যায়ন করেছিলেন, তাহল– আমরা সকল জীব এক 'আত্মা', এই বোধ জাগ্রত হলেই একমাত্র সম্ভব– পরস্পরের মাঝে অনৈক্য, মতদ্বৈতা, ক্ষুদ্র অশান্তি এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের যতসব প্রতিহিংসা দূর করা। আর সেই মুহূর্তেই আমাদের হৃদয় বলে উঠবে 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যাজনাৎ'– আনন্দই জীবনের মূল। আনন্দই আমি, আনন্দই আমার ভগবান্। আর এই সুখ বা আনন্দকে অটুট রাখার জন্যই যত বিরোধ ও বিরোধিতা।

(৪০) শ্রীনিগমানন্দ এই পরম প্রাপ্তি আনন্দকে পাওয়ার সহজ পথ দান করেছেন, কৃচ্ছ সাধন নয়, শুধুমাত্র চাই আদর্শ পুরুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা। বাণী দিয়েছেন–

> ভালবাসার পাত্র অযোগ্য বা হীন হলেও অপর পক্ষের ভালবাসার জোরে তারও উৎকর্ষ হয়ে যায়। ভালবেসে যেমন চিত্তের উৎকর্ষ হয়, ভালবাসা পেয়েও তেমনি চিত্তের উৎকর্ষ হয়ে থাকে। খাটি প্রেম বা ভালবাসা পাওয়াও বহু সৌভাগ্যের কথা। আমি এই ভালবাসার কথাই প্রচার করতে চাই। আমার শিষ্যভক্তদের মাঝে সাধন

১৪। পূর্বোক্ত, অমৃত সুধা,

Dhaka University Institutional Repository

ভজন করে কেউ কিছু পায়নি। যা কিছু পেয়েছে বা পাচ্ছে আমাকে ভালবেসে। সুতরাং ভালবাসাই আসল। ভালবাসাই ভগবান্। ভালবাসার সাধনাই ভগবানের সাধনা। আমি চাই– তোমরা সবাইকে ভালবেসে বুকে জড়িয়ে ধর।[১৫]

(৪১) মৃত্যু পরকাল ও গতি– সম্পর্কে শ্রীনিগমানন্দ বলেন, দুনিয়ায় যে কিছুই মানে না, স্বীকার করেনা, ঘোর নাস্তিক পর্যন্ত, সেও মৃত্যু স্বীকার করতে বাধ্য। এই পরিবর্তনশীল জগতে সকলই অনিশ্চিত, কোন বিষয়ে স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নাই কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত। শ্রীনিগমানন্দও এই মৃত্যুকে গতিরোধ করতে অপ্রচেষ্টা করেন নি। কিন্তু সাধনা দ্বারা মৃত্যু তত্ত্ব অধিগত করে অমৃত হয়েছিলেন। এবং জগতজীবকে এর হাত হতে নিস্তারের মহাকৌশল দান করেছিলেন। শ্রীনিগমানন্দ বলেছেন- এই মৃত্যুই মহা মুক্তি। মৃত্যুময় সংসারে আসিয়া মরার নামে চমকিয়া উঠিও না। এখানে কেবল জন্ম ও মৃত্যু। আমার কেহ জন্মেও না মরেও না। তুমি আমার মত হও এ জ্বালা পেতে হবে না। দেহাত্মবাদীরাই মৃত্যুর জন্য ভয় পায়। মনেকরে– মরে গেলেই সব শেষ। জ্ঞানীর চোখে জন্ম-মৃত্যু মায়– ভ্রান্তি। জ্ঞানী জানে দেহের মৃত্যু হয় দেহীর মৃত্যু হয় না। মৃত্যু; একটি নবজন্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

> মরিলেও মানুষ ঠিক বুঝিতে পারে, যে– আমি স্থূল শরীরে পৃথিবীতে ছিলাম, সেই আমিই সূক্ষ্মশরীরে অতীন্দ্রিয়রাজ্যে উপস্থিত। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহের গঠন কার্যটি সম্পন্ন ও তাড়িৎ সূত্র দেহ হইতে বিছিন্ন হইলে শূন্য হইতে নিম্নে অবতরণ করে। সেই সময় তাহার কর্ম ও জ্ঞানানুযায়ী দুই-চারিজন সেই রূপ অতিবাহিক বা স্পিরিট সঙ্গী আসিয়া মিলিত হয়। তখন সে ধীর পথ সঞ্চালনে তাহাদের সহিত স্বীয়-কর্মফলানুযায়ী লোকে গমন করে। আর পাপী সংস্কার সূত্রে গ্রথিত হইয়া অন্ধের ন্যায় প্রেতরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়।[১৬]

১৫। পূর্বোক্ত, অমৃত সুধা, পৃষ্ঠা নং- ২৮

১৬। স্বামী সত্যানন্দ, মৃত্যু পরকাল ও গতি সম্পর্কে শ্রী শ্রী ঠাকুর, হালি শহর, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হতে প্রকাশিত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪১০ সাল, পৃ: ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রী নিগমানন্দের দর্শন : ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মানুষের জানার বিষয় তিনটি। নিজেকে জানা, ঈশ্বরকে জানা এবং পাওয়া, শেষটি হল– সেই আলোকে জগৎকে জানা। এই জানার জিজ্ঞাসা এবং পাওয়াই হল দর্শন। জানার ভিত্তিটি এরকম- নিজের জানার অনুভূতি না থাকলে অন্যকে জানা যেমন অসম্ভব, এই লক্ষ্যে নিজেকে জানালাম, তারপর সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করে তাঁকে জানালাম এবং পেলাম। এখানেই শেষ মনে হলেও প্রকৃত শেষ আরও একধাপ উপরে, তাহল ঐ জ্ঞান আর বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে জানতে হবে, সেই ভূমার এই জগৎ ও জীবকে। আমার অবস্থানকে অস্বীকার করে আমি আমার বা অন্য আর কারুর সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। এই ত্রিবিধ উপলব্ধিই হল পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বিজ্ঞান, পূর্ণ দর্শন।

আমাদের যে জানা বা জ্ঞান, যাকে আশ্রয় করে আমরা বড়াই করি, সিদ্ধান্ত দেই, এ যেন ঠিক এমন– সূর্যের কাছ থেকে ধার করা চাঁদের আলোর মত। চাঁদের নিজস্ব আলো না থাকলেও সূর্যের আলোকেই সে ভাবে তার আলো। যেমন প্রাণের প্রবেগে ঝোঁকের মাথায় সংসার করি– প্রথমটায় তার মধ্যে দোষের কিছু দেখতে পাই না। এর স্বাভাবিক আনন্দটিকেই বড় করে দেখি। কিন্তু এই প্রবেগ একদিন মন্দীভূত হয়, জরা ও ব্যাধি এসে দেহকে আক্রমন করে, মৃত্যুর বিভীষিকা সামনে প্রদর্শন করে– তখন কি মনে হয়, আমি সংসার-সুখকে যে এক সময় বড় ও আনন্দের উৎস বলে জেনেছিলাম তার সত্যতা কতটুকু, এই বিবেচনায় আসে না কী? সংসার সত্যটি প্রত্যক্ষ সত্য নয় মোহ অথবা পরোক্ষ এবং এ পর্যন্তই স্বীকৃত। যতদিন মোহে অতিভূত থাকা যায় ততোদিনেই এটি সত্য, যথার্থ, কর্তব্য এবং ধর্ম। মোহ শেষ হলেই সে সংসারের দোষগুলি স্পষ্ট দেখতে পায়। আর দোষানুদর্শনের ফল রূপে তখনেই কর্তব্য ও আসক্তি শিথিল হয়ে যায়। স্ত্রী পুত্র পরিবারকে আর তখন তেমন করে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। মনের বৈরাগ্য তখন ইন্দ্রিয়েও

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রামিত হয়। যে ইন্দ্রিয়গুলি এক সময় প্রবল সঞ্চারশীল ছিল আজ তারা অকেজো। দম্ভ নিয়ে মাথা উচিয়ে আর চলতে পারে না। সে মাথা যেন কোথাও লুটিয়ে পড়তে চায়-। বিষয়ভোগ এখন আলুনি লাগে। শান্তি অন্য কোথাও; এই মনে হয়। হেথা নয় অন্য কোন খানে। অর্থ্যাৎ আমার দম্ভ ও শক্তি এই পর্যন্তই। এক কালে যাদের আমি উপেক্ষা, অবহেলা, দুর্বল, শক্তিহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলাম তারাই এখন আমাকে শাসাচ্ছে। আমি ভয়ে জড়সড়। তাই মাথা লুকাতে চাই কোন নির্বাণ আশ্রয় দানকারী দিশারীর কাছে। তাঁর পায়ে স্থান চাই – প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন আর সেবার আকূতি নিয়ে। বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় তাঁর স্নেহাকর্ষণে নিজেকে তাঁর শ্রী চরণে কমলে।

শ্রীনিগমানন্দ তাঁর দর্শনে বলেন, এই শুরু হওয়া নবদর্শনটি হল তোমার নূতন জন্ম , যথার্থ জীবন। এখন থেকে তোমার অভ্যস্ত প্রাকৃত জীবন পিছনে পড়ে রইল। সংসার যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু তোমার ভিতরটি গেল বদলে। এই বদলে যাওয়াই হল সত্যানুসন্ধান। এই অনুসন্ধানই হল জ্ঞান, সত্যপ্রাপ্তি হল বিজ্ঞান, সত্যের আলোকে জীবন যাপন হল দ্রষ্টা বা স্বাক্ষীস্বরূপ জীবন। আমার সব, আমি সবকিছুতে, কিন্তু আমি কোন কিছুতে লিপ্ত নই। এই হল নিগমানন্দ দর্শন।

নিগমানন্দ তাঁর দর্শনে বলেন, হয়- স্ব-স্বরূপানুসন্ধান কর আত্মশক্তিতে নয়- পথের দিশারী বা আদর্শ রূপে যিনি ব্রহ্মবিদ্ গুরু, সেই আচার্যোপাসনা দ্বারা তোমার স্বরূপ জ্ঞান লাভ কর। সংসারের দাবদাহ স্ত্রী পুত্রের অসদাচারণ তোমাকে যত বিরক্ত বিব্রত করবে বিবেককে ধাক্কা দিবে, উচিত অনুচিত বিবাদ বাঁধবে, কর্তব্য অকর্তব্যের দাবী শক্তি বৃদ্ধি পাবে তখনেই জ্ঞান ফুটে উঠবে, ধর্ম-অধর্ম শিক্ষা লাভ অনুসন্ধান ঘটবে তখন অবশ্যই তোমার বাইরের জগৎটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার ভারটা অনেকটা থাকবেনা জনসঙ্গেও তেমন রুচি হবেনা। দিনে দিনে এখন তোমার আপন স্বরূপ স্পষ্ট ফুটে উঠছে, আর তোমাকে বুঝিয়ে তৈরি করছে, এই হল মানুষের নিজেকে জানার বিষয়ে প্রকৃতির বিধানে একটি বিশেষ প্রয়াস। শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের এই হল, নিগম সূত্র; যার প্রথম অংশ 'চিত্তশুদ্ধির' নামান্তর।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীনিগমানন্দের জীবন দর্শনে। – এই সূত্র ধরেই উত্থিত হয়েছিল। স্ত্রী মৃত্যুতে বৈরাগ্য নেমে আসলো। এই বৈরাগ্য চিত্তশুদ্ধিরূপে বিবেক নামে উপস্থিত হল। পরিচয় পেল তার নিজ স্বরূপের। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্ন্তদৃষ্টিতে জ্ঞানের সাধনায় যিনি জ্ঞেয় তিনি ব্রহ্ম। আবার তিনি জ্ঞানও। তাহলে আমার জ্ঞান দিয়েই আমি তাকে পাই জ্ঞান রূপে। তখন তাঁর জ্ঞান আমার জ্ঞান মিলিয়ে গেলেও অবশিষ্ট থাকে জ্ঞান। তাহলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানে পার্থক্য নেই। সূর্য্যদয়ের আগে পূর্বাকাশে শুকতারা দেখে মনে হয় না কি, এবার সূর্য্য উঠবে? শুকতারা যে ভোরের আকাশের পূর্বাভাষ। এই শুকতারাই যেন বলছে– 'আজ্যোতিরেতি'– ওই যে আলো আসছে। সূর্য উঠলে পর শুকতারা তাঁর আলোতে মিলিয়ে যায়। যতক্ষণ সে বলতে পারছিল 'ওই যে আলো আসছে' ততক্ষণ তার কাছে আলো 'সৎ' অর্থাৎ অস্তি, আছে। যখন ওই আলোতে সে মিশে গেল তখন সেও নেই, অতএব তার দেখা সেই আলোও নেই। এবার তার দিক থেকে ঐ আলো নিশ্চয়ই 'অসৎ' অর্থাৎ নাস্তি নেই। অর্থাৎ অসৎ রূপে তিনি তখন অসীম। সেখানে চোখ যায় না, বাক্ যায়না, মনও যায় না, ইন্দ্রিয়াতীত বোধ। কিন্তু 'আলো' তো মিথ্যা নয়। শুকতারার দৃষ্টি মিথ্যে হতে পারে, আলো মিথ্যে হতে পারে না। তাহলে ঐ আলো আসলে যে কি বলা যায় না। তার কী যে নাম, কী যে রূপ, কেউ চিনে না জানে না। সে অনির্বচনীয়। ব্রহ্মকে আমরা আমাদের জ্ঞানের দিক থেকে মাপতে পারি না। ব্রহ্মও অনির্বচনীয়। কিন্তু তবুও 'বোধে বোধ' হয় কিন্তু প্রকাশ করে বলা যায় না। বোবার মিষ্টি আস্বাদনের মত। শ্রী নিগমানন্দ দর্শনও এই সনাতন সত্যকে চারটি কোটিতে দেখে এর সত্যতা উপলব্ধি করেছেন। যথা– 'সৎ', 'অসৎ', 'সদাসৎ' (সৎ ও অসৎ একসঙ্গে) এবং 'সৎ'-ও নয় 'অসৎ'-ও নয়। অর্থাৎ 'নসৎ নাসৎ'– তিনি যে কী তা বলা যায় না। বোধেও তার কুল মেলে না। তাঁর ইতিও কোন প্রকারে করা যায় না। কারণ 'পূর্ণমদ্ পূর্ণমিদং'– পূর্ণের সাথে পূর্ণের যোগ, গুণ, বিয়োগ, ভাগ যাই করি না কেন 'পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' পূর্ণই থাকে পূর্ণের শেষ হয় না। এ যেন শেষ হয়েও হল না শেষ। দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে যে উক্ত চারটি কোটিতে সেই সত্য সনাতনকে আমরা দেখে

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধ সৃষ্টি করি সেই দৃষ্টিভ্রম আমাদের, তাঁর নয়। তিনি সৎ, তিনি অসৎ, তিনি সদাসৎ আবার তিনি কিছুই নন এমন। শ্রী নিগমানন্দ দর্শন সার্বভৌম ঐ চারিটি কোটিকেই যোগ, জ্ঞান, তন্ত্র ও প্রেম এই সার্বভৌম চারিপথের কেন্দ্রবিন্দু নির্বিকল্পের মহাসমাধিতে পৌঁছে বোধে-বোধ লাভ পূর্বক আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ফিরে এলেন এই মর্ত্যভূমিতে। ফিরে এসে বললেন, "আমিই সেই, সেই আমি।"[১] কিন্তু ব্যবহারিক দশায় তিনি সবসময় ঈশ্বর শরণাগতির আদর্শই প্রকাশ করে গেছেন। নিজেকে দেখান নি, দেখিয়েছেন ব্রহ্মকে সদাসৎকে। তিনি কোথাও অনন্তের ইতি টানতে বলেন নি। কারণ তাঁর ইতি টানলে তিনি সীমিত হয়ে যাবেন। তিনি অনাদি, অসীম, অনন্ত ও অফুরন্ত। এই শংকর মতকেই তার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অসীম ও অনন্ত যে– সসীম ও সীমিত হন এ তাঁরই মহৎ ইচ্ছায়। 'অনোরণীয়ান মহতোমহীয়ান্' তিনি নিজেই বড়; নিজেই ছোট সাজেন, এটিই অসীমের অনন্ত ভাব অনন্ত মহীমা। বরং বলতে পারি– তিনি আছেন এটি প্রমাণের জন্যই তাঁর এতটুকু অনুগ্রহ ব্যক্ততা। শ্রীনিগমানন্দ দর্শন এই দর্শন লাভেরই পক্ষপাতি। তাঁর লক্ষ্য শংকরের মতের প্রতি অর্থাৎ অদ্বৈতানুভূতির প্রতি। এই অনুভূতিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছেন প্রেম ভক্তি তথা গৌরাঙ্গ পথে। শ্রী নিগমানন্দ এই লক্ষ্যেই তাঁর দর্শনের নাম দিলেন 'শংকরের মত ও গৌরাঙ্গের পথ'। শংকর জ্ঞানের প্রতীক, গৌরাঙ্গ ভক্তির প্রতীক। একটি অদ্বৈত, অপরটি দ্বৈত। এই দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয় তিনি যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে যতটুকু বিরোধ মিটা যায় তাঁর চেয়ে অধিক রূপে সত্য দর্শন করার প্রতিই জোর দিয়েছেন বেশি। কারণ দর্শন সর্বদা জীবের অমৃতস্বরূপ স্মৃতিই জাগ্রত করে তুলে। বস্তু বিশ্লেষণের চেয়ে দর্শনই অধিক সত্য এই অবাধিত।

ভারতীয় দর্শনের অন্য বহু বিষয়ের আলোচনা প্রাসঙ্গিক ক্রমে আলোচিত হলেও সমস্ত আলোচনার পরিশেষ হল– মুক্তি। জগৎ যখন আমাদের চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ দিতে অক্ষম তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে আমরা কোন না কোন কারণে বন্দী। এই বন্দীত্ব স্বীকার না করার নামই

১। স্বামী নিগমানন্দ, জ্ঞানীগুরু, কলিকাতা কমলা প্রেস, সপ্তদশ সংস্করণ ১৪১০ সাল, পৃষ্ঠা- ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

হল মুক্তি। আচার্য বাদরায়ণের মতে মুক্তিতে জীব নিজের স্বরূপে স্থিত হন। অতএব জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম। শ্রুতিও বলেছেন, ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হন। কিন্তু ব্রহ্ম লাভ ও শক্তি লাভ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ব্রহ্ম লাভে জীবের ভোগসাম্য প্রকাশ পায়, শক্তি সাম্যে তদনুরূপ প্রকাশ পায় না।

আবার মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্ব নিয়েও মতভেদ আছে। রামানুজ বলেন, মুক্তিতে জীব জীবই থাকেন, ব্রহ্মের সাথে কখনও এক হয়ে যান না। দেহাত্মাভিমানই মুক্তির পরিপন্থী, জীবের ব্যক্তিত্বে নহে। মুক্তজীবের ব্যক্তিত্বও অপ্রাকৃত দেহ- মনাদি থাকে। রামানুজের সাথে বৈষ্ণবাচার্যগণ এই লক্ষ্যে এক মত।

শংকর বলেন, জীব স্বরূপত ব্রহ্ম। কিন্তু সংসার দশায় আত্মবিস্মৃত। জীবের এই আত্মবিস্মৃতির হেতু অবিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, জীব তখন ব্রহ্ম হন। অদ্বৈতবাদীর মতে মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্ব বা দেহমনাদি থাকতে পারেনা। জলবিন্দু যেমন জলে মিশে যায়, ঘট ভেঙ্গে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হয়, মুক্ত জীবও তদ্রূপ ব্রহ্ম অভিভাগ প্রাপ্ত হন। বৌদ্ধেরা এই মুক্তিকে নিঃশেষ নির্বাণ বলেছেন। যদিও নির্বাণ বিষয়ে মতদ্বৈততা আছে তবুও নির্বাণ নিঃশেষ নয়, নির্বাণ বিলীন অর্থে যুক্তিযুক্ত, নিভে যাওয়া অর্থে নয়। বুদ্ধও বলেছেন, মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্ব থাকেনা। অর্থাৎ দীপ নির্বাপিত হলে যেমন দীপ দেখা যায় না মুক্তজীবেও আর সন্ধান মিলে না। নির্বাণ যুক্তি তর্কের অন্তভূর্ক্ত নয়, নির্বাণ সমাধি উপলব্ধ। সমাধি ছাড়া নির্বাণ উপলব্ধি যথার্থ নয়। বুদ্ধ এই নির্বাণ সমাধিতে পৌঁছেই দুঃখের আত্যন্তিক মুক্তির কথা উচ্চারণ করেছেন। নির্বাণ যদি সূখ আনন্দস্বরূপ না হত তবে বুদ্ধ নির্বাণের জন্য এত কঠিন ত্যাগ ব্রতের সমূখীন হতেন না।

নির্বাণের শর্ত হল, বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হয়ে ধৈর্য দ্বারা সেই বুদ্ধিকে নিয়মিত করণ, শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ, রাগ-দ্বেষ দূর, নির্জনসেবী, লঘুভোজী, কায়মনবাক্য সংযত, নিত্য বৈরাগ্য, কঠোর ধ্যানপরায়ণতা, অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ, মমতা শূন্য শান্ত এমন ব্যাক্তিই নির্বাণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্তি যোগ্য। বুদ্ধের জীবন দর্শন কি এই ত্যাগাদর্শ প্রমাণ করে না? নির্বাণ যদি নিবে যাওয়া অর্থ বুঝায় তবে আত্মা অজর, অমর বেদান্তের এই চিরন্তন বাণী মিথ্যা প্রমাণ হয়। গীতার ভগবান্ বাণী অসত্য হয়। নির্বাণ অর্থ 'অহংবিনাশ' নয় বরং 'অহংপ্রতিষ্ঠা'-ই বুঝায়। নইলে বুদ্ধ সংঘ বলতেন না, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। এই অহং ব্যক্তি-অহং নয়, সামগ্রিক অহং। বিশ্বের আদি মূল অহং। বস্তুর যথার্থ দর্শন বা ভ্রমবুদ্ধি অপনয়নই মুক্তি এবং অযথার্থ দর্শনই বন্ধন। মনের যে শান্তিরূপ নির্মল আনন্দ তাহাই মুক্তি এবং মনের যে স্বরূপ প্রকাশ, তাহাই বন্ধন। পৃথিবীর কোন বস্তুর প্রতি আস্থা না থাকার নামই মুক্তি এবং অনাত্মীয় পদার্থের প্রতি বিন্দু মাত্র আস্থা থাকাও সুদৃঢ় বন্ধন। অনিত্য সংসারের সমস্ত সংকল্প ক্ষয় হওয়ার নাম মুক্তি এবং সংকল্প মাত্রেই বন্ধন। সম্পূর্ণ রূপে ইচ্ছা বাসনার ত্যাগই মুক্তি এবং বাসনা মাত্রেই বন্ধন। সকল প্রকার আশা ক্ষয় হইলে মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মুক্তি এবং আশা মাত্রেই বন্ধন। আসল কথা হল– পার্থিব সুখ-দুঃখ, পার্থিব অভিলাষ প্রভৃতি সকল প্রকার পার্থিব ভাবের বিলীন অবস্থাকেই নির্বাণ বলা যেতে পারে। অদ্বৈতবাদীগণও বলেন, 'নির্বাণন্তু মনোলয়ঃ' অর্থাৎ মনের লয়ই নির্বাণ। বুদ্ধ এই দৃষ্টিতেই কি বলেননি– বাসানা কামনাই দুঃখের কারণ?

ভগবান্ বুদ্ধদেব জরা মরণ ও পীড়া জনিত দুঃসহ দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়াকেই নির্বাণ বা মুক্তি বলেছেন। সুতরাং নির্বাণ শব্দে সত্তা বিলোপ বা একেবারে মহা বিনাশ নহে; কেবল মাত্র ভ্রম, ঘৃণা ও তৃষ্ণা এই তিনটির অত্যান্তিক উচ্ছেদই নির্বাণ শব্দ কথিত।' বুদ্ধের নির্বাণ শুধু শূন্যতা বা নৈরাত্ম্যরূপা প্রজ্ঞা নয়। নির্বাণ হল, প্রজ্ঞা ও করুণারূপী উপায়ের যুগনদ্ধতা। এই উপায়টি হল ভব অর্থাৎ সত্তা বা স্থিতি। ভব ও নির্বাণ দুই-ই যাঁর মধ্যে যুগপৎ বিকশিত চিত্ত দু'য়ের সামরস্যে বিদ্ধৃত, তিনিই সম্যক্ সম্বুদ্ধ। শূন্য হৃদয় না হলে প্রেমের চিদ্ ঘন জেগে উঠবে কি করে? অতএব বুদ্ধের নির্বাণ অর্থ হল, শূন্যতা ও করুণার ধ্যান। শূন্য বা আকাশ চিত্ত না হলে বুদ্ধের মত করুণা পরায়ণ কে হতে পারেন?

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মত জীব দুঃখে কাতর আর কে ছিলেন? এই শুন্য আকাশ বোধ এবং অশেষ কল্যাণ গুণ সম্পন্ন সত্তাই হলেন নির্বাণ বুদ্ধ।[২]

শ্রীনিগমানন্দদেব বলেন–

গুণ অর্থাৎ প্রকৃতিদেবী যখন পুরুষ ত্যাগিনী হন, অর্থাৎ যখন তিনি আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধ্যানে মহৎ ও অহংকারাদি রূপে পরিণতা হন না, পুরুষ বা চিদ্স্বরূপ আত্মাকে রূপরসাদি কোনরূপ আত্মবিকৃতি দেখাইতে পারেন না, পুরুষ যখন নির্গুণ হন, অর্থাৎ যখন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখনকোন প্রকার প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিম্বিত হয় না, আত্মা যখন চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, বিকার-দর্শন হয় না, ঐরূপ নির্বিকার বা কেবল হওয়াকেই কৈবল্য বা নির্বাণ মুক্তি বলে।[৩]

যারা এ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন নি তারাই ব্যক্ত করেছেন নির্বাণ অর্থ নিঃশেষ, নিভে যাওয়া বা শূন্য। পরবর্তীতে এরাই শূন্যবাদী।

বৈদিক দার্শনিকগণের মতে মুক্তি হল ব্রহ্ম নির্বাণ। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়িকে বললেন, 'সৈন্ধবলবণ খন্ড যেমন সর্বত্রই লবণরসময়, তাহার ভিতর ও বাহিরে কোন ভেদ নাই, ওরে মৈত্রেয়ি! ঠিক তেমনি এই আত্মা পূর্ণ প্রজ্ঞাঘনই (চৈতন্যস্বরূপই), তাহার অন্তরে-বাইরে কোন প্রকার প্রভেদ নাই।' আচার্য শংকরেরও এই মত, তিনি বলেন– "মোক্ষাবস্থায় শুধু উপাধির বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না।"[৪] রামানুজ এই মত খন্ডন করে বলেন, "মোক্ষে অহং প্রত্যয়ের নাশ হয় মানিলে আত্মনাশই অপবর্গ বলিয়া প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ মোক্ষের জন্য কে যত্নবান হইবে?"[৫] শংকর এই অহং নাশকে বুদ্ধি অহংকার নাশ বুঝিয়েছেন। শুদ্ধ অহং পদার্থের নাশ

২। প্রেমিকগুরু, স্বামী নিগমানন্দ , কোকিলা মুখ, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হতে প্রকাশিত, ১৪ শ সংস্করণ ১৪১১ সাল, পৃঃ ১৪৯

৩। ঐ, পৃষ্ঠা নং- ১৪৯

৪। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা ৭৯

৫। ঐ, পৃষ্ঠা নং- ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করেন নি। যাঁরা নির্বাণকে শূন্য অর্থে বা শূন্যবাদ অথবা বুদ্ধের শূন্যবাদ বলেন তারা আত্মযাযী মুণি ধারার পথিক। এঁরাই বুদ্ধ সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট হীনযানী সম্প্রদায়। আর যাঁরা সকলের নির্বাণের জন্য আগ্রহান্বিত 'তাঁরা মহাযানী'। এঁরা হলেন ঋষি ধারার পথিকৃত। বুদ্ধ যদি নিজের মুক্তি চাইতেন, এই লক্ষ্যকেই কাম্য ভাবতেন, তবে তাঁর বাকী জীবন জগৎ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতেন না। মহাযানী বুদ্ধও একারণেই ব্যক্ত করেছিলেন–'আমি একার মুক্তি চাই না– চাই সবার মুক্তি। যে পর্যন্ত সবাই মুক্ত না হচ্ছে সে পর্যন্ত আমি ব্রহ্ম নির্বাণে তলিয়ে যাব না, সবার সঙ্গে থেকে তাদের উদ্বুদ্ধ করে চলব।' বুদ্ধের জীবন দর্শন এই প্রমাণ করে, জগতের অগণিত দুঃখ পীড়িত জনগণকে সাগরে ভাসিয়ে তিনি নির্বাণ মুক্তি চাননি। বুদ্ধ ধর্মের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য অবলোকিতেশ্বর বলেন,

> যতদিন পর্যন্ত একটি জীবও নির্বাণ লাভে বঞ্চিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত অবলোকিতেশ্বর পর নির্বাণ গ্রহন করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধ সামান্য ছাগশিশুর জন্য নিজেকে বলির জন্য উৎসর্গ করতেন না। প্রকৃত আধিকারিক পুরুষগণ নির্বাণকে তুচ্ছ করে সকল জীবের মুক্তির অপেক্ষাকেই আপন দায়িত্ব বলে বরণ করেছেন। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন কেউ নিজের জন্য মোক্ষ মুক্তি বা নির্বাণ চাননি, বরং নিজে মুক্ত হয়ে সবার মুক্তি মোক্ষ প্রত্যাশা পূর্বক পরার্থে নিজেকে আত্মৎসর্গ করে গেছেন। এখানেই প্রমাণ হয়, বুদ্ধ হীনযানীদের হীনমতালম্বী ছিলেন না। শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের বিশেষত্বও এখানে এই কারণে যে তিনিও ব্যক্ত করেছেন, তোমাদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমিও মুক্ত হবনা।[৬]

শ্রী নিগমানন্দ ইচ্ছা করলে ব্রহ্ম নির্বাণে নিজেকে নিঃশেষে বিলয় করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। শিষ্য উদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছায় তিনি শক্তিকুটে পরিণত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর চিত্ত

৬। স্বামী সত্যানন্দ, আধিকারীক পুরুষ নিগমানন্দ, কোকিলা মুখ, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হতে প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ সাল, পৃঃ ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

শূন্য আকাশবোধ এই অর্থে বুদ্ধ নিগমানন্দ এক পর্যায়ভূক্ত। আবার জীব দুঃখে কাতর হওয়া উভয়ে সমধিকারী। বেদান্ত দর্শনের মূল কথাই হল আমিত্বের প্রসার। 'সংকীর্ণতাই মৃত্যু, ব্যাপ্তিই মুক্তি'।

সকল দর্শনের মতবাদে বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক দার্শনিকেরই এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে । আপন প্রজ্ঞা ও প্রতিভা নিয়ে প্রত্যেক দার্শনিকই স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অক্লান্ত শ্রম ও অধ্যাবসায় দ্বারা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার এমনও দেখা যায় ঐ দর্শনের একশ্রেণীর মতবাদীরা বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতার ফলে দর্শনের সরলার্থ ছেড়ে দিয়ে আপন মতের প্রতি জোর দিয়ে আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠায় মেতে উঠেন। মতবাদীদের একটি কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা উচিত– প্রত্যেক দার্শনিককে তত্ত্ব দ্রষ্টা হওয়া চাই। উপনিষদ একারণেই জোর দিয়ে বলেছেন; 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ' বেদ উপনিষদের ঋষিগণ সাক্ষাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা এবং তত্ত্বআবিষ্কারক ছিলেন । তাঁরা আগে তত্ত্বকে দর্শন করেন অতঃপর তা প্রচার করেন। বর্তমান দর্শন বিজ্ঞানীগণ বিদ্যা বুদ্ধি যুক্তি তর্কের প্রতি দর্শন প্রতিষ্ঠায় জোর দেন কিন্তু প্রকৃত দার্শনিকগণ আগে নিজের অন্তরে ডুব দেন, যখন সেই তত্ত্ব হৃদয় কন্দরে উজ্জ্বল জ্যোর্তিময় রূপে ফুটে ওঠে দেখতে পান এবং আপন সত্তার সাথে সেই তত্ত্বের একাকার দেখেন– একমাত্র তখনই তাঁরা সেই তত্ত্বকে যুক্তি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই মননশীল মণীষী ব্যক্তিত্বদের সাথে যুগ পন্ডিত দার্শনিকদের মত পার্থক্য এখানেই। মনে হল, কগজ কলম নিয়ে লিখতে বসলাম, দর্শন এমন ভ্রান্ত বিষয় নয় যে, তা জগতের কাজে লাগবে দর্শন হল অভ্রান্ত বিষয়। প্রয়োগ মাত্রই কার্য শুরু হবেই হবে। শত চেষ্টাতেও তাকে ঢেকে রাখা যাবেনা। চিন্তাশীল এমন আমরা অনেকেই হতে পারি কিন্তু তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি হওয়া সাধারণ কথা নয়। গীতায় একারণেই ভগবান্ বলেছেন–মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। সহস্র সহস্র মানবের মধ্যে দৈবাৎ একজন সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি হন তত্ত্বদর্শী। অর্থাৎ প্রকৃত দার্শনিক। তাঁর বাণী অভ্রান্ত, চির শাশ্বত, সনাতন। এই 'সত্য'–'সত্যত্বম্ অবাধ্যত্বম্' কোন কালে বাধিত হবেনা। এই সত্য অনপেক্ষ শাশ্বত। এজন্যই এর এমন অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই নিরপেক্ষ সত্য সার্বজনীন সত্য।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণেশ্বরের ঋষি রামকৃষ্ণ এবং নির্বিকল্পব্যুত্থিত সিদ্ধসাধক নিগমানন্দ সত্যের বিমল দ্যুতি অনুভব করেছিলেন বলেই 'যত মত তত পথ'– সিদ্ধান্ত থাকলেও এবং দার্শনিক চিন্তাচেতনার সাধারণ অধিকারীগণের কাছে অভ্রান্ত সত্য মনে হলেও, উচ্চ দার্শনিকের উচ্চ সত্যে ভাব বহু হলেও মূলে 'এক সত্য' প্রমাণ করে গেছেন। তাঁরা এক সত্যকেই বিভিন্ন ভাবে দেখে তৃপ্ত হন বলেই বিরোধ করেন না বরং সমন্বয় সাধন করেন। শ্রী নিগমানন্দ 'সর্বধর্ম সমন্বয় অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্মের বিস্ত ার'- চেয়েছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই দর্শন টিকে না। কিন্তু যাঁরা সত্যকে প্রকৃত দর্শন করেছেন, অপ্রাকৃত দার্শনিকবলে সিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তারা বৈষম্যের মাঝে সর্বক্ষণ সৌসম্য দেখেন। তাঁরা সকল কিছুকে এক সত্য বলে দেখেন এবং এক সত্যকে সকল কিছুর মধ্যে বিদ্যমান দেখে মুগ্ধ আপ্লুত হন। সর্বধর্ম মানে যদিও এক অর্থে সকলের নিজ নিজ ধর্ম, মুলত কিন্তু ধর্ম এক সত্য এক। এক এক জনের দৃষ্টিতে একেক সত্য ও তাদের ধর্ম বিভিন্ন মনে হলেও মুলত ধর্ম এক, সত্য এক। যিনি সত্য তিনিই ধর্ম, যিনি ধর্ম তিনিই সত্য। এই সত্য ও ধর্মকে যখন ব্যক্তি ব্যক্তিগত করে–তখনই তার অনাবস্থা দোষ দৃষ্ট হয়। এ আসে হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, বৌদ্ধ এগুলি ধর্ম নয়- মত পথ। বস্তত ধর্ম ও সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। অতএব সর্বধর্ম বলতে যখন এক ধর্ম এক সত্য দেখবেন তখন বিভেদ বৈষম্য নিস্পত্তি। অতএব সর্বধর্ম সমন্বয় অসম্ভব নয়, সম্ভব। সম্প্রদায় ভাল কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা অন্যায়। অসাম্প্রদায়িক তখনেই গড়ে ওঠা সম্ভব যখন তুমি নিজেকে চিনবে জানবে তখন সে যে তার দেখবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ব্যবহারিক পরিচয় মাত্র। তোমার প্রকৃত পরিচয় তুমি চৈতন্য, আর মানুষ অর্থাৎ মান্+হুস। মানুষ অবশ্য এই চেতনা বা হুস স্বরূপ মাত্রাজ্ঞান থাকতে হবে। অতএব তোমার দ্বারা অবশ্যই তখন মনুষত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব জাগ্রত হওয়া সম্ভব। এই সত্যের চরম শিখরে যখন তোমার স্থান হবে তখন কি তোমার নিকট সম্প্রদায় বড় মনে হবে? না-বিশ্বের সবাই আমরা এক চেতন পিতার এক চেতন সন্তান, এক সম্প্রদায়, এই মনে হবে, না অন্য কিছু? নীচে যত অবস্থান করবো তত খুঁটিনাটি দেখবো, উপরে যত উঠব সব দৃষ্টির অগচোরে

Dhaka University Institutional Repository

তখন সব একাকার হয়ে মিশে যায়না কি? প্লেনে উঠলে উপর থেকে নীচের ঘরবাড়ী গাছ-পালা গুলি কেমন ছোট দেখায় এক সময় সব শুন্য একাকার। জাত ধর্ম বর্ণ গোত্র এগুলিও এক দৃষ্টিতে সত্য, আবার এক দৃষ্টিতে অসত্য। সত্যাসত্য তাহলে আপাত পরস্পর বিরুদ্ধ. পরিণামে কিন্তু অবিরুদ্ধ অভিন্ন এক এবং অদ্বৈত। যে কোন বস্তুর ভিতর ও বাইর এই দৃষ্টি অবশ্য স্বীকার করতে হবে। একটিকে স্বীকার করলে অপরটিকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রত্যেক পদার্থের বাইর ও ভিতর আছে এটি যুক্তিতর্কাতীত। অতএব বাইর-ভিতরেরই অংশ। বীজ থেকেই অংকুর ফলমুল। ফলের খোসা ছোবড়া আঁশ স্বীকার করলে– ফলের ভিতর যে বীজ আছে এবং বীজেরই যে বৃক্ষ রূপে প্রকাশ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ ও স্পর্শ তার ভিতর থেকেই ফুটে ওঠে এবং বাইরে শুধু তার সৌন্দর্য ধারণ করে। তাহলে ভিতর-বাইর আপাত বিরোধী মনে হলেও মূলে কিন্তু একেরই আপাত ভিন্ন এই দুই অবস্থা। যার ভিতর, তারই বাইর। যার বাইর, তারই ভিতর। যার বহু তারই এক। যার এক তারই বহু। তত্ত্বদর্শী দার্শনিক ঋষিগণ অন্তর দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি পূর্বক এই অদ্বৈত শাশ্বতকে পরখ করেই এই সত্য সনাতনকে স্বীকার পূর্বক বলেছেন তদন্তরস্য তদু সর্বসাস্য বাহ্যত। তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি; যেমন আমাদের বাইরের চোখ আবার অন্তর চোখ। অন্তরে দেখা না হলে বাইরে প্রকাশ সম্ভব কি? চোখ একটি যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রটি দেখে মন দ্বারা, মন দেখে প্রাণ দ্বারা, প্রাণ দেখে চেতনা বা আত্না দ্বারা। এই আত্মাই হল এক চেতন্য পদার্থ। এই এক চেতন পদার্থই বিশ্বের সবকিছু জড় উদ্ভিদ স্থাবর জঙ্গম সাগর- মহাসাগর পাহাড়-পর্বত বৃক্ষলতা আকাশ বাতাস সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ ও ধারণ করে ধরে আছে। তঁকে ধারণ করেই প্রত্যেকে বিকশিত ও ক্রমবিকশিত ও পূর্ণবিকশিত হচ্ছে. হয়েছে, এবং হবে অনাদিকাল ধরে চলছে, চলবে। স্থুল সূক্ষ্ম ভেদের এই যুক্তি যদি সত্য হয় তবে শ্রীনিগমানন্দ দর্শন 'শংকরের মত ও গৌরাঙ্গের পথ' কেন এক সত্য প্রকাশ করবে না?

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক বরিষ্ঠ শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের বিশেষত্ব এখানেই। তিনি অপরোক্ষ দর্শনে শংকর এবং গৌরাঙ্গকে এক ভূমিতে দেখেই নির্বিঘ্নে নিঃসংকোচে এবং সোৎসাহে বলতে কোন দূর্বলতাই প্রকাশ করেন নি যে তাঁরা আলাদা। শংকর এবং গৌরাঙ্গ এই দুইজন সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন মতালম্বী। দিন ও রাত্রির তুলনার মত। একজন দ্বৈতবাদী একজন অদ্বৈতবাদী। একজনের মহাবাক্য–'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' জীব স্বরূপত ব্রহ্ম। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'– ঈশ্বর এক তার কোন দ্বিতীয় নেই। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' [আমিই ব্রহ্ম]। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'- [আমার আত্মাই ব্রহ্ম]। 'প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম'– [আমার জ্ঞানই ব্রহ্ম]। 'তত্ত্বমসি'–[তুমিই আমি আমিই তুমি]। এই হল শংকর দর্শন। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত মায়াবদ্ধ তাই স্বীয় স্বরূপ বুঝতে পারেনা- সে কে? কি তাঁর পরিচয়? জ্ঞান দ্বারা যখন এই অজ্ঞান দূর হয় তখনই জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই হল শংকর দর্শনের দার্শনিক অভিমত।

অপর দিকে গৌরাঙ্গের মহাবাক্য– জীব ব্রহ্ম নয়, কখনও নয়। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস। তিনি প্রভু, আমি তাঁর ভৃত্য বা দাস। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম হতে পারেন না। জীবের পক্ষে ব্রহ্মের ন্যায় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হতে পারা সম্ভব নয়। এই হল গৌরাঙ্গ দর্শনের দার্শনিক মত। গৌরাঙ্গ দর্শন হল– ভক্তভাব, অনুগত ভাব। ভক্তির পথ, ভক্তের পথ। অহংকার জীবের কখনও সাজে না, সাজলে সাজে– শ্রীভগবানেরই। তিনি স্রষ্টা, আমরা তাঁরই সৃষ্ট অনুগত জীব। তিনি অবাধ্য, আমরা বাধ্য। তিনি অসীম, আমরা সসীম। তিনি অনন্ত- অফুরন্ত, আমরা অল্প, নিত্যান্ত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।

সমন্বয়বাদী শ্রীনিগমানন্দ যুগাবতারের সমন্বয় দৃষ্টিকে আরও অনবদ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দানে চির বিরোধী শংকর গৌরাঙ্গের মিলনে সমাধিস্ত হলেন। এক অদ্বৈত অখন্ড দৃষ্টি লাভ করে তিনি 'শংকরের মত ও গৌরাঙ্গের পথ' – এই পরা বাক্ বা অনপায়িনী বাণীর ভিতর থেকে এই অপূর্ব নিগূঢ় ব্যঞ্জনা লাভ করে জগৎ বাসীকে উপহার দিলেন। যাতে দ্বন্দ্ব বিরোধের চির অবসান হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি-পান্ডিত্য-যুক্তিকে বড় করে-সত্য সনাতন পথকে যেন অস্বীকার করা না হয়, ধর্মের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। কোন বাদ সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে হিংসার সূত্রপাত না ঘটে। সাধনার অমৃত ফল সমন্বয়কে, 'তৎতুসমন্বয়াৎ' বেদান্ত সূত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণ দান করে গেলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শংকর দর্শন

আচার্য শংকর পৃথিবী শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী এবং মহাদার্শনিক ছিলেন। তাঁকে বুঝার মত লোক পৃথিবীতে অতি কম সংখ্যক। তাঁকে আধুনিক দার্শনিক পন্ডিতগণ 'মায়াবাদী' বলে যে উল্লেখ ও উপহাস করেছেন তা ঐ অজ্ঞানের বা ভুলেরই মাশুল। কোন মহামানবের জীবন দর্শন ও ধর্মমত আলোচনা করতে চাইলে তাঁর এতটুকু নিলে চলবেনা সবটুকু নিয়েই আলোচনায় অংশ নিতে হবে। শংকরের মতবাদ ও তাঁর জীবন দর্শন নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করলে তবেই সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাঁকে যে যে কারণে আমরা ভুল বুঝে থাকি গভীর ভাবে সেই কারণগুলি অনুসন্ধান করতে হবে। সূক্ষ্মচিন্তার দ্বারা উক্ত কারণগুলির উপর ধ্যাননিমগ্ন হতে হবে। বিরাটকে ভাবতে গেলে বিরাট মন অর্জন করেই বিরাটের চিন্তা করতে হবে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্থুল চিন্তা চেতনা দ্বারা কখনও সত্যের সন্ধান মিলে না। বস্তুর স্থুলতা দেখে যেমন তার মৌলিকতা জানা যায় না। তদ্রূপ শংকর সাধারণ জ্ঞানী পন্ডিত ছিলেন না তিনি ছিলেন অপরোক্ষ দার্শনিক মহাবিজ্ঞানী। জহুরী যেমন স্বর্ণ চিনে তদ্রুপ শংকরকে চেনার প্রকৃত লোক না থাকার কারণেই আজ তাকে মায়াবাদী বলে উপহাস ও উপেক্ষা প্রচার করা হয়েছে। যখন মানুষের বুদ্ধিতে কোন কিছু অনুসন্ধানে কুলায়না তখন অপব্যাখ্যাই তার খেতাব হয়। এই অপব্যাখ্যারই বর্তমান খেতাব মায়াবাদী শংকর, শংকরকে যারা খন্ডন করেছেন তারা মায়াবাদকেই বড় করে দেখেছেন। মাধ্যমিক বৌদ্ধের মায়াবাদের সাথে এরা শংকর মায়াবাদের তুলনা করেছেন। মূলত শংকরের মায়াবাদ তো তা নয়। শংকর মায়াবাদের প্রাক্ষালন স্বরূপ প্রথমেই অর্থাৎ গোড়াতেই সত্যের স্তরভেদ দেখিয়েছেন। 'মায়া' তো দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিণাম বা তারতম্য প্রকাশ। যার যেমন দৃষ্টি তিনি তো তেমন দেখবেনই তাই তার পক্ষে তা সত্য মনে হবেই। শংকর এই 'মায়া' কে শব্দগত অর্থ মিথ্যা ব্যবহার করলেও ভাবগত অর্থে 'তুচ্ছত্বপ্রতিপাদিত্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'জগৎ মিথ্যা'– শব্দটি শুনেই চমকে উঠা ঠিক হবে না তার ব্যাখ্যাটিও জানতে, পড়তে ও বুঝতে হবে। শংকর মিথ্যার যেমন ব্যাখ্যা দান করেছেন অনুরূপ সত্যেরও ব্যাখ্যা দান

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। সত্যকে তিনি তিন স্তরে ভাগ করেছেন। যথা- ব্যবহারিক সত্য, প্রাতিভাসিক সত্য, এবং পারমার্থিক সত্য। তাঁর Compromise পথটি তো তিনি দেখিয়েই গিয়েছেন।

শংকরের ব্যক্তিত্ব ছিল মায়ার মতোই অনির্বচনীয়। তিনি মায়াতীত ছিলেন বলেই মায়া তাঁকে যখনই ঢাকতে গেছে তখনই তিনি আর এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছেন এজন্য শংকর অদ্বৈতবাদী, শংকর দার্শনিক, শংকরকর্মী, শংকরভাবুক ইত্যাদি নানা মহিমায় বিকশিত হয়েছেন। শেষে দেখতে পাই শংকরকে শিবাবতার বলে পূজা দানও করা হয়েছে। তাঁকে জানতে বুঝতে চাইলে তাঁর মত মুক্ত মায়াতীত ব্যক্তিত্ব লাভের সিদ্ধ অধিকারী হতে হবে। শংকর সত্যের ভূমিকা এবং স্তর সম্পর্কে কোনটি আপেক্ষিক সত্য, কোনটি নিরপেক্ষ সত্য, তা তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। শুধু সাধারণের জন্যই 'অবিদ্বদ্ বিষয়ং বিধিশাস্ত্রম' বিধিবিধানের ব্যবস্থা করেছেন জ্ঞানীর পক্ষে নহে। জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু অজ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম মিথ্যা হলেও হতে পারে, কিন্তু জগৎ প্রত্যক্ষ সত্য। জগৎ মিথ্যা নয়। বরং ব্রহ্মই অদৃষ্ট অপ্রত্যক্ষ, অতএব মিথ্যা। জগৎ আমাদের সমগ্রের সর্বাংশ বর্তমান। স্থূল, চাক্ষুস প্রতীয়মান। কোন প্রকারে একে আমরা মিথ্যা মায়া বলতে পারিনা। এখানে সত্য মিথ্যার প্রকারভেদ দৃষ্টি করেই বিষয়টি অধিগম্য করতে হবে। যেমন শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'নহি নিত্য বস্তু কর্মনা জ্ঞানেন বা ক্রিয়তে'। যা নিত্য বস্তু তা জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা সাধিত হতে পারেনা। নিত্য বস্তু উপলব্ধি করতে হয়। শংকর ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেই জগৎ যে ব্রহ্মের মায়া এই অনির্বচনীয় শক্তিকে দর্শন করেই জগৎ মিথ্যা জ্ঞানীদের জন্য তাঁর এই সত্য বক্তব্যটি পেশ করেছেন। অজ্ঞানীদের বুঝানোর জন্য তাঁর পরামর্শ ও এর মর্মার্থ-দান করেছেন, যেমন চোখে দেখলাম, কানে শুনলাম লোকটি মৃত। এর পর অবিশ্বাসের আর কোন থাকে কি? কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পুনঃ শুনলাম, জানলাম, দেখলাম লোকটি জীবিত। বিষয়টি হল, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দেশ-কাল-স্থান-পাত্র অবস্থাভেদে পরিচালিত হয় তাই এদের পরিবর্তন স্বীকার না করে সত্য প্রতিষ্ঠার উপায় নেই। যেই মুহূর্তে লোকটিকে মৃত দেখেছি তখন লোকটি অতি গভীর মূর্ছায় ছিল তাই সবাই মৃত দেখেছি

Dhaka University Institutional Repository

এবং শুনেছি। পরীক্ষা করেও জীবিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এমনও দেখা যায় মূর্ছাব্যক্তিটির Heart beat এবং Pulse কোনই অনুভূত হয় না অথচ দেখা গেল সে মরে নি কিছু সময় পর চেতনা ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক হয়েছে। আপাত এসব সত্য প্রমাণিত দৃষ্টি ভঙ্গিটির নাম প্রাতিভাসিক সত্য। কয়েকশত বর্ষ পূর্বে জন্ম থেকে সমস্ত মানুষ জেনে এসেছে দেখেছে যে, নিয়ম মাফিক সূর্য পূর্ব গগনে ওঠে এবং সন্ধায় পশ্চিমে অস্ত যায়। যখন বিজ্ঞান প্রমাণ দ্বারা দেখালো এবং বললো- এই যে বহু যুগ, বহু কাল ধরে তোমরা যা জেনেছ, দেখেছ, বিশ্বাস করেছো ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত ও সমাধানও দিয়েছ এবং এই সিদ্ধান্তের উপর কিছু ফল লাভও করেছ; যদিও এই দৃষ্টি মিথ্যা তবুও এক প্রকার সত্য, তবে পূর্ণ সত্য নয়। তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র, তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তোমার সম্পত্তি সত্য মনে হলেও; প্রকৃত অর্থে তোমার নয়। কারণ তুমিই অনিত্য অস্থায়ী। অতএব তোমার জীববুদ্ধির ব্যবহারিক ইন্দ্রিয়গত দ্রব্যগুণজাত সত্যগুলিও অল্প সত্য। এরই নাম ব্যবহারিক সত্য। ইন্দ্রিয়গুলি যতদিন ব্যবহার প্রয়োজন মনে করবে করেছিলে তত দিনেই সেগুলি সত্য ছিল, যেমন তোমার দেহটি তোমার প্রয়োজনে ব্যবহার পর্যন্ত সত্য। ব্যবহরের প্রয়োজনীয়তা শেষ হলেই অসত্য। অতএব পরিবর্তনশীল আপাত সত্য এই জগতে চির স্থায়ী কোন সত্য নেই। সব অস্থায়ী অসত্যের সত্য। এরূপ সত্য বিশ্বাস আমাদের চঞ্চল অস্থায়ী অস্থির মনবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেহ মন প্রাণ ও বুদ্ধি পরিণামী, অতএব জড়। আত্মা অপরিণামী অবিনশ্বর শাশ্বত, তাই চেতন ও চৈতন্য এবং স্থির ও শান্ত। ইন্দ্রিয়গুলি যে সত্য দান করে তা আপেক্ষিক। নিরপেক্ষ ও পারমার্থিক সত্য হল– আত্মার স্বরূপলাভ। আমি কে? এই দেহ কি আমি? না- অন্য কেউ। এই অনুসন্ধানই নিগমানন্দ দর্শন।

জ্ঞানবাদী শংকরকে কর্মবাদীরা যে দৃষ্টিতে উপেক্ষা করেছেন তাহল, জ্ঞানই যদি সত্য হয় তাহলে কর্মময় জগতের কর্মকে, কর্তব্য ও দায়িত্বকে অস্বীকার করা বুঝায়। যেখানে জগতের কোন স্থানই নেই সেখানে কর্ম মিথ্যা, নিছক একটি ব্যবস্থাপনা ছাড়া অন্য কিছু? বাস্তবিক অর্থে শংকর কর্মজগতকে হাতের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেননি। যদি তাই হত তবে তাঁর মত অক্লান্ত কর্মীর জীবন

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যা বলে প্রমাণ হত। তিনি তো আজীবন কর্মের সাধনা করেছেন, তাঁর মত কে কর্মী আছে, মাত্র বত্রিশ বয়সে তিনি ভারতবর্ষকে যে উপহার দান করেছেন, সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, ষাটখানি বৈদিক গ্রন্থ যথা-বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত ইত্যাদি। শাস্ত্রের যে সূত্র রচনা করেছেন আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বা মহাসাধক সে কাজ করে যেতে পারেননি। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত থেকে যে দিব্যকর্মের সূচনা করে গেছেন তা যুক্তিতর্কাতীত। জগৎ মিথ্যা বলেও তিনি জগতের জন্য আপ্রাণ খেটে জীবন দান করে যাওয়ায় যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তা অলৌকিক শক্তি মত্তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। বুদ্ধের পর শংকরের আবির্ভাব কেন প্রয়োজন হল তাঁর কর্মই তাঁর প্রমাণ বহন করে। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মন্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে না গেলে আজ সনাতন হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব থাকতো না। ইতিহাস তার প্রমাণ। তাঁর কর্ম শক্তি সংগঠনশক্তি এবং ক্ষুরধার প্রতিভা এই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন জগতে একজন নিরলস অক্লান্ত কর্মী। তিনি নিজে আচরণ করে জগতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আজকাল 'মায়াবাদ' কথায় কথায় উদাহরণ স্থল হলেও মায়ার মধ্যে আমরা যে সবাই কম বেশি সর্বক্ষণ হাবুডুবু খাচ্ছি সে কথা তলিয়ে দেখিনা। একটা জীবন্ত দর্শনকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করতে হয়। যেমন জীবের সংসারাসক্তি ও প্রলোভন অনাদিকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে সামান্য কথায় কি তা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব? এই প্রবল প্রতিষ্ঠিত মোহ ও আসক্তি কি সামান্য চেষ্টায় যায়? নিশ্চয়ই সজোরে ধাক্কার প্রয়োজন আছে। এই ধাক্কাই তাঁর মায়াবাদ। যা 'মায়াবাদ' নামে পন্ডিতদের বিদ্যার কচ কচি রূপে প্রতীয়মান হয়েছে। এই চিরাচরিত মায়ামোহকে দূর করা সামান্য কথা নয়। কঠোর ত্যাগ বৈরাগ্য ছাড়া কোন ভাবেই এই সাংসারাসক্তি দূর করা সাধ্যাতীত। এজন্যেই তাঁকে সজোরে বলতে হল,'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য'। শিশুরা যখন কোন প্রলোভনের বস্তু দেখে তখন নেওয়ার জন্য জেদ সৃষ্টি করে। তখন পিতা মাতাকে ঐ বস্তুটির প্রতি ঘৃণা জন্মাতে হয় অথবা অন্য একটি প্রলোভনে আকৃষ্ট করতে হয় তবেই শিশু তার জেদ ত্যাগ করে। অনুরূপ শংকর সংসারের মিথ্যা আসক্তিকে দূর

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য বলেছিলেন 'জগৎ মিথ্যা'। সংসারের প্রতি আপাত ঘৃণা জন্মানোর জন্য। এই ঘৃণা না জন্মালে বৈরাগ্য আসবেনা। বৈরাগ্য না আসলে সত্য উদ্ধার হবে না। অর্থাৎ ব্রহ্মলোভ কে আরও শক্ত সত্য শক্তিশালী করতে আকৃষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন। শংকর জানতেন, জগৎ ও এক প্রকার সামান্য সত্য, কিন্তু উচ্চ সত্য 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্মকে জানলেই জগতকে প্রকৃত সত্যরূপে জানা যায়। এই জন্যই তাঁর ব্রহ্ম সত্য বলা। মানুষের মন হতে যাতে পাশবিক ভোগাকাঙ্ক্ষা দূর হয় এজন্যই তাঁর ত্রিকালাস্তিক শাশ্বত বাণী 'মোহমুদগর' প্রতিষ্ঠা। বেদান্তের দৃষ্টি হল অস্তি, ভাতি, প্রীতি, নাম ও রূপ। অস্তি ভাতি ও প্রীতি হল ব্রহ্ম অংশ এবং নাম রূপ হল তাঁর ব্যবহারিক প্রতিভাস অংশ। এই নাম রূপে আকৃষ্ট করা বা হওয়া সত্য বিষয় নয় এবং অস্তি ভাতি এবং প্রীতির তত্ত্বকে অধিগ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। নাম রূপ নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, জড় বিষয়। যাঁর গুণে এই নাম রূপ প্রকাশিত বরং সেই সত্যকে আকড়িয়ে ধরাই যথার্থ। যেমন আমি অমুক (রাম, শ্যাম) এই নাম রূপ আকৃতি আমি নই। আমিই হল উক্ত নাম রূপের সত্য বস্তু। এই সত্য জ্ঞান, সত্য শিক্ষা দিতেই শংকরকে জগৎ মায়া, মিথ্যা বলতে হয়েছে। এর পরেও কি বলা উচিত হবে– তিনি সত্য কথা বলে অন্যায় করেছেন? সূর্যকে মেঘ যত ঢাকাবার চেষ্টা করুক তাকে কি ঢেকে রাখতে পারে? ঢেকে রাখা কি সম্ভব? তদ্রূপ যা চির সত্য তা কারও দ্বারায় বাধিত নয় সে অবাধিত স্বয়ং প্রকাশ। সত্য একদিন মানুষের সামনে প্রকাশ পাবেই। প্রত্যেকের আসন্ন মৃত্যুই তাকে বাধ্য করে বুঝাবে– সংসার, মান, মর্যাদা, প্রভাব প্রতিষ্ঠা, অহংকার, অভিমান, জেদ এগুলি তুচ্ছ সামান্য। অসামান্য আদরনীয় হলেন ব্রহ্ম।

শংকর এসব বিবেচনা করেই ঋষি আদর্শ তুলে ধরে গীতার কালজয়ী উপদেশ ব্যক্ত করেন– সংসারী হবে, কর্ম করবে আপত্তি নেই কিন্তু নির্লিপ্ত থাকবে। নিরাসক্ত ভাবে জগতকে ভোগ করবে। তোমার বলে দাবি প্রতিষ্ঠা করবে না। অতিথি যেমন আশ্রয় প্রার্থী হয় আবার সকাল হলে অন্যত্র চলে যায়। তুমিও এই সংসারের একজন অতিথি বা আশ্রয়প্রার্থী মাত্র। গৃহ সংসার স্ত্রী পুত্র এগুলি তোমার হলেও প্রকৃত তোমার নয়। তোমার চাহিদাতেই অন্যরূপে এসব প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয় লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন শেষ হলেই তারা অতিথির মত অন্যত্র চলে যাবে। তোমার প্রয়োজনে তারা তোমার আপন হয়েছে তাদের প্রয়োজনে নয়। 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'– শংকর কালজয়ী উদাহরণ দান করেছেন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' রজ্জুতে সর্পভ্রম ক্ষেত্রে, জগৎ এবং সর্প বাধিত হইয়া পড়ে। ভ্রমবিদূরিত হইলে নিছক অধিষ্ঠান সত্তাই থাকে।' অজ্ঞানীর কাছে জগৎ সত্য, যেমন অন্ধকারের আবছা আলোয় রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয় এবং মনে ভীতি সঞ্চারও করে। আলো জ্বালালে দেখি এটি সর্প নয় রশি। তখন ভ্রম ভাঙ্গে, সত্য উদঘাটন হয় ভয় সরে যায়। জগৎ , জীব, সংসার, সর্পভ্রম মাত্র। এগুলিকে চির সত্য ভাবা যাবে না আপাত সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। মূলে লক্ষ্য রাখতে হবে চির সত্য- সুন্দরের প্রতি। যতদিন না সেই সত্য-সুন্দরের সমীপবর্তী হচ্ছি ততোদিনেই এগুলিকে নিয়ে পথ চলা। কারণ এগুলি থেকেও অনেক শিক্ষা লাভ হয়। ভুল শিখতে শিখতেই যেমন ভুল অতিক্রম। যেহেতু ভুলের ভুলা একদিন ভাঙ্গবেই। অর্থাৎ ভুল একদিন সংশোধনের পথ ধরবেই, শুদ্ধ হবেই। এই অল্প সত্য গুলিই একদিন উচ্চ সত্যে নিয়ে যাবে যদি কিনা আমার স্থির লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে সেই চির সত্য সুন্দরের প্রতি। জগৎ এই শর্তে- সত্য। মণীষীগণ এই জন্যেই এই সংসারকে 'সংসারনাট্যম' বা অভিনয় ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করেছেন। যতক্ষণ অভিনয় করবো ততোক্ষণ সত্য। যখনেই মঞ্চ থেকে গ্রীনরুমে চলে আসবো তখন সব মিথ্যা, অভিনয়। এই সত্য শিক্ষা দিতেই শংকর জগৎ মিথ্যা, কর্মবন্ধন কারণ ইত্যাদি সত্য দর্শন গুলি উচ্চারণ করে আমাদের চৈতন্য উদয় করেছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ বিচক্ষণ শিক্ষকরূপে জগৎবাসীকে সুশিক্ষা দিয়ে গেছেন তা জ্ঞানী মাত্রেই অবহিত আছেন। শিক্ষক জানেন, সত্য বাক্য শুনতে শুনতেই ছাত্র একদিন সত্য বুঝতে সক্ষম হবে। ব্রহ্মজ্ঞান যতদিন না হচ্ছে ততোদিন জগৎ সত্য, যেই মুহূর্তে ব্রহ্মজ্ঞান হবে তৎক্ষনাৎ জগৎ মিথ্যা হয়ে পড়বে তখন ব্রহ্মই সত্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে সব ব্রহ্মময় হয়ে যায় তখন জগতের আলাদা রূপ থাকেনা। এখন যেমন এই খোলা চোখে শুধুই জগৎ দেখছি ব্রহ্মকে দেখতে পাচ্ছিনা তখন এই চক্ষু দিয়েই সবকিছু শুধুই ব্রহ্মময় দেখবো, আলাদা জগৎ বলে কিছু দেখতে পাব না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়– জীবের যত দুঃখ অধ্যাসজন্য বা অবিদ্যাকল্পিত। যতদিন এই অধ্যাস বা ভ্রম জীবের হৃদয় জুড়ে থাকবে, মস্তিষ্কে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করবে ততোদিন জীবকে দুঃখ যাতনা সইতে হবে, কোন নিস্তার নেই। শংকরাচার্যের মতে অধ্যাসের অভাবেই মুক্তি। তিনি এই মুক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন– বিদেহমুক্তি ও জীবমুক্তি। শংকরাচার্যের মতে মানুষ এই জীবনেই তার জীবিত অবস্থাতেই মুক্তি লাভ করতে পারে। মৃত্যুর পর যে মুক্তি লাভ তার নাম বিদেহমুক্তি। জীবদ্দশাতেই এই জীবনে, এই জন্মেই, এই ব্যক্তিরূপেই অর্থাৎ বর্তমান দেহপাতের পূর্বেই মুক্তি লাভ সম্ভব, এর নাম জীবন্মুক্তি।

> প্রারব্ধ কর্মের জন্য জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হইলেও, জীবন্মুক্তের দেহপাত হয় না। জীবন্মুক্ত দেহধারী হইয়া থাকিলেও, দেহ এবং আত্মার সম্পূর্ণ বিভিন্নত্ব এবং জগতের মিথ্যাত্ব পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।[৭]

জীবন্মুক্তেরও সংসার আছে কিন্তু তিনি জগতের সততাবোধে সংসার করেন না। তিনি সংসারে থেকেও বিরাগী। বিকারের মধ্যে থেকেও নির্বিকার। যতদিন প্রারব্ধ থাকে ততোদিন তিনি দেহ রক্ষা করেন, প্রারব্ধক্ষয় হলেই তিনি– ঘট ভেঙে গেলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ বিলিন হয়ে যায় তদ্রূপ জীবন্মুক্ত ও দেহত্যাগ অন্তে পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যান। জীব ও ব্রহ্ম একত্ব হওয়াই হল মুক্তি বা মোক্ষ। যতদিন ভেদ ততোদিন মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা দেখা, বিশ্বাস করা এবং ফল ভোগ করা। তার কর্মের ভুলের জন্যই তাকে ফল ভোগ করা। তবে এই মিথ্যারই একটা প্রত্যক্ষ কার্যকারিতা আছে। আর একারণেই মিথ্যা, মিথ্যা হতে চায় না। শত চেষ্টাতেও সামান্য মিথ্যা প্রমাণ হলেও পুনঃসত্যরূপে কাজ করতে থাকে। অসত্যটি জীবের মনে এমন ভাবে দানা বাঁধানো যে কিছুতেই সারানো যায় না। বুঝতেছি অন্যায়, অসত্য, অনুচিত কিন্তু পরিত্যাগ সম্ভব হয় না। এর শুদ্ধতা বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। কার ইঙ্গিতে মোহিত হয়ে 'যথা পূর্বং তথা পরং' গোলমাল

৭। স্বামী সত্যানন্দ, নিগমানন্দ দর্শন, হালি শহর, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হতে প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ ১৩৯৯, পৃ. ২৪, ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিয়ে দেয়। শংকর এই জন্য জীবন্মুক্ত দেহধারী ব্রহ্মবিদ্ গুরুর শরণাগতির আহ্বান জানিয়েছেন। যেহেতু মুক্ত ব্যক্তি ছাড়া ব্যক্তির মুক্তি লাভ সম্ভব নয়, একারণেই জীবন্মুক্তের শরনাগতি লাভে শংকর গুরু ভক্তকে স্বীকার করেছেন। গুরু শিষ্য আত্মগত বা স্বরূপত এক হলেও গুরু শিষ্য ছায়া-কায়ার মত। কায়ার সাথে ছায়া যেমন সবসময় লেগে থাকে গুরুও শিষ্যের মুক্তি মোক্ষের জন্য তার সথে যুক্ত থাকে। যা কিছুই জানতে শিখতে চাই গুরুর প্রয়োজন পড়বেই। মূলত যদিও ঈশ্বরই একমাত্র গুরু তবুও মানুষ গুরু তারই মাধ্যম রূপে বিবেচিত ও গণ্য। বেদান্ত দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শনের এখানেই ঐক্য। নিগমানন্দ দর্শনেও অভেদবাদী ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠাই নিগমানন্দের লক্ষ্য। 'কালে এই মঠ থেকে বেদান্তবিদ্ গুরুর বিকাশ হবে। এক নিগমানন্দ শত শত নিগমানন্দ হবে। এ তাঁরই মুখনিসৃত বাণী। শংকরের মত অদ্বৈতবাদ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডে ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু। বাকী সব অবস্তু বা তাঁরই আলোকে আলোকিত। নিগমানন্দ দর্শন আলোচনায় সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে শংকরের মতই নিগমানন্দ দর্শনের মত এই মতই তাঁর লক্ষ্য। কখনও গৌরাঙ্গের মত নহে। কারণ গৌরাঙ্গের মত নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞান নয়। শংকরের মতই সঠিক নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান মত। বেদান্তদর্শন মতই হল নিগমানন্দদর্শন মত। শ্রীনিগমানন্দের সার্বজনীন উদার মত–বেদান্তমত। শ্রীনিগমানন্দ বলেন, "এই উপস্থিত সাম্য ও উদার যুগে বেদান্ত ধর্ম ব্যাতিত আর কোন্ ধর্ম সকলের সমান ভাবে তৃপ্তি দান করিবে।"[৮] বেদান্তের মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মস্মি'– 'আমি ব্রহ্ম'। শ্রীনিগমানন্দ এই মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও অনুশীলন দ্বারাই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। বেদান্ত দর্শন ও নিগমানন্দ দর্শন একই মতাবলম্বী।

ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, অখন্ড, নির্গুণ, নির্বিশেষ এবং সত্য, শাশ্বত সনাতন তত্ত্ব। এছাড়াও ব্রহ্ম ত্রিবিধ ভেদ শূণ্য (১) স্বজাতীয়, যেমন এক বৃক্ষ হতে অপর বৃক্ষের ভেদ। জাতিতে বৃক্ষরূপে এক কিন্তু এটি আম্রবৃক্ষ, এটি তেতুল বৃক্ষ। এমন ভেদও ব্রহ্মে নেই। (২)

৮। স্বামী সত্যানন্দ, আমি কি চাই,,কোকিলা মুখ, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হতে প্রকাশিত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪০১, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

বিজাতীয় ভেদ, যেমন– একজাতির থেকে অন্য জাতির ভেদ। অর্থাৎ বৃক্ষ ও মানুষ যেমন পৃথক জাতি। এমন ভেদও ব্রহ্মে নেই। (৩) স্বগত ভেদ– বৃক্ষের সাথে তার মূল, কান্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, প্রভেদ এরূপ ভেদও ব্রহ্মে নেই। অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত কোন ভেদই নেই। তিনি সর্বব্যাপী অনাদি অনন্ত। তিনি অংশ বিহীন সমগ্র পরিপূর্ণ সত্তা। শংকরের মতে ব্রহ্ম– সত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ। যেখানে ব্রহ্মকে সগুণ বলা হয়েছে সেখানে মায়াশ্রিত ঈশ্বরকে বুঝানো হয়েছে। এই জীব জগৎ মায়াধীশ ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত। ব্রহ্ম কিন্তু গুণাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, এক নিত্য, বিমল, অচল, দ্রষ্টা, সাক্ষী স্বরূপ, তাঁর ইতি নেই। শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের ব্রহ্ম লক্ষ্য এই-ই। আমার রাজ্যে মায়ার অধিকার নাই। কারণ মায়াই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে জগৎ ভ্রম উৎপন্ন করে। ব্রহ্মবাদী নিগমানন্দ এজন্যই মুক্ত পুরুষের দাবীর অধিকার অর্জন করে মায়ার অধিকারকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি এই মায়াকে মিথ্যা বলেননি বলেছেন– অঘটন ঘটন পটিয়শী অনির্বচনীয় শক্তি। তার কবল থেকে ব্রহ্মবিদ্ ভিন্ন কারও নিস্তার নেই। জীব আলাদা সত্তা নয়, ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব। চিত্তে চৈতন্যের আভাসই জীব। চিত্ত লয় হলে জীবাত্মাও লয় প্রাপ্ত হয়। তখন স্বাক্ষী থাকেন একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা।

অদ্বৈতবাদীগণ সরাসরি জগকে মিথ্যা বলেছেন। যদিও আমাদের মনে হয় জগৎ আছে, জগতে বিভিন্ন বস্তুও আছে মূলত এটি আমাদের স্বপ্ন ভ্রম। বাস্তবিক জগতে ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নেই। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। জগৎ এই অবিদ্যা থেকেই উৎপত্তি। রাতে ঘুম, দিনে কর্ম। আমরা দীর্ঘদিন এই অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়েছি বলেই এর ব্যতিক্রম দেখিনা। ব্যতিক্রম হলে বা দেখলে স্বীকার তো করিই না বরং তিরষ্কার করি, বিপক্ষ হয়ে যাই। এই নিয়মটিকে সত্য বলে জেনেছি বলেই এর বিপরীতকে গ্রহণ করি না। এই সত্যটি হল প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক সত্য। পারমার্থিক সত্য নয়। পারমার্থিক সত্য হল–

Dhaka University Institutional Repository

> এই যে কাল আকাশ দেখতে পাচ্ছ, এও যেমন সত্য, তেমনি এই আকাশই আবার আলোর আকাশ। দিন রাতের পর্যায়ে নয়, একই সঙ্গে। সেখানে দিন রাত নাই, ব্রহ্ম যুগপৎ আলো আর কালো, এইটি যেদিন বুঝবে সেদিন তোমার সম্যক্ জ্ঞান হবে।[৯]

পৃথিবী সূর্যকে নিত্য দিন যথা নিয়মের মাধ্যমে প্রদক্ষিণ করে চব্বিশ ঘন্টায় একবার আড়াল করছে বলেই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে নির্দিষ্টতা মাফিক আলো আঁধার আমাদের নিকট সত্য হয়ে উঠছে। মূলত সব আলোময়, আঁধার নেই। ব্রহ্মের সাথে জীব জগৎ সম্পর্ক ঠিক এই দীর্ঘ সত্যের মত অভ্যস্ত হয়েছে বলেই– জগৎ-জীবও ব্রহ্মের মত সত্য হয়ে উঠেছে। মূলতঃ এটি পারমার্থিক সত্য নয়। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে শংকর এই জ্ঞান দান করতেই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পৃথিবীর এই ক্রমবিবর্তন পদ্ধতির গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও ঐতিহ্য আজ বিজ্ঞানে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত বিকশিত হয়ে সৌরভ ছড়াচ্ছে। শংকর বলেন– দেহধারী জীব এই সত্য উদ্ঘাটন করতে পারেন এবং ব্রহ্মসাক্ষাতকার করে জীবন্মুক্ত হতে পারেন। জীব তার সত্য পরিচয় পেতে পারেন। বিজ্ঞান যেদিন এই আবিষ্কারে মনোনিবেশ করবে সেদিন জগত জীব ঈশ্বর এবং ব্রহ্মের সত্যতা সূর্যের আলোর মত আনন্দের ফোয়ারা রূপে জগৎময় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। পৃথিবী শান্তির আশ্রয় স্থল রূপে জগৎ জীবের জন্য এক অভাবনীয় দৃশ্য হয়ে উঠবে। ঋষি অরবিন্দ জীবনভর এই প্রত্যাশাই করে গেছেন। তাঁর ভাষায়–

> এতদিন ছিল শুধু পরম সত্যময় ভগবানে পৌঁছাই সমস্ত অধ্যাত্মবাদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই পরম সত্য ভগবানকে যে মাটির পৃথিবীতে নামাইয়াও আনা যায় ইহা ছিল অচিন্ত্য। ইহা যে অসম্ভব নয় আমি তা জেনেছি। একদিন এই সত্য বাস্তবায়িত হবেই হবে।দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর মানুষের দুঃখ এড়িয়ে নয়,

---

৯। লেখক অজানা, **শ্রীমৎ অনির্বাণজীর গুরু ভক্তি**, , দিনাজপুর নিগমানন্দ সারস্বত সেবাশ্রম গড়নুরপুর, ১ম সংস্করণ ২০০২, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

পেরিয়ে নব্বই ভাগ কাজ তো সম্পূর্ণ করেই গেছেন। শুধু দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথের বাণী ধৈর্য ধরে গ্রহন প্রচেষ্টা করলেই যথা- 'রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর। সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ কর। সহস্র লোকের দারিদ্রকে আপনার দারিদ্র বলিয়া স্কন্ধে বহন কর।'[১০]

এই মহান ব্রতই একদিন আমদের সত্য করে তুলবে এবং মহান সত্যের সেই সুমহান পথ দেখাবে। ১৯২৬ সালে শ্রী অরবিন্দ তাঁর অনন্য তপস্যা রূপ গবেষণায় ফল রূপে তাঁর Overmind (অধিমানস) কে অর্থ্যাৎ Cosmic Consciousness কে নামিয়ে এনেছিলেন তাঁর নিজ গন্ডির মধ্যে, এবং আশা রেখে গেছেন, প্রসারিত হোক এই আলোক জ্যোতি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে। বিখ্যাত মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এই মহাজাগতিক শক্তির (Cosmic power) পরিচয় পেয়েও স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন এই ধরায় আমাদের মাঝে এই বিজ্ঞান কিভাবে প্রকাশ পেতে পারে। শংকরের মতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভই। শংকরের মতে ব্রহ্ম এক,অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ,নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। শংকরের মতবাদ–মায়াবাদ, বিবর্তবাদ, অধ্যাসবাদ এবং কেবলাদ্বৈতবাদ। জীব জগৎ ও ঈশ্বর এবং সৃষ্টি সম্পর্কে শংকরের দর্শন হল– জীব জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র। 'বিবর্ত' শব্দের অর্থ– কারণে মিথ্যা কার্যপ্রতীতি। যদিও আমরা চোখের সামনে দেখছি, যে-প্রত্যয়ে জগতের কার্য চলছে এর কি কোনই মূল্য নেই? শংকর দৃষ্টি অধিগম্যের জন্য আমাদের একটু তলিয়ে ভাবতে হবে। সাধারণ চিন্তায় এটি সমাধান আসবে না। যদিও এই বিবর্তের উদাহরণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবুও বলছি– 'রজ্জুতে সর্প ভ্রম,'মরিচিকায় বারিভ্রম'। এই ভ্রম জ্ঞানের সময়ও বারি, রজ্জু কিন্তু বারি, রজ্জুই থাকে। অধিষ্ঠান জ্ঞান ঠিক হলেই তখন আর বারিভ্রম ও সর্পভ্রান্তি থাকেনা। ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে জীব জগত রূপে পরিণত হন না । সংসার রজ্জু-সর্পবৎ মিথ্যা, ভ্রম মাত্র। এরই নাম বির্বতবাদ। যতক্ষণ পরিণাম ততক্ষণেই এর পার্থক্য। পরিণামবাদে যেমন দধি ও দুগ্ধ,

---

১০। শ্রী ব্রজ গোপাল দাস, অমর জ্যোতি, ঢাকা, সৎ সাহিত্য প্রকাশনা, ২য় সংস্করণ ২০০৮, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

কার্য ও কারণ উভয় সত্য কিন্তু দধি-ঘৃত-ছানা-মাখন-মিষ্টি ইত্যাদি উক্ত দুগ্ধেরই পরিবর্তিত রূপ বা পরিণাম, অতএব একমাত্র দুগ্ধ রূপ ব্রহ্মই সত্য। জীব জগৎ তার আভাস বা অবছায়া চিত্তের চৈতন্যের আভাস মাত্র। ব্রহ্ম জ্ঞান পাকা যতদিন না হচ্ছে ততোদিন পরিণাম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান পাকা হলে তখন আপনিই খোলস খসে পড়বে– সর্পের খোলসের মত। অদ্বৈত মতে একই সত্য, দুই নহে। এটি হল 'দর্শন'। এই দর্শনে যিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন সেই অদ্বৈতবাদী শংকরই একসময় আনন্দলহরী, ভক্তি গদ গদ চিত্তে দেবদেবীর চরিত্র ও স্তবাদি রচনা করেছিলেন। এর কারণ হল–তাঁর মত সর্বমত সমন্বয়ী ও সর্বধর্মসামঞ্জসা উদার মত বা ধর্ম। আর কখনও কোন দেশে কারও কর্তৃক প্রচারিত হয়নি। এমন ধর্মবীর, কর্মবীর, জ্ঞানবীর প্রেমিক প্রচারক আর দ্বিতীয়টি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহ। ব্রহ্মজ্ঞান সামান্য জ্ঞান নহে। সম্পূর্ণ জ্ঞানই ব্রহ্ম জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানী শংকর অবশ্যই পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন বলেই তাঁর উদার ধর্মমত ও দর্শন অদ্যাবধিও প্রতিষ্ঠা লাভ করে আছে। প্রতিটি দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব মত থাকে এবং থাকাই যুক্তিযুক্ত, নইলে উক্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য থাকেনা। শংকরের পরিণাম দৃষ্টি দর্শন আলাদা হলেও মূল লক্ষ্যে সব এক অদ্বৈত। যেমন ছাঁদে উঠার সময় সিড়ির প্রতি লক্ষ থাকেনা যতক্ষণ না ছাঁদে পৌঁছি। যেই ছাদে পৌঁছলাম ধীরে ধীরে তখন সিড়ির দিকে তাকাই, তখন ভাবি, দেখি– এই ছাঁদও যা দিয়ে তৈরি সিড়িও তাই। শংকর দর্শনে সিদ্ধের দশা এক, সাধকের দশা এক। সাধক যখন সিদ্ধ হবে তখন দুই অবস্থাই তার মাঝে কমবেশি বিরাজ করবে। এজন্য তাঁকে কখনও এই, কখনও ঐ, এরূপ ব্যামিশ্রবাক্য বলতে হয়। তাঁর ক্রিয়ামূদ্রা না বুঝে যত বিজ্ঞে।'

শংকরপন্থী বেদান্ত দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শনের ঐক্যমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয় দর্শনে আশ্চর্য মিল। বেদান্তের মত নিগমানন্দ দর্শনও অভেদবাদী ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠাই নিগমানন্দের লক্ষ্য। নিগমানন্দ দর্শন এই লক্ষ্যে বেদান্তবাদী। বেদান্ত-বিদ্ গুরুর বিকাশই নিগমানন্দ দর্শনের মূল লক্ষ্য। 'আত্মা চ ব্রহ্ম'। আত্মার প্রসিদ্ধিতেই ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি। ব্রহ্ম ও আত্মা একই পদার্থ। 'আমি নেই', এমন কথা জীব বলেনা। বরং 'আমি আছি,' একথাই বড় ভাবে দেখে। এই

Dhaka University Institutional Repository

আমিই ব্রহ্ম। এই আমিই 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এইআমির স্বরূপ জ্ঞাত হওয়ার জন্য নিগমানন্দ দর্শন বলেন– "তোমাদেরমূল লক্ষ্য আমিত্বে প্রসার। কীট হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত আমিত্বের প্রসার করিতে হইবে। সাধারণের আমিত্ব নিজ দেহে বড় জোর স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে ডুবিয়া আছে, কিন্তু তোমাদের আমিত্বে বিশ্বব্রহ্মান্ড ডুবিয়া যাইবে।"[১১] নিগমানন্দ দর্শন আত্মব্যাপ্তিরই প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। নিগমানন্দ দর্শন বলেন-

> স্বরূপ বলিতে গুণাতীত অবস্থাকে বুঝাইয়া থাকে। ব্যক্তিত্ব ও জীবত্ব এক। প্রকৃতির গুণাবরণে ব্রহ্মই বহু ব্যক্তিত্ব ও জীবত্বে প্রকাশিত হইয়াছেন। জীব ব্রহ্মের অংশ নহে, সুতরাং নিত্যও নহে। চিত্তে চৈতন্যের আভাস মাত্র। আধার না থাকিলে যেমন প্রতিবিম্বও থাকেনা, চিত্ত না থাকিলে জীবও লয় হয়। তাই যোগপথে চিত্ত নিরোধ করিলে জীবত্ব লয়প্রাপ্ত হয়। স্বতঃই স্বাক্ষী স্বরূপ প্রকাশিত হন। ইহারই নাম আত্মসাক্ষাৎকার নতুবা ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার? আত্মসাক্ষাৎকার নহে। আপনাকে জানা আত্মসাক্ষাৎকার বলা যায়, কিন্তু তৎপুর্বে আপনার স্বরূপঅবধারণ করা চাই। জ্ঞান পথে সন্ন্যাস যোগ অবলম্বনপূর্বক ব্যক্তিত্ব পরিহার করিয়া শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন কিংবা ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা, পূজা,ভালবাসায় ব্যক্তিত্ব বিসর্জন করিলে ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করা যায়। যোগপথ এবং জ্ঞানপথ বা ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা ভিন্ন ব্রহ্মনির্বাণের (স্বরূপ মুক্তির) আর তৃতীয় পথ নাই। যাহারা নির্বাণ মুক্তি বা ব্যক্তিত্ব লয়ের বিষম ধারণা করিতে পারেনা, তাহারাই ভক্তি পথের সিদ্ধান্ত বা লক্ষ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ভক্তের মতে ভগবানের একটা সত্ত্ব শুদ্ধ রূপ আছে জীব তাহারই অংশ, সুতরাং নিত্য। জীব মলিন অসহায় (রজস্তমোহভিভূত) তাহা জানিতে পারে না। কাজেই গুণের উৎকর্ষ দ্বারা তম রজঃ অতিক্রম করিলে সত্ত্বশুদ্ধাবস্তায় ভগবানে দৃঢ় ভক্তি সম্পন্ন

১১। পূর্বোক্ত, আমি কি চাই, পৃষ্ঠা- ১৮

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তখন কাহারও সঙ্গে কাহারও বিরোধ থাকেনা। আপন আপন ব্যক্তিত্বের ভাবানুসারে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য প্রভৃতি ভাব সালোক্য-সারূপ্য প্রভৃতি মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। চরমে সাজুয্যমুক্তিও লাভ হইতে পারে। কিন্তু ভক্ত নির্বাণ দূরে থাকুক, সাজুয্যমুক্তিরও বিরোধি।[১২]

শংকর দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শনের মত পার্থক্য এখানেই। শংকর গুরু ভক্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্ গুরুকে সেবা ভালোবাসা দিলেই যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় শংকর তা বলেন নি। ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা ভিন্ন ব্রহ্মনির্বাণের (স্বরূপ মুক্তির) যে সহজ উপায় সাধারণের নেই একথা একমাত্র ব্রহ্মবিদ্ নিগমানন্দই ব্যক্ত করে গেছেন এবং জোর দাবী করেছেন। ব্রহ্ম জ্ঞানী শংকর ব্রহ্মবিদ্ নিগমানন্দের মত ভাব লোক স্বীকার করেন নি। নিগমানন্দ দর্শনের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে যাঁর নিত্য লোক তাঁরই ভাব লোক। শ্রীনিগমানন্দ অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মবিদ্ হয়েও সমন্বয়বিদ। শংকর শুধুই অদ্বৈতবদী দ্রষ্টাসাক্ষীদর্শী। শ্রীনিগমানন্দ যুগপৎ হর-গৌড়ী ও শংকর গৌরাঙ্গের মিলিত জ্ঞানকেই প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞান বলেছেন। শংকর দর্শনে যা লক্ষ্যণীয় নয়। নিগমানন্দ দর্শনের বৈশিষ্ট্য এখানেই।

বেদান্ত দর্শন জীব কে পরমাত্মার আভাস বলেছেন। 'আভাস এবচ'। নিগমানন্দ দর্শন বলেছেন- চিত্তে চৈতন্যের আভাস মাত্র। মোট কথা বেদান্ত দর্শনের মত নিগমানন্দ দর্শনেরও মত– জীব ব্রহ্মের অংশ নহে; সুতরাং নিত্যও নহে। জীব ব্রহ্মই। নিগমানন্দ দর্শনের মত হল– "নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার ফল জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি, অন্তে ব্রহ্মনির্বাণ। অর্থাৎ এই দেহে থাকা কালেই মুক্তির আস্বাদ লাভ করা। নিগমানন্দ দর্শন আরও স্বীকার করে–'স্বগুণব্রহ্মরুপে অর্থাৎ ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্ রূপে তটস্থ লক্ষ্যণায়ও উপাসনা চলে।"[১৩] যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা স্বরূপ লক্ষ্যণায় নির্গুণ উপাসনা করবেন। সর্বসাধারণে ব্রহ্ম আত্মা ভগবানের অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় লক্ষ্যে পৌঁছবেন। কুটস্থ এবং জীব ব্রহ্ম এই দুই উপাসনাতেও মুক্তি সম্ভব। যিনি আমার দেহ মধ্যে আত্মা রূপে আছেন ইনি হলেন কুটস্থ

১২। পূর্বোক্ত, **নিগমানন্দ দর্শন**, পৃ. ১৩৩-১৩৪
১৩। ঐ. পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্ম। যিনি আমার সম্মুখে জীবন্মুক্ত সদ্‌গুরু রূপে আমার হাত ধরেছেন তিনি হলেন জীব ব্রহ্ম। নিগমানন্দ দর্শনে এই ভাবেই ভক্তি পথ আবিস্কৃত হয়েছে।

নিগমানন্দ দর্শন সকল মত পথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন এবং নিজ দর্শন দ্বারা সকল মত পথ গুলির সাধনা ভিত্তিক লক্ষণ ও তাঁর ফল লাভ কী তাও উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর দর্শনে বলেন-সগুণ ব্রহ্মের ভগবান্ হইতে ব্রহ্মান্ড পতি। এই ব্রহ্মান্ড পতির আবার দুই ভাবে উপাসনা হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যভাবে এবং মাধুর্য্যভাবে। ঐশ্বর্য্য ভাবে- শাক্ত ও মুসলমানাদি। ফল- ক্রমমুক্তি বা সাজুয্যমুক্তি। মাধুর্য্য ভাবে-বৈষ্ণব ও খৃষ্টানাদি। ফল- ক্রমমুক্তি বা সালোক্য, সারূপ্যাদি। ব্রহ্মান্ডপতির উপাসনাকে কুটস্থ ব্রহ্মের উপাসনাও বলা যাইতে পারে। তারপর জীব ব্রহ্মের উপাসনা। জীব ব্রহ্মের উপাসনা বলিতে-অবতার, সিদ্ধপুরুষ ও আচার্যের উপাসনাকেই বুঝাইয়া থাকে। ফল- নির্ভর ও সেবা দ্বারা তৎগতি লাভ। যিনি যে মতের প্রবর্তক সাধকের সেই পথ।

আচার্য শংকর ও সদ্‌গুরু নিগমানন্দের মত হল অদ্বৈতবাদ। তিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকেই মূল লক্ষ্যরূপে ধরে একটু নীচে নেমে এসে নির্ভর শরনাগতি ও সেবাদ্বারাও যে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করা যায় এই দর্শন আবিষ্কার করে ভক্তির বীজ গৌরাঙ্গ পথ তাঁর মতের সাথে সমন্বয় করেন। সিদ্ধির চরম লক্ষ্যে তিনি যেই নির্গুণ উপলব্ধি করেছেন সেই নির্গুণেই সগুণ হয়ে যে জগৎ জীব রূপে প্রকাশ হয়েছেন তা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। তাই তিনি দেখালেন ভক্তিপথেই জ্ঞান লাভ সাধারণ জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহজ পথ। এই ভক্তি সাধক তার স্বরূপের অনুসন্ধানের প্রতি অনুরুক্ত হয়েও করতে পারে। কুটস্থ ব্রহ্মের প্রতি অনুরুক্ত হয়েও করতে পারে অথবা জীবব্রহ্মের বা আদর্শ পুরুষ অথবা অবতার মহাপুরুষের সেবা ভক্তি দ্বারাও তাঁদের সমান গতি লাভ করতে পারেন।

শংকর এই স্ব-স্বরূপানুসন্ধানাত্মিক শক্তিকেই ভক্তি আখ্যা দিয়েছেন। শ্রীনিগমানন্দ এই ভক্তির উদাহরণ স্বরূপ জানালেন -"আমি আমাকে ভালোবাসি, ইহা বুদ্ধি খরচ করিয়া যা বুঝিতে হয় না, আবার আর্কীট ব্রহ্ম পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থ সেই আমিত্বেরই বিকাশ, ইহাই শংকর মতের মূল মন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং আমিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে আত্মপ্রীতি বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইবে।"[১৪] অতএব শংকরাচার্যের ভক্তি ছিল অসাধারণ ভক্তি। যাকে বলে বিশ্বপ্রেম।

শ্রীনিগমানন্দ দর্শন এই লক্ষ্যেই তাৎপর্যপূর্ণ সমন্বয় দর্শন, অভিনব দর্শন এবং তাঁর বাণী অভিনব বাণী। নিগমানন্দ দর্শনের অভয়বাণীর মর্মার্থ হল– যদি তুমি ঠিক ঠিক জীব ব্রহ্মের উপাসনা করতে পার তাহলে তুমি অবশ্য তৎগতি লাভ করতে পারবে। ব্রহ্মবিদ্ গুরু তোমার সাক্ষাত শিক্ষাদাতা, তিনি নিজে সাধনা দ্বারা মুক্ত হয়েছেন, তোমাকেও মুক্তির পথ দেখিয়ে দিবেন। একান্ত নির্ভর, অনুগত, বাধ্যগত ও শরণাগত হলে তিনি শক্তি প্রয়োগ করেও মুক্তি দিতে পারেন। কোন সাধনার দরকার নেই শুধু তাঁকে সেবা ভালবাসা দিয়ে সন্তুষ্ট কর। তিনি মানুষ নন। মানুষের দেহে অতিমানুষ। তিনি মানুষের জন্য মানুষ দেহ আশ্রয় করেছেন মাত্র। তিনি ব্যক্তিক হলেও নৈব্যর্ক্তিক। পরমহংস নিগমানন্দদেব নিজেই বলেছেন, আমি ব্যক্তি নই। এই বোধে বোধ রেখেই সেবা সাধনা সুযোগ লাভ করতে হবে। কলীর ভোগ পরায়ণ দুর্বল মানুষের মুক্তির এই একমাত্র লক্ষ্য সহজ শ্রেষ্ঠ উপায় বলে উল্লেখ করেন। মাটির মূর্তি গড়ে দেব-দেবীর পূজার চেয়ে তিনি জীবব্রহ্মের প্রতি সেবা ভক্তি পূজাকেই জোর দিয়েছেন বেশি। প্রমাণ স্বরূপ বাণী দান করে বলেছেন– "আজকাল মানুষের অদ্ভুত সংস্কার দেখতে পাচ্ছি, মাটির মূর্তিকে পূজা করছে। কিন্তু মানুষ পূজা করলেই যেন সব গেল। শিলাকে দেবতারূপে তীব্র ভাবনা দিয়ে যদি দেবত্বে পরিণত করা যায় তবে চৈতন্যরূপী মানুষকে ভগবান্ রূপে ভাবলে মানুষ কেন ভগবান্ হবে না। মানুষের শক্তিতেই তো দেবতা জাগ্রত হন সুতরাং মানুষই বড়।"[১৫] শ্রী নিগমানন্দ দর্শনের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখন পর্যন্ত আমরা শংকরের মত নিয়ে নিগমানন্দ দর্শন আলোচনা করেছি। এখনো গৌরাঙ্গ পথ কী? কিভাবে এই পথে মুক্তি হয় সেটি আলোচনার বিষয়।

১৪। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৫৯, ৬০।

১৫। দিপালী দেবী, নিগম অনুশাসন, হালিশহর, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ১ম সংস্করণ ১৩৮২ সাল, পৃষ্ঠা- ১১

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী গৌরাঙ্গদেব শংকরের মত স্বয়ং কোন শাস্ত্রগ্রন্থ ও তাঁর দর্শন লিখে যান নি। এখানে গৌরাঙ্গ পথ বিষয়ক দার্শনিক আলোচনাগুলি তাঁর পার্ষদবৃন্দের সাহায্য গ্রহণ করেই উপমাদান করতে হবে, এ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। শ্রী গৌরাঙ্গদেবের সাক্ষাৎ ভক্ত ছিলেন রূপসনাতন ও জীব গোস্বামীপাদ বৈষ্ণব ব্যক্তিত্বগণ। শ্রী চৈতন্যের মত পথ জীব গোস্বামীই সবচেয়ে সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছেন। জীব গোস্বামীপাদ তাঁর দর্শনে শ্রী চৈতন্য যে অচিন্ত্যভেদাভেদদর্শী ছিলেন তা নির্বিঘ্নে উল্লেখ করেন এবং দার্শনিক ভিত্তিতে তা প্রতিস্থাপন করেন। জীব গোস্বামী পাদ শ্রীমদ্ভাগবদকেই বেদান্ত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলে স্বীকার ও উল্লেখ করেন। অচিন্ত ভেদাভেদ অর্থ হল– ব্রহ্মের সাথে জীব জগতের সম্বন্ধভেদ ও অভেদ উভয়ই।

দার্শনিক প্রশ্ন ও যুক্তি এখানেই পরস্পর বিরুদ্ধ বক্তব্যকে লক্ষ্য করে এবং অস্বীকৃতি জানায় অর্থাৎ- একই কালে একই বস্তুতে ভেদাভেদ সম্বন্ধ কিভাবে সম্ভব? জীব গোস্বামীপাদ একজন সুমহান্ বৈষ্ণব দার্শনিক ছিলেন– তিনি এর উত্তরে স্বল্প কথায় বলেন– ভগবানের অচিন্ত শক্তিতে সবই সম্ভবপর। ভক্তিবাদের এটিই মূল কথা। আমাদের বুদ্ধি ধারণা করতে না পারলেও অচিন্ত শক্তি ভগবানে তা সম্ভবপর। কোন দ্বিধা না করে এই যুক্তি মত ও পথকে বিশ্বাস করতে হবে। আমরা যে তাঁর মত সর্বশক্তিমান নই, এই উত্তর থেকেই।

বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও একজন সুমহান সুপন্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর 'গোবিন্দভাষ্যে' অচিন্ত্য-ভেদাভেদকেই সুপ্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ 'জীব অণু, ভগবান্ বিভু;' ভগবানের দাসই জীব। জগৎ সত্য এবং জীব কখনও ভগবানের সমান হইতে পারে না। জীবের শক্তিতে নয় ভগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি সম্ভব। বলদেব মতে– "অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদে বিশুদ্ধ অনন্তগুণশালী, অচিন্ত্য, অনন্তশক্তি, সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রী কৃষ্ণই বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে গোপী ভাব লাভই পরমপুরুষার্থ বা মুক্তি।"[১৬] মানুষ কৃষ্ণ এবং সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হয়েই গৌরাঙ্গ দর্শন পর্যালোচনা করতে হবে। বলদেব মতে– জীব ,

---

১৬। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৩১, ৩২

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বর, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম এই পাঁচটি পদার্থই নিত্য এবং জীব, প্রকৃতি ও কাল ঈশ্বরের বশ্য। ভক্তিই মুক্তির প্রধান সাধন। কারণ জ্ঞানের পরকাষ্ঠাই ভক্তি। বলদেব বলেন– "জ্ঞান হল কটাক্ষ দর্শন, আর ভক্তি হল নির্নিমেষ দর্শন। ভক্ত ভগবানের চিদ্‌বিগ্রহে তাকিয়ে থাকতেই ভালবাসেন। ভগবানের গুণলাবণ্য স্মৃতি নিবেশই ভক্তি।"[১৭] ভক্তের মতে ভেদটাই সনাতন, আর জ্ঞানীর মতে অভেদটাই সনাতন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বৈষ্ণব শাস্ত্রের একটি মূল্যবান দর্শন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মত ও মহাপ্রভুর মত পথের সুনিপণ সুন্দর বিশ্লেষণ আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মহাপ্রভু সাক্ষাৎভাবে রূপসনাতনকে সাধ্য সাধন সম্পর্কে যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন যা চরিতামৃতে বর্ণনা আছে। "আপনে করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সবারে।"[১৮] এই আচরি ধর্মই হল গৌরাঙ্গ পথ। – তিনি নিরাকার হলেও সাকার ভাব গ্রহণ করে জীবকে শিক্ষা দানের জন্য জগতে ভক্তিভাব প্রচারে এসেছিলেন। নিজের ঈশ্বরত্ব প্রচ্ছন্ন করে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে জগৎ জীবকে সেবা ভক্তি ভালবাসা দান করে গেছেন। এই অশান্ত পৃথিবীতে এই সেবা ভক্তি ভালবাসা ছাড়া বর্তমানে শান্তির আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই, এই কথা জানাতেই এসেছিলেন। এতৎ অর্থে গৌরাঙ্গ পথ হল তাঁর ভক্ত ভাব অঙ্গিকার পথ। তিনি নিজেই ভক্ত সেজে জীবকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ভালবাসা শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কারণ তাঁর নিজেরই উক্তি– আমা বিনা অন্য নারে ব্রজ প্রেম দিতে। "ভক্তি আবার দুই প্রকার এক বৈধি ভক্তি (সাধন ভক্তি), দুই ভাবভক্তি বা (প্রেম ভক্তি)। সারাজগৎ আজ বৈধিভক্তির অনুসারী হয়ে ঈশ্বরকে মান্যদান করেছে। ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তি বুঝার ভক্ত নেই বললেই চলে। মহাপ্রভু সে কথা নিজেই বলেছেন–সকলে জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি। বিধি ভক্তে ব্রজের ভাব পাইতে নাহি শক্তি।"[১৯] বিধিভক্তি হল নিয়ম কানুনের অন্তর্ভূক্ত। প্রেমভক্তি বা ভাবভক্তি হল নিয়মকানুন বর্হিভূত। ভাব ভক্তি চায় প্রিয়ার সাথে প্রিয়ের মিলন। বৈধি বা নিয়মভক্তি চায় তিনি প্রভু আমি তার দাস। তিনি বড়, আমি ছোট, কি করে তার সমান হই, অথচ সমান সমান না হলে আবার

১৭। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. - ৩২
১৮। ঐ, পৃ. - ৩৪
১৯। ঐ, পৃ. - ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তি প্রেম-রূপ ধরেনা তখন ভক্তির সার্থকতা প্রেমকে অস্বীকার করতে পারিনা। নিগমানন্দ দর্শন– এই সাধন ভক্তি ও ভাবরূপ প্রেমভক্তিকেই যুগপৎ তাঁর দর্শনে মূল্যদান করেছেন। তিনি স্বয়ং উভয় পক্ষের যুগপৎ পথদ্রষ্টা ছিলেন। এই জন্যই তিনি ভক্তি পথকে ধরেই জ্ঞান লাভ সহজ বলেছেন। উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন– জ্ঞান বড় ভাই ভক্তি তার ছোট বোন। কারও অন্দর মহলে হঠাৎ পর পরুষের প্রবেশ অধিকার কোন অন্দর মহল সমর্থন করে না। কিন্তু একজন অপরিচিত পর মহিলা অবাধে অনায়াসে উক্ত অন্দর মহলে প্রবেশ করে তার প্রয়োজন জানাতে এবং মিলিত হতে পারে। এদিকে অন্দর মহলে ভক্তি রূপ বোনের নিরাপত্তা বিধানে বড় ভাই জ্ঞান সজাগ থাকেন। অর্থাৎ বোন মেলামেশা করতে গিয়ে যাতে ঝামেলা ঝুঁকি বিপদে না পড়ে এই জন্য বড় ভাই জ্ঞান; বাড়ীর বাইরে দরজায় দাড়িয়ে বোনকে শক্তি সাহস ও সহায়তা দান করে। মূলতঃ ভাইয়ের সাহসেই সে অন্দর মহলে প্রবেশ করেছে। কাজ শেষ হলে ভাই-বোনে হাত ধরা ধরি করে এক সঙ্গে চলতে শুরু করে। অতএব জ্ঞান-ভক্তি আপাত বিরোধ সাধন দশায়, সিদ্ধদশায় নয়। জ্ঞান ভক্তি পরস্পর পরিপূরক কখনও বিরোধী নয়।

কাউকে শিক্ষা দিতে চাইলে নিজে আচরণ করে তা দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিতে হয়। শ্রী ভগবান্ গৌর সুন্দর রূপে একারণেই অবতীর্ণ হয়েইছিলেন বাংলার প্রেম, বাঙালীর হৃদয় নিয়ে বাংলার বুকে– প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দান করতে। সেই অপ্রাকৃত প্রেম-মাধুর্য আস্বাদন করতে ও করাতে গিয়ে তিনি নিজের মহিমা ভুলে ভক্ত মহিমাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। প্রমাণ পাই চৈতন্য চরিতামৃতে–

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি– শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥[২০]

ভগবান্ এখানে কারও অধীন নন, কোন কিছুর অধীন নন, একমাত্র অধীন– ভক্তাধীন, প্রেমাধীন। রাধিকাই যে প্রেমের গুরু তিনি যে তাঁর শিষ্য; এখানে এই প্রমাণ হয়– ভগবান্ কত ভক্তি

২০। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসা প্রিয়? তাঁর মাঝে কত প্রেম? তবুও শ্রী রাধার প্রেম কোটিগণ আশ্রয়ের আহলাদ শ্রী ভগবান্ দেখে ছিলেন গৌরাঙ্গরূপে রাধা ভাব ধারণ করে। সাধন দৃষ্টিতে রাধা কৃষ্ণ আলাদা মনে হলেও, দেহগত পার্থক্য থাকলেও রাধাকৃষ্ণ স্বরূপগত কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে আনন্দ আর রাধা তাঁরই আলাদিনী শক্তি। রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। আপাত দৃষ্টিতে এই প্রেম বা ভক্তি পথকে দ্বৈত মনে হলেও মূলতঃ অদ্বৈত। কারণ ব্রহ্ম শুধু জ্ঞান নন। তিনি 'সচ্চিদানন্দ'। তিনি সৎ, চিৎ, এবং আনন্দ স্বরূপ। বুঝার সুবিধার্থে তিনি ভিন্ন বা আলাদা আলাদা। বুঝে গেলে তিনি আলাদা থাকেন না থাকেন একং রূপে। গৌরাঙ্গ অবতারে এই ভক্তি ভাব, ভক্ত ভাব ধারণ করে 'নিজে আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়। এই নীতি দ্বারা ভগবানকে পাওয়ার পথ যে জ্ঞান এর মত ভক্তিরও আছে তা স্বয়ং আচরণ করে শিখিয়ে গেলেন। ভক্তি পথে ভগবান্‌লাভই গৌরাঙ্গ পথ। ভক্তের প্রাণে ব্যাকুলতা জাগ্রত করণের জন্যই ভক্তি পথ। কারণ প্রকৃত ব্যাকুলতাই বস্তু প্রাপ্তির উপযুক্ত পথ। রাধাকৃষ্ণ অঙ্গের মিলিত রূপ মিলিত তনু মহাপ্রভুও এই ব্যাকুলতার কাঙাল হয়েছিলেন।–

সখি হে! কোথা কৃষ্ণ? করাও দশন।
ক্ষণের যাঁহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥[২১]

ভক্তের প্রাণে এবম্প্রকার বিরহ ব্যাকুলতা জাগ্রত হলেই– ভক্তি ও ভগবান্ লাভ হয়। কোন সাধন, ভজন, কঠোর ত্যাগ তপস্যা ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন নেই। শুধু চাওয়া ঠিক হলেই পাওয়া তৎক্ষণাৎ। ভগবানের বিরহে ভক্ত যখন এমন ব্যাকুল হন তখনেই ভগবান দরশন দেন। এই ভক্তি মানবের অন্তরেই আছে কারও কাছে ধার করতে হয় না। কোন সাধ্য সাধনের প্রয়োজন নেই নিয়ম কানুনের বালাই নেই। শুধু আকুল নয়নে ব্যাকুল হৃদয়ে 'ব্রালানাং রোদনং বলং' বালকের মত ডাকতে

২১। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ও রোদন করতে পারলেই ভালবাসার কাঙাল দয়াল প্রভু যেচে এসে ধরা দেন। ভক্তের সকল ইচ্ছা পূরণ করেন। শ্রী গৌরাঙ্গ দর্শনের বৈশিষ্ট্য এখানেই।

শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন 'চেতোদর্পনমার্জনং' এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কারণ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হোক, আর্তিদ্বারা হোক কিংবা বিচার দ্বারা হোক যে কোন অর্থেই চিত্তদর্পন মার্জন রূপ চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবৎ চিত্তক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না এবং শ্রী ভগবানের দর্শন হবে না। যেহেতু অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চাইলেও চিত্তশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞান পথেও চাই ত্যাগ বৈরাগ্য, ভক্তি পথেও চাই ত্যাগ বৈরাগ্য। শ্রী নিগমানন্দ দর্শন একেই বললেন, সেবা সহায়ে চিত্তশুদ্ধি। কার সেবা? জীব ব্রহ্মের সেবা, বেদান্তবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সেবা। এই সেবা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি দ্রুতরূপ ধারণ করে।

গুরুর সঙ্গে অদ্বৈতবুদ্ধি স্বয়ং শংকরও নিষেধ করেছেন, ('অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু না দ্বৈতং গুরুণা সহ।') কারণ গুরুভক্তি গুরুর সঙ্গে সেবাসঙ্গ নিয়ে থাকতেই পছন্দ করেন বেশি। গুরুর উপর গুরুগিরি করা অন্যায়। গুরুকে শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন চাই-ই । কারণ ভগবান্ লাভের উপায় একমাত্র শ্রী গুরুর কাছে। গুরু কৃপা ভিন্ন ঈশ্বর কৃপা লাভ অসম্ভব।

ভক্তি যখন ভাবে রূপান্তর লাভ করে তখন প্রেম হয়। প্রেম আবার সমান সমান না হলে তৃপ্তি আসেনা । এই প্রেমেই ভক্ত ভগবান্ এক হয়ে যান। এই সাজুয্যলাভ ভক্ত চান না বলেই এক ধাপ নীচে নেমে এসে ভাবের সম্বন্ধ পাতেন 'তুমি প্রভু, আমি দাস'। কিন্তু সমাধিতে মধুরারতি উভয়কে একাকার করেই। সমাধিভঙ্গে পুনঃ ভেদবুদ্ধি নিয়ে বসবাস হল ভক্তি-দর্শনের বিশেষত্ব। ভক্তি পথ জ্ঞান পথ যে পথেই সাধক সাধনা করুণ না কেন প্রেম উভয়ের আসবেই। প্রেম না আসলে অন্তরের চাহিদা মিটেনা। সব পেয়েও একটা অভাব কোথায় যেন রয়েই যায়। সাধনায় সিদ্ধি অপূর্ণ বোধ হয়।

শ্রীনিগমানন্দ দর্শন জ্ঞানকে মিশ্রির সাথে তুলনা করেছেন। মিশ্রি দেখতে কঠিন শক্ত হলেও তার ভিতর রসঘণিভূত আছে কিন্তু বাইরে প্রকাশ নেই। যখন দুধের সাথে তাকে মিশ্রণ করা হয় তখন দুধের দুধত্বও ঠিক থাকে এবং মিশ্রির মিষ্ঠত্বও ঠিক থাকে কিন্তু উভয়ের গলনেও মিশ্রণে হয়

Dhaka University Institutional Repository

সুপেয় ও সুস্বাদু। এই দুধকে নিগমানন্দ দর্শন ভক্তি রূপে আখ্যায়িত করেছেন। এই ভাবে জ্ঞান-ভক্তির মিলন আস্বাদ, নিগমানন্দ দর্শন জগৎবাসীকে অমৃত রূপে দান করেছেন। প্রকৃত জ্ঞানীই প্রকৃত ভক্ত; শ্রী নিগমানন্দ দর্শনের এই মূল সূত্র। নিগমানন্দ দর্শন গুরুবাদকে মুখ্য অধিকার দান করেছেন। গৌরাঙ্গ পথেও একথা স্বীকার করা হয়– গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্ত গণে। গৌরাঙ্গ পথের কৃষ্ণের জায়গায় তাহলে গুরু' শব্দটি বসালে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকে কি? কারণ 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের বচনে।' গুরুই 'কৃষ্ণ', কৃষ্ণই 'গুরু'। এই শাস্ত্র বাক্য মানলে নিগমানন্দ দর্শনের সাথে গৌরাঙ্গ দর্শনের অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা যদি গভীর ভাবে অনুসন্ধান করি তবে দেখব, গৌরাঙ্গ পথে যে জ্ঞান লাভের কথা নিগমানন্দদর্শনে বলা হয়েছে তা বর্তমান যুগোপযোগী পথ। কারণ গুরুভক্তি কি জ্ঞানী, কি ভক্ত উভয়ের প্রয়োজন। এই দিক দিয়ে নিগমানন্দ দর্শন যথার্থ সমন্বয়বাদী দর্শন। ভক্তি শাস্ত্রে নবধা ভক্তির কথা উল্লেখ আছে এবং এই ভক্তিই যে জ্ঞান লাভের উপযুক্ত উপায় এও বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ যে গুরুরূপ তা নিজেই ব্যক্ত করেছেন যথা–আচার্য মাং বিজানীয়াৎ– আমাকে আচার্য বা গুরু বলে জানবে। পঞ্চদশীতে বলা আছে– তাবদ্ গুরু মুপাস্ব ভোঃ। পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য গুরুর উপাসনা কর। অতএব আচার্য বা গুরুই উপায় এবং উপেয়। বিখ্যাত দার্শনিক অদ্বৈত বৈদান্তিক মধুসুদন সরস্বতীপাদ্ বলেন, অর্চনং পাদসেবনমিত্যপি গুরু রূপে তস্মিন্ সুকরমেব। গুরু নারায়ণরূপী বিষ্ণুর অর্চন এবং পাদসেবন অতি সহজ সাধ্য এবং তাহাতেই তাঁহার (বিষ্ণুর) অর্চন এবং পাদসেবন হইয়া থাকে। বর্তমান কলি যুগে এই জন্যই শ্রী নিগমানন্দ দর্শন গুরু ভক্তির পথে জ্ঞান লাভের উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। জ্ঞান পথ ভক্তি পথ যে পথেই হোক উভয় পথেই আনুগত্য প্রয়োজন। কারও আনুগত্য ছাড়া কোন শেখার কারও উপায় নেই। শ্রী নিগমানন্দ দর্শন এই ব্রহ্মবিদ্ শিক্ষককেই গুরু বলেছেন। বৈষ্ণব দর্শনে নরোত্তম ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, শ্রী গুরু

Dhaka University Institutional Repository

চরণে রতি এই সে উত্তমাগতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশ। শ্রী নিগমানন্দ দর্শন বার বার এই উত্তমা গতির কথাই উল্লেখ করেছেন। শ্রী নিবাসাচার্যও শ্রীগুরু অনুগমন করতে আদেশ করেছেন।

জ্ঞান কর্মে কোন ভক্তের আপত্তি নেই শুধু আপত্তি অভেদ জ্ঞানে। এই অভেদ জ্ঞান কি ভাবে সম্ভব তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমরা জানি প্রেমের উপরিতন অবস্থার নাম 'স্নেহ'। স্নেহের চিহ্ন দ্রবীভাব। তার উপরের অবস্থার নাম 'রাগ'। রাগের চিহ্ন নিবিড় স্নেহ। এর উপরের অবস্থার নাম 'প্রণয়'। প্রণয়ের চিহ্ন গাঢ় বিশ্বাস। এর পরেই আসে একাকার ভাব। যেমন পঞ্চ ভাবের শেষ ভাব মধুর ভাব। শ্রীনিগমানন্দ দর্শন এই গুরুপ্রীত্যর্থ কর্মকেই ভক্তির আখ্যা বলে বুঝিয়েছেন। ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর সেবা পূজাতেই যে শিষ্যভক্তদের ব্রহ্মনির্বাণ লাভ সম্ভব এতে কোন সন্দেহ নেই। এই-ই শ্রীনিগমানন্দ দর্শনে পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ অভিমত।

শ্রীনিগমানন্দের অভিমত– গৌরাঙ্গের পথে আমরা চলব বটে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ব্রহ্মনির্বাণ লাভ। ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর সেবাই গৌরাঙ্গের পথ বা ভক্তি পথ। অদ্যাবধি আমরা জ্ঞান পথ ও ভক্তি পথের পৃথক পৃথক আলোচনা করেছি এখন নিগমদর্শনের সমন্বয় সূত্রের বাকি আলোচনাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি শ্রীনিগমানন্দের বাণীর মাধ্যমে। শ্রী নিগমানন্দ দর্শন জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়কারী দর্শন। শংকর গৌরাঙ্গের মিলনই নিগমানন্দ দর্শনের অভিপ্রায়। এ সম্পর্কে স্বামী সত্যানন্দ বলেন:

> যাহারা জ্ঞানকে জ্ঞান পথ এবং ভক্তিকে ভক্তিপথ বলিয়া মনে করে, তাহারা সমধিক ভ্রান্ত। জ্ঞান পথেও কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির সম্মিলনে যাইতে হয় এবং ভক্তি পথেও কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়ে গমন করিতে হয়। সুতরাং উভয় পথেই গমনের উপায় একই প্রকার, কিন্তু পথের বিভিন্নতা আছে। জ্ঞানমার্গের নাম– বিশ্লেষণ পথ আর ভক্তিমার্গের নাম– সংশ্লেষণ পথ। কার্য ধরিয়া কারণে যাওয়ার নাম বিশ্লেষণ বিচার, আর কারণ লাভ করিয়া কার্যরহস্য অবগত হওয়ার নাম– সংশ্লেষণ বিচার। যাঁহারা জড় জগৎ ধরিয়া 'নেতি' 'নেতি' করিতে করিতে স্থূল সূক্ষ্ম অতিক্রম পূর্বক ব্রহ্মানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তাঁহারাই জ্ঞানমার্গী, আর

Dhaka University Institutional Repository

যাঁহারা ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া এই জীবজগৎ তাঁহারাই বিকাশ মনে করতঃ লীলানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তাঁহারাই ভক্তিমার্গী। শংকরাচার্যদেব যে উপায়ে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিবার পন্থা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণপথ– জ্ঞানমার্গ; আর গৌরাঙ্গদেব তাহা লাভ করিবার যে উপায় প্রচার করিয়াছেন, তাহা সংশ্লেষণ পথ– ভক্তিমার্গ। তাই শংকরাচার্য জ্ঞানাবতার এবং গৌরাঙ্গদেব ভক্তাবতার নামে অভিহিত।[২২]

বিশ্লেষণ অর্থাৎ– জ্ঞান পথের সাধকগণ ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন হইয়া যায়, লীলানন্দ ভোগ করিতে পারেন না, আবার সংশ্লেষণ পথের লোক লীলানন্দে ডুবিয়া স্বরূপানন্দে বঞ্চিত হয়েন। কিন্তু যিনি বিশ্লেষণ পথে গমন করিয়া সংশ্লেষণ পথে ফিরিয়া আসেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া আত্মস্বরূপে লীলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। একমাত্র তাঁহার জীবনই সম্পূর্ণ। যাঁহারা লীলানন্দে মাতিয়া যান, তাহারা নিত্যানন্দের আস্বাদ না পাইয়া নিত্যাবস্থা কঠোর ও শুষ্ক-জ্ঞানে বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, আবার যাঁহারা কেবল নিত্যানন্দে মাতোয়ারা, তাঁহারা অনিত্য-জ্ঞানে লীলানন্দে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবান্ যেমন নিত্য অর্থাৎ অনাদি, অনন্ত, ভগবানের লীলাও তদ্রূপ অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং নিত্য ও লীলা ভগবানের এই উভয় ভাব যুগপৎ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্– তিনিই প্রেমিক শিরোমণি। ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যে একটি পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি হয় না। উভয় মার্গ অবলম্বন অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ীমার্গে গমন না করিলে পূর্ণানন্দের অধিকারী হওয়া যায় না এবং হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর হইয়া সর্বাভৌম উদারতা জন্মে না। যাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির মিলন হইয়াছে, তাঁহার নিকট কোন গোল নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, তিনি সকল সম্প্রদায়ে মিশিয়া সকল রসে রসিয়া এবং সকলের নিকট বসিয়া

২২। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৫৬, ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রকার আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শংকরাচার্য ও গৌরাঙ্গের মিলনই জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়।[২৩]

সমন্বয় সম্পর্কে শ্রীনিগমানন্দদেব বলেন, "সমন্বয় বলিলে একথা বুঝিতে হইবেনা যে, সব ভাব ভাঙিয়া চুরিয়া এক করিয়া দেওয়া। স্ত্রী জাতি এক হইলেও ভগ্নীভাবে মাতার ভাব বুঝা যায় না। আবার ভগ্নীতে স্ত্রীভাব উপলব্ধি করিতে যাইলে ভগ্নীভাব বিকৃত হয়। সেই রূপ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাস্য এক বস্তু হইলেও ভাবের তারতম্য থাকা প্রযুক্ত, সেই সেই ভাব শিক্ষা দ্বারা সাধন করিলে তবে সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে। বৌদ্ধভাবে কি আর গোপীভাব উপলব্ধি করা যায়? আমার সাধন পথটিই একমাত্র সত্য, অন্য গুলি ভ্রান্ত, এই ভাবের বশবর্তী হইয়া সকলের নিন্দা না করিয়া, সতী নারীর ন্যায় আপন ভাবে বিভোর হইয়া চলিতে হইবে। যে যে রূপ উপাসনা করে, তাহার মনোরথ সেই রূপ সিদ্ধ হয়। ভাব বহু কিন্তু মূলে এক; সর্বসাম্প্রদায়িক ভাব নৈষ্ঠিকভাবে সাধন করিলে একই সত্যে উপস্থিত করে। নৈষ্ঠিক ভাব ও গোঁড়ামি এক কথা নহে। আপন ভাবে সতীর ন্যায় সাধনা করিতে হইবে, কিন্তু কাহারও ভাবের নিন্দা করা উচিৎ নহে। স্থূলে বিভিন্নতা নিশ্চিত হইলেও মূলে এক। ইহাই সর্বধর্মসমন্বয়। ইহাই শংকর ও গৌরাঙ্গের পূর্ণ মিলনাদর্শ।[২৪]

যাহার হৃদয়ে শংকর গৌরাঙ্গের এক সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে– যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গা জ্ঞান সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, তিনিই জগতে জীবন্মুক্ত। তাই জ্ঞান-ভক্তির পূর্ণাদর্শ শুকদেবকে 'শুকোমুক্তঃ' বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানী নির্লিপ্ত গৃহস্থ এবং পরমহংস সন্ন্যাসিগণ জীবন্মুক্ত; এক কথায় ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিই মুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার নিকট ব্রহ্ম হইতে কীট পর্যন্ত সমান আদরে গৃহীত হয়। তাঁহার

২৩। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৫৭
২৪। ঐ, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

নিকট ব্রাহ্মণ-চন্ডাল, পুরুষ-নারী, পাপী-পূণ্যবান্, জড়-চৈতন্য, অণু-পরমাণু, বৃক্ষ-শিলা, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং একটি অণুও তাঁহার নিকট আত্মবৎ প্রীতির বস্তু এবং ভগবানের ন্যায় ভক্তির সামগ্রী। সাধারণ লোক আপনার ইষ্টদেবতা ব্যতীত অন্য বস্তুতে তুষ্ট হইতে পারে না, আর ব্রহ্মবিদের নিকট সকল বস্তুই ইষ্টদেবতার স্বরূপ। শাক্ত বলে, শক্তি ভিন্ন গতি নাই, বৈষ্ণব আবার কালীর নাম শুনিলে কর্ণমধ্যে অঙ্গুলী দিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের নিকট কালী, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সমান আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধারণ লোকে শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণ মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের নিকট সকল শিলাই নারায়ণ, সাধারণ লোকে তুলসীবৃক্ষকে পবিত্র মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী বৃক্ষমাত্রকেই তুলসীর ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করেন, সাধারণ লোকে গঙ্গাকে পূর্ণনদী মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মবিদের নিকট সকল নদীই গঙ্গাসদৃশ। যিনি তত্ত্বজ্ঞান বিচারপূর্বক ব্রহ্মে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন কিংবা প্রেমভক্তির অমৃতধারায় ভাসিয়া যাইয়া ইষ্ট চরণে লীন হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্ – তিনিই জীবন্মুক্ত।[২৫]

আমি 'আমাকে' ভালবাসি, ইহাবুদ্ধি খরচ করিয়া বুঝিতে হয় না। আবার আকীটব্রহ্ম পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থ সেই আমিত্বেরই বিকাশ, ইহাই– শংকর মতের মূল মন্ত্র। সুতরাং আমিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে আত্মপ্রীতি বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইবে। অনেকে মনে করে, শংকরাচার্য ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন না। যিনি 'বিবেক চুড়ামণি' গ্রন্থে মুক্তি সাধনের যত প্রকার উপায় আছে তন্মধ্যে 'ভক্তিরেবগরীয়সী' বলিয়া ভক্তির প্রাধান্য প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ভক্তি তত্ত্ব বুঝিতেন না বলিলে নিজেরই মূর্খতা ও নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়।[২৬]

২৫। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৫৮
২৬। ঐ, পৃঃ ৫৯-৬০

Dhaka University Institutional Repository

আমরা কবে দেখিব– এমন দিন কবে হইবে যে, প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে ওতোপ্রোতভাবে শংকর ও গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শংকর ও গৌরাঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তির মিলন হইলেই ধর্ম জগতের যাবতীয় হিংসা-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল দূরীভূত হইয়া শান্তির– প্রেমের অমিয়ধারা প্রবাহিত হইবে। ভগবান্ শংকরাচার্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলন হইলে জগতের যাবতীয় ভেদভাব দূরীভূত হইয়া প্রেমের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে।[২৭]

নিগমানন্দ দর্শনে জ্ঞান-ভক্তির বিরোধ নেই। জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় সবাই এই তর্ক বিতর্ক নিয়ে ব্যস্ত। ভক্তরা বলেন-

জ্ঞানে নিষ্টত্ব আছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত শুষ্ক– যেমন মিশ্রি। আবার জ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন– ভক্তি সুপেয় বটে, কিন্তু তেমন মিষ্টত্ব নাই– যেমন দুগ্ধ। নিগমানন্দ দর্শন বলেন, দুগ্ধ ও মিশ্রি কর্মের আবর্তনে মিশ্রিত হইলে ত্রিসমত্বয়ঘনামৃত অতি সুস্বাদু সরবৎ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জ্ঞানী বুঝে না যে, দুগ্ধের সাহায্যে মিশ্রি গলিয়া অদৃশ্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব কখনই লোপ হইবে না। আর ভক্তও বোঝেন না যে, মিশ্রির সাহায্যে দুগ্ধের আস্বাদ যদিও অন্যরূপ হয়, তথাপি সে রূপান্তরিত হইবেনা বরং মিশ্রি তাহার মাধুর্য বাড়াইয়া দিবে।[২৮]

স্বামী সত্যানান্দ বলেন-

জ্ঞান বড় ভাই তাহার নিকট বালিকা-ভক্তি সর্বদাই সরমে জড় সড় হইয়া যায়। বিশেষতঃ জ্ঞান পুরুষ মানুষ, সকল স্থানে তাহার যাওয়া সম্ভবে না, ভক্তি বালিকা– কাজেই অন্তঃ পুরের সকল স্থানেই তাহার গতি। জ্ঞান ভক্তির পাথেয় অন্তরায় নহে। বরং দুইভ্রাতাও ভগ্নীতে বড়ই প্রীতি, কেহ কাহাকেও একদন্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যদি কাহাকেও জ্ঞানী বলিয়া বুঝিতে পারিয়া থাক,

---

২৭। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৬০
২৮। ঐ, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধান করিও দেখিবে পশ্চাতে ভক্তি লজ্জাবিনম্রবদনে দাদার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তদ্রূপ ভক্তের হৃদয় খুঁজিলেও দেখিতে পাইবে ভক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া জ্ঞানই বসিয়া আছে। একের আধিক্য দেখিয়া অন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? একের বিদ্যমানে অন্যের বিদ্যমানতা অস্বীকারের উপায় নাই। কারণ উভয়ে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ। সুতরাং জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে বরং জ্ঞানই ভক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। তবে কথা এই যে, ভক্তি আসিয়া একবার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া বসিলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন কী? যে ব্যক্তি আম খাইয়াছে তাহার আর রাসায়ণিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-ব্যতীত ভক্তি কোথাও যাইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে ভক্তির প্রতিষ্ঠাতা। তবে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তখন ভক্তই নাচিয়া হাসিয়া কত রঙ্গে বিরঙ্গে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়।[২৯]

সমন্বয়মূর্তি শ্রী নিগমানন্দদেব সমস্ত মত পথে সাধনা করে যে সত্যগুলি লাভ করেছিলেন এবং সব সত্যের মূলে যে এক সত্য তা দেখে এবং নিজের সত্যকে সেই সত্যের একাংশ রূপে দেখেও আপ্লুত হয়ে কোথাও দ্বৈততা বা ভেদদৃষ্টি দেখতে পান নি বরং সর্বত্র এককেই বহুভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি এই অপরোক্ষ দর্শন লাভ করেই সমন্বয়াচার্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তার দর্শনের নাম সমন্বয় দর্শনও বলা যেতে পারে।

তিনি তাঁর পুস্তকে বিভিন্ন স্থানে সমন্বয়ের সূত্র তুলে ধরেছেন, আংশিক ভাবে আমরা সেগুলি এখানে সন্নিবেশিত করে সার্বিক সত্যতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। পুরাণের 'হর-গৌরীমূর্তি' জ্ঞান ও ভক্তির জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। মহাদেব (হর) জ্ঞানমূর্তি। কিন্তু গৌরী প্রেমময়ী। এখানেও জ্ঞানের সাথে ভক্তির মিলন।

২৯। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৬০-৬১

Dhaka University Institutional Repository

এই দর্শন আরোও বলেন, আলোক যদি ফানুস (চিমনি) দ্বারা আবরিত না হয় তবে কিঞ্চিৎ কর্কশ ও অনুজ্জল বোধ হয়। কিন্তু ফানুস দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দিলে কেমন স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল আলোক বাহির হয়। তদ্রূপ জ্ঞান; প্রেমের ফানুসে আবরিত হইলে ঐ জ্ঞানালোক স্নিগ্ধমধুরোজ্জল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া সাধককে পরিতৃপ্ত করে।

> চিনি খাইতে মিষ্টি বটে, কিন্তু চিনি হইলে তাহা সেবন করিয়া সমগ্র জীবের আস্বাদানন্দ যে তোমার ভিতর অভিব্যক্ত হইবে, নিজের চিনির আস্বাদ আর কতটুকু? সমগ্র জীবের আস্বাদ নিজের ভিতরে উপলব্ধি করার সুখ অপেক্ষা তাহার সুখ কণাংশ– নহে। চিনির আস্বাদলোলুপ স্বার্থপর ব্যক্তি কি আর ভক্ত প্রবর শ্রী মৎ কবিরাজ গোস্বামীপাদের গোপীকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়। এই গোপী ভাবের নিগুঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমে করিতে পারে? রাধাকৃষ্ণের মিলনাত্মক আত্মার স্বরূপানন্দ উপভোগব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ কখনই গোপী ভাবের আদর্শ নহে।[৩০]

সমন্বয় সম্পর্কে শ্রী নিগমানন্দ দর্শনের সর্বশেষ সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত– চিত্তশুদ্ধ না হইলে কোন ধর্মেই অগ্রসর হওয়া যায় না। খৃষ্টান-মুসলমান মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবে মতভেদ, পৌরাণিক-দার্শনিক মতভেদ, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়েই মতদ্বৈত্ব দেখা যায় না। চরিত্র গঠনপূর্বক চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা খৃষ্টান, মুসলমান সম্প্রদায়েও অনুমোদিত। চুরি কর, মিথ্যা কথা বল, ইহা কোন সম্প্রদায়েরই অভিপ্রেত নহে। সুতরাং আমরা প্রথমে জীবনে সর্বসম্মত চিত্তশুদ্ধির সাধনা আরম্ভ করিতে পারি। চিত্তশুদ্ধি হইলে যাহার যে ভাবে, যে মতে বিশ্বাস হইবে, তাহাই অবলম্বন করা কর্তব্য। অন্য মত শ্রেষ্ঠ ও নিজ মত নিকৃষ্ট, মিথ্যা কুসংস্কারপূর্ণ শুনি মাত্র বিচলিত হইও না। নিজমত দৃঢ় করিয়া ধারণ পূর্বক তাহার পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য চেষ্টা করিবে। কেন না কোন মতই– কোন

৩০। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ই নিরর্থক নহে। অজ্ঞতাপ্রসুক্ত লোক সকল সাম্প্রদায়িক মতগুলির সমালোচনা করিয়া দুর্বলধিকারীর মন বিগড়াইয়া দেয়, কিন্তু কোন মতই মিথ্যা নহে, সকল মতেরই আশ্রিতগণ পূর্ণ সত্যে কিংবা সত্যের একদেশে উপনীত হইবে। যখন মানব সমাজের জনগণ পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির তখন তাহাদিকের মধ্যে বৈষম্য থাকা অবশ্যম্ভাবী সুতরাং মতগুলিকে পথমাত্র জানিয়া, কোন মতের নিন্দা না করিয়া কিংবা সকল মতের খিচুড়ী না পাকাইয়া সতী নারীর ন্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়া থাকিবে। জন্মান্তরের সংস্কার এবং শিক্ষা ও রুচিভেদে অধিকারানুরূপ যে কোন একটি পথ অবলম্বন করিবে। অনন্তর শিক্ষায় বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া, ভাব পুষ্ট হইয়া লক্ষ্য স্থির হইলে তদনুরূপ সাধন প্রণালী অবলম্বন করিবে। সাধনায় লক্ষ্য বস্তু উপলব্ধি হইলেই তৎপ্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে। তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকূল হইবে। তখন সংসারের যাবতীয় বস্তুতে বিরাগ জন্মিয়া অভীষ্ট বস্তুতে চিত্তের অবিচ্ছিন্না একমুখী গতি হইবে। কাজেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। তখন আত্মস্বরূপ লাভে কৃতার্থ হইয়া মুক্তি পথে অবস্থিতি করিবে। কিন্তু মুক্তি লাভ করিতে হইলে একজন মুক্তব্যক্তির সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রে তিনিই 'গুরু' নামে অভিহিত হন। গুরু কৃপা না হইলে মুক্তি পথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। গুরু-শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার না করিলে অধ্যাত্মজ্ঞান লাভে কৃতার্থ হওয়া যায় না। সুতরাং গুরুর আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবে। যিনি আত্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন তিনিই গুরু। নতুবা অন্যের নিকট যাইলে গুরুর অভাব পূর্ণ হইবে না। এরূপ গুরু না পাইলে তজ্জন্য সরল ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে। উপযুক্ত সময়ে গুরু আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে। গুরু পাইলে আর ভাবনা

449697

Dhaka University Institutional Repository

কী? সর্বস্ব তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া তদীয় আদেশ পালন করিয়া যাও সর্বার্থ সিদ্ধি হইবে।[৩১]

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিগমানন্দ নিজের উপলব্ধি ও সাধনা দ্বারা যে সত্য লাভ করেছিলেন তাঁর লিখিত সিদ্ধান্ত ও মতগুলি অদ্যাবধি তুলে ধরে আমরা নিশ্চই বুঝতে পারছি, নিগমানন্দ দর্শনে কোন কমতি নেই, কোন ঘাটতি নেই, এক পরিপূর্ণ সত্যই তাঁর দর্শনে ফুটে উঠেছে। এক সূর্যের আলো যেমন সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ কাল স্থান পাত্র অবস্থা পরিবেশ পরিস্থিতি ভেদে এই আলোর প্রকার ভেদ ঘটলেও মূলে এক সূর্যেরই বিবর্তিত রূপ। দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হলেও সত্য এক। সেই সত্য– সঃপ্রত্যক্ষ এব সর্বেষাং প্রেমরূপ। সর্বত্র প্রেমস্বরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। এই প্রেমস্বরূপতা লাভের জন্যই তাঁর বহু হওয়া। অর্থাৎ বহুরূপে প্রকাশ হওয়া। সরল কথায়–সমস্ত বিভিন্নতাই মূলতঃ এক অভিন্ন সত্তার আপাত ভিন্ন প্রকাশ। যেমন আলোচিত সূর্য ও তার কিরণ মালা আধার ভেদে নানা স্থানে নানা ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু সূর্যের কোন পরিবর্তন ঘটেছে না। যদি প্রশ্ন করি এই সত্যের সাথে অসত্যের এমন সংযোগ ঘটানোর উদ্দেশ্য কী? "জ্যোতি যেমন জড়ের সংস্পর্শে এলে তবে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় তেমনি ব্রহ্মও জড়ের সংস্পর্শে ছাড়া উপলব্ধ হয় না।"[৩২] তাঁকে উপলব্ধির জন্যই তাঁর এই পরিণতি ধারণ। আমরা বলতে চাচ্ছি, শুদ্ধ বুদ্ধ ব্রহ্ম জগতের কারণ নন। জগতের কারণ মায়া কল্পিত ঈশ্বর। যিনি জড়ের সংস্পর্শে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন। এই ঈশ্বর ব্যবহারিক ভাবে সত্য। যত দিন এই প্রাকৃত জগৎ আছে ততোদিন তিনিও আছেন। মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র পূর্ণ সত্য বা শুদ্ধ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্যই এই মায়া কল্পিত ঈশ্বর ও তাঁর জগতকে নিম্ন সত্য বলে স্বীকার করা, গ্রহণ করা, ব্যবহার করা , এবং তাঁকে মান্য করা। যেহেতু প্রকৃতির জ্ঞান সঞ্চয় না করে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান সম্ভব নয়।

৩১। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ৬৩-৬৪

৩২। ঐ, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্ম উপলব্ধি জড়ের সাহায্যেই করতে হয়। সে কারণে যতদিন পূর্ণ জ্ঞান উপলব্ধি না হচ্ছে ততোদিন জগৎ সত্য, জগৎকর্তা ঈশ্বরও সত্য। সমন্বয়মূর্তি বেদান্তদ্রষ্টা শ্রী নিগমানন্দ পরমহংসদেব এই ভাবেই জগৎ, জীব ও ব্রহ্মের সমাধান ও সামঞ্জস্য নির্বিকল্পের ভূমিতে অপরোক্ষ দৃষ্টিতে দেখে এবং সেই দৃষ্টি ও জ্ঞান নিয়ে জগতে ফিরে আসেন। এবং ব্যবহারিক জগৎ ও জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করে যান। তিনি যে স্বয়ং সমন্বয় মূর্তি এবং তাঁর দর্শন যে সমন্বয় দর্শন, তা শুধু মুখে বলেই তিনি সমন্বয় স্থাপন করেন নি। সমাধিতে যে অপরোক্ষ দর্শন লাভ করেছিলেন তা প্রমাণ স্বরূপ তাঁর রচিত গ্রন্থে, উপদেশ বাণীতে, চিত্র অংকিত করে এবং বিভিন্ন উপায়ে সেই দর্শন প্রতিস্থাপন করে গেছেন এই ধরাধামে। নিম্নে এর একটি নির্ঘন্ট সূচী প্রদত্ত হল:-

(১) কর্মপথ:- (অকর্ম, সকাম কর্ম, নিষ্কামকর্ম)

(২) উপাসনা ও গতি:- (স্বরূপলক্ষণায় উপাসনা, তটস্থলক্ষণায় উপাসনা)।

(৩) নিত্যলোকতত্ত্ব।

(৪) প্রাকৃত সৃষ্টি চিত্র ও ক্রমতালিকা।

(৫) ব্রহ্মান্ড ও ব্রহ্মচিত্র।[৩৩]

এই প্রমাণ তথ্যগুলি তুলে ধরে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন তাঁর সত্য দর্শন ও সত্য লাভের সারবত্তা। শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব এখানেই। যুক্তিদার্শনিকদের দর্শন মনগড়া কিন্তু স্বরূপদার্শনিকদের দর্শন একত্ব প্রত্যক্ষ ভরা। পৃথিবীতে যত স্বরূপ দার্শনিকগণ আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই নিখিল বিশ্বব্রহ্মান্ডের এক অনন্ত অসীম শক্তিমানকে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষতা নিয়ে সন্দেহ করেন নি।

পরিশিষ্টে আমরা এভাবেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি মহাপুরুষদের সার সমন্বয় করতে পারি। নিগমানন্দ দর্শন পরিচয় অদ্বৈতবাদীর দর্শন নয়, অদ্বৈত তাঁর লক্ষ্য। তাঁর দর্শন সমন্বয় দর্শন, তিনি

৩৩। পূর্বোক্ত, **নিগমানন্দ দর্শন**, পৃঃ ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়বাদী। তিনি জীবন্মুক্তিবাদী, তিনি আধিকারীক পুরুষ। তিনি ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠার জন্য জগৎকে মিথ্যা প্রমাণ করার কোন জেদ গ্রহণ করেন নি। বিবর্তবাদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেও তিনি বলেছেন, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন। শংকরপন্থী হয়েও পরিণামবাদের সাথে তাঁর কোন দ্বন্দ্ব ছিলনা। ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ উভয়কেই তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি যেমন নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করেছেন আবার ভাব লোককের 'অশেষ কল্যাণগুণ সম্পন্ন' ঈশ্বরকেও সমভাবে স্বীকার করেছেন। ব্রহ্মকে তিনি একক ভাবে অদ্বৈত বা দ্বৈত বলেন নি। বলেছেন, 'দ্বিদলচণকবৎ' যেমন ছোলার ঢাকা খোসার ভিতর দুটি দানা এক সঙ্গে জড়া হয়ে থাকে তদ্রূপ, এছাড়াও দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিত অবস্থারও উপলব্ধি তাঁর ছিল। নিগুর্ণ ব্রহ্ম হতে ভূলোকে এবং ভূ-লোক হতে নির্গুণ ব্রহ্মের সকল পথ, সকল স্তর তাঁর অধিগত ছিল। এজন্য মতবাদ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব তাঁর দর্শনে দেখা যায় না বরং রসাস্বাদনই হয়েছে বেশি। ভারত বর্ষের যত সাধন মত পথ আছে সকল মত পথেই তিনি পরিক্রমা করেছেন– এবং সকল মত পথের সার ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে তাঁকে তেমন কোন ক্লেশ স্বীকার করতে হয় নি। পরিব্রাজকরূপে তিনি শুধু বিভিন্ন দেশই পরিভ্রমণ করেন নি বরং বিভিন্ন মতবাদে সম্প্রদায়ে মিশে রহস্য অধিগত করে আবার সেই মন্ডলী থেকে বেরও হয়ে এসেছেন। অতীন্দ্রিয় চেতনায় তিনি যেমন নিমজ্জিত থাকতে পারতেন অনুরূপ ব্যবহারিক দশাতেও অনায়াসে ফিরে আসতে পারতেন। ডুব দিতে তিনি যেমন জানতেন, তেমনি ভেসে উঠতেও পারতেন। অদ্ভূত রহস্যবিদ্ ছিলেন তিনি। কোন মতবাদ বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বা আচার্যকে তিনি অবজ্ঞা করতেন না, বরং 'সকলের নিকট মাধুকরী করিয়াই তিনি জ্ঞানের ভান্ডার কে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন।' অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা। সত্যকে নূতন নূতন ভাবে জানাই হল তাঁর জীবন সাধনা। অফুরন্ত আস্বাদনলোলুপতা ছিল তাঁর। সর্বধর্মসমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্মের বিস্তারই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। সর্বধর্মসমন্বয় অর্থে তিনি বুঝিয়েছেন, স্ব-স্বধর্মে নিষ্ঠা এবং অপরের ধর্মকে নিন্দা না করা। ঐক্য বলতে তিনি সকল মত পথকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করতে বলেন নি, বরং স্ব স্বভাব ঠিক রেখে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য সূত্র

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনকেই সমন্বয় বলেছেন। এই ভাবে সর্বধর্মসমন্বয় কী, সমন্বয় অর্থ কী, সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক কী, নিজেই বিশ্লেষণ করে গেছেন তাঁরই সহস্ত রচিত অমূল্য গ্রন্থে। জীব জগতের কল্যাণ ছিল তাঁর মহান ব্রত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পরার্থে জীবন দান করতে এক বিন্দু পিছপা হননি। তিনি কী প্রকার ত্যাগী নিবেদিত উদার প্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁর লিখনিতেই প্রমাণ মিলে– যিনি পরকে অমৃত বিলিয়ে নিজের জন্য কালকুট সঞ্চিত করতে এবং পরের গলায় মণিহার জড়িয়ে আপন কণ্ঠে ফণীহার দুলিয়ে আনন্দে গালবাদ্য করে নৃত্য করতে শিক্ষা দিয়েছেন– তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। শিবসাসুজ্য লাভ করে এই ভাবেই তিনি শিবের মত জীবন যাপন ও শিক্ষা দান করে গেছেন জগৎবাসীকে। তিনি আদর্শগৃহী ও আদর্শ সন্ন্যাসীর মিলন চেয়েছিলেন। তিনি কোন দ্বন্দ্বের বীজ বপন করেন নি। বরং পরস্পরের দম্ভচুর্ণ করতেই এই বিধান সংঘ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ; দুই শ্রেণীতে অবাধ ছিল। অর্থাৎ সংসার করেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় এবং সংসার ত্যাগ করেও তা লাভ করা যায়। তিনি পুরাণের হরিহরের পূজা একসঙ্গে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সমাজ কল্যাণ চিন্তা শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের প্রথম শর্ত। জীব সেবা বলতে তিনি অর্থ পরমার্থ উভয় সেবাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন; তবে জ্ঞান সেবা যে শ্রেষ্ঠ সেবা তা ব্যাপক ভাবে বুঝিয়েছেন। সেবা শিক্ষাদানের জন্য তিনি ভক্ত সম্মিলনী অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন। এই সংঘ সম্মিলন হতেই মানুষ তা শিখবে এবং শিখাবে। তিনি ভক্তসম্মিলনীর মধ্যমণি হয়ে এই পূণ্য অনুষ্ঠানকে চির অমর করে রেখেছেন। বাংলায়– এই ভক্ত সম্মিলনীর আদি প্রবর্তক তিনি। এই সম্মিলনীতে একের উদ্দেশ্যে সবাই মিলিত হয়। একের আনন্দ বিধানে সবাই উন্মুখ থাকে। তিনি হলেন 'সেব্য', 'পুরুষ', আমরা হলাম সেবিকা বা সেবাকারিণী প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পুরুষের মিলনই ছিল তাঁর সম্মিলনীর উদ্দেশ্য।

জীব দুঃখ মোচনে বাধ্য হয়ে তাঁকে লৌকিকত্ব ছেড়ে অলৌকিক অসম্ভব কিছু কাজ ভক্তের অনুরোধে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছিল। যা তিনি নিজ প্রয়োজনে কখনও এই অলৌকিক শক্তি ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

করেন নি। তিনি অতি সহজে "পরকায় প্রবেশ, সূক্ষ্মশরীরে গমনাগমন, দূরদৃষ্টি, জাতিস্মরতা, লোকলোকান্তরে অব্যাহত গতি, অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা, তাঁর অনায়াস ছিল। এই সম্পর্কে তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, 'তাই না কি আমি তো কিছুই জানি না। বিশ্বাসের চোখে তোমরা ঐরূপ দেখ।"[৩৪] তাঁর আলৌকিকত্বকে তিনি তবুও স্বীকার করতেন না। তিনি ভালভাবেই জানতেন, অলৌকিকত্ব দিয়ে মানুষের মন তড়িৎ গতিতে আকৃষ্ট করা যায় বটে কিন্তু তা স্থায়ী ফল লাভ হয় না বরং একদিন তা অবিশ্বাস রূপেই পরিণত হয়। ভারতবর্ষের অলৌকিক তপঃশক্তি সম্পন্ন অনেক মহাপুরুষের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি নিজেকে এত আড়াল করে রাখতেন, তাঁর চাল-চলন, কথাবার্তা, বেশ ভূষাই তা প্রমাণ করতো। তিনি ক্রান্তদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, বলেই ভারত বর্ষে বর্তমানে যা ঘটবে পূর্বেই তিনি তা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আস্তিক-নাস্তিক কোন দর্শনই তাঁর নিকট হেয় ছিল না। সকল পুষ্প হতে তিনি নির্যাসটুকুই গ্রহণ করেছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব দর্শনের ভিতর তিনি অবগাহন করেছিলেন এবং এসব দর্শনের মতবাদ যে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত তা তিনি উপেক্ষা না করেও একাত্মতা অনুভব করে অতিক্রম পূর্বক বরং নিজস্ব ভঙ্গিতে অভূতপূর্ব এক রসের আভাস পেতে সমর্থ ছিলেন। তর্ক বিচার ও সংশয় তাঁর জীবনেও উদিত হয়েছিল কিন্তু গভীর শ্রদ্ধা ও অবিকম্প প্রত্যয় ছিল তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল। তিনি নিজেই সে সম্পর্কে লিখে গেছেন,' "আমি স্থুল সূক্ষ্ম, সান্ত-অনন্ত ও সাকার-নিরাকার প্রভৃতি ভগবানের সকল ভাবই বিশ্বাস করি।"[৩৫]

শ্রী নিগমানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শিষ্য শ্রীমৎ অনির্বাণ শ্রীগুরুর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শকে ভারতীয় দর্শন ইতিহাসের পরিপূরক রূপে দেখেই ভারতবর্ষকে জানালেন-

> ভারতের দর্শন তত্ত্ব খানিকটা নয়, সবটুকুই অনুভূতিগ্রাহ্য। অনুভূতির প্রমাণ এখানে সবার চেয়ে বড়; তারপর সেই অনুভূতিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করবার জন্য তর্কের

৩৪। পূর্বোক্ত, শ্রী শ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বানী, পৃ. ১০৩
৩৫। ঐ, পৃষ্ঠা ৫২

Dhaka University Institutional Repository

অবতারণা– এই হচ্ছে আমাদের দার্শনিকতার রীতি। কোন ইংরেজি হিষ্টরি অব-ফিলজফিতে দেখবা 'প্রাচ্য জল্পনা' সম্বন্ধে বেশ মুরুব্বীয়ানা আছে। কিন্তু সত্য বলতে কি, ইউরোপীয় দর্শনটাই বরং আগাগোড়া জল্পনা– কেবল বুদ্ধির কসরত। পিছনে অনুভূতির জোর নাই বলে ইউরোপে সম্প্রদায় গড়ে ওঠে না। হেগেল বল, কান্টবল, তাঁদের মেটাফিজিক্স একান্তভাবে তাঁদেরই। তা ব্যক্তিগত বুদ্ধির দর্শন মাত্র, জাতির জীবন দর্শন মোটেই নয়। আমাদের দেশে সব চাইতে বেশি বস্তুতন্ত্র মনে হতে পারে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনকে। কিন্তু সেই ন্যায়-বৈশেষিকবাদীদেরও একটা জীবনাদর্শছিল– অধ্যাত্মরাজ্যে তাঁরা মাহেশ্বর ও পশুপাত বলে খ্যাত। মোক্ষ যদি দুঃখের অত্যন্তাভাব হয়ে থাকে, তার মধ্যে যদি ইতিবাচক কিছু না থেকে থাকে, তবে তার প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহারিক জীবনেও সমস্ত ইতি-ভাবনাকে বর্জন করে তাঁরা রিক্ত হয়ে বেড়াতেন– অপবর্গের মূর্তবিগ্রহরূপে। এখানকার দর্শন তাই জল্পনা (Speculation) নয়, অন্তরের গভীর অনুভব এবং অকপটে তাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলবার একটা প্রয়াসা দ্বারা অনুপ্রাণিত।[৩৬]

স্বামী নিগমানন্দের সার তত্ত্বের সাথে তাঁর বক্তব্যের ঐক্য এখানেই খুঁজে পাই যেহেতু ভারতীয় দর্শন শুধু বহিশ্চর তর্ক বিতর্কের উপর নির্ভরশীল নয় বরং এই দর্শন প্রত্যক্ষবাদ ও অপরোক্ষ অনুভূতির উপরেই অধিক বিশ্বাসী।

শ্রীমৎ অনির্বাণ ছিলেন পরা অপরা বিদ্যার অধ্যাপক ও দার্শনিক। তিনি কত বড় প্রজ্ঞা জ্ঞান-সম্পন্ন মানবাত্মা রূপে ভারত বিখ্যাত ছিলেন তার প্রমাণ পাই সনাতন ভারতের ঐতিহ্য স্বরূপ ভারতের প্রাণ– 'বেদ'-এর মীমাংসা বাংলার মানুষের জন্য প্রথম রচনা করে তিনি ভারত ধর্মের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত আজও বেঁচে আছেন। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন বলেই কত প্রাচ্য পাশ্চাত্য

৩৬। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ১২৬-১২৭

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক তাঁর মুখোমুখী হয়ে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের দর্শন ইতিহাসের সাথে বর্তমান দর্শনের পার্থক্য কোথায়? তিনি এই পরিপ্রেক্ষিতে জানান,

> ভারতীয় দর্শন আন্দাজের ওপর নয়, গভীর অনুভব ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের উপর গঠিত। তাই আধুনিক বিজ্ঞান তার কোনও সিদ্ধান্ত ভূমিসাৎ করতে পারেন নি বরং বিজ্ঞানের আলোকে তার অনেক তথ্যই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই মায়াবাদেরই একেবারে অবিকল প্রতিরূপ দেখতে পাবে আধুনিক ইলেকট্রনিক থিওরি অব্ ম্যাটার-এ , আইষ্টাইনের থিওরি অব্ রিলেটিভিটিতে। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম্ থিওরিতে দেখবে শৈব দর্শনের স্পন্দবাদের বিবৃতিতে। ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তা অতি স্বচ্ছ সরল সুস্পষ্ট ও সংস্কারমুক্ত। অথচ আমরা পরাধীন বলেই শুনতে হয়, আমাদের ফিলজফি নাকি Not worth the name, consisting of idle speculation। অপরে একথা বলতে পারে বটে, কেননা সে আমাদের মর্মে প্রবেশ করেনি... ।[৩৭]

নিগমানন্দ দর্শন হল প্রত্যক্ষ দর্শন, চেতনার কোন না কোন ভূমিকার উপযোগী। আর আধুনিক দর্শন হল বুদ্ধির দর্শন ইন্দ্রিয়নির্ভর। নিগমানন্দ দর্শন বুঝতে চাইলে আধুনিক দর্শনের যে মত দার্শনিক মনীষী শ্রীমৎ অনির্বাণ যে প্রজ্ঞা দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন তা মিলিয়ে দেখলেই এর বিশেষত্ব বুঝতে সক্ষম হব।

> দর্শন বুদ্ধির সৃষ্টি । বুদ্ধির সাধারণ অবলম্বন হল ইন্দ্রিয়নির্ভর মন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে সামান্য ভাবনার বৃত্তি আছে, তা-ই হল তার বৈশিষ্ট্য। এই সামান্য ভাবনার সহায়ে অতীন্দ্রিয় বিষয়েও বোধ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব। ন্যায়ের আরোহ এবং অবরোহ অনুমানে আমরা তার পরিচয় পাই। অনুমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি। তবে অনুমাণ চরম প্রমাণ নয়। চরম প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ। অনুমাণ

৩৭। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

যদি প্রত্যক্ষাশ্রিত অথবা প্রত্যক্ষ পর্যবসান হয়, তাহলে তার সার্থকতা। অনুমাণকে প্রত্যক্ষ দিয়ে তন্ত্রিত কিংবা বিশেষের প্রত্যক্ষ হতে সামান্যের অনুমাণের দিকে এগিয়ে জ্ঞান প্রসার ঘটানো বুদ্ধির কাজ। এমনি করে বুদ্ধি জ্ঞানের একটা সার্বভৌম তন্ত্র (Universal system) তৈরি করতে পারে। এই তন্ত্রই হল দর্শন।[৩৮]

কিন্তু নিগমানন্দ দর্শন দেখতে হবে এর আরও একধাপ উপরে উঠিয়ে। যার বাস্তব রূপ দিয়ে দেখিয়েছে নিগমানন্দ দর্শন। এছাড়াও দার্শনিক মণীষী শ্রীমৎ অনির্বাণ– যে কারণে ঋষি মহাপুরুষের দর্শন সাধারণ দার্শনিকদের বোধগম্য হয় না এই প্রেক্ষিতে নিম্নে যে আলোচনাটি তুলে ধরেন তা এক্ষেত্রে আরও অধিক প্রণিধানযোগ্য। যথা–

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ কি প্রত্যক্ষের শেষ সীমা? বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ দিয়ে জানা শেষ হয়ে যায় না, অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের কাছে খুলে যায় আরেকটা বিরাট জগৎ। সেখানেও জানার শেষ হয় না। অন্তর জগতের জ্ঞান প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত দুই উপায়েই হতে পারে। প্রাকৃত উপায় হল মন দিয়ে জানা– প্রত্যক্ষ ভাবে নিজের অন্তরকে এবং পরোক্ষ ভাবে বা অনুমাণের দ্বারা অপরের অন্তরকে। এ দেশের মনোবিজ্ঞানীরা একটা অদ্ভুত কথা বললেন, মন দিয়ে জানার ব্যাপারটা যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে আরেক ধরণের জানা সম্ভব হয়– যা অতীন্দ্রিয় এবং অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের তাঁরা নাম দিলেন প্রাতিভসংবিৎ। যে উপায়ে বা প্রমাণের সহায়ে এ জ্ঞান হয়, তাঁর নাম দিলেন প্রজ্ঞা বা বোধি। এই বোধিই হল অধ্যাত্মবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উপজীব্য। বোধির দর্শন ও বুদ্ধির দর্শন দুয়েই মিলে দর্শনের পূর্ণতা।[৩৯]

৩৮। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ১৪৫

৩৯। ঐ, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

বোধির দর্শনকে পাশ্চাত্য দর্শন বা আধুনিক দর্শন যে কারণে আজগবী বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তার উপযুক্ত জবাব ভারত বিখ্যাত মনীষী দার্শনিক অনির্বাণজীর মত দান থেকে খুঁজে পাই। যথা,

> বোধির দর্শন অতীন্দ্রিয়ের কারবারী। কিন্তু অতীন্দ্রিয় বলতে এখানে আজগবী কিছু বোঝায় না। অতীন্দ্রিয় তা বস্তুত ইন্দ্রিয়ের অতিরেক, তার বীজ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেই আছে। বহিরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টি পরাক্ (objective), তাতে আসে বিষয় সচেতনতা। কিন্তু চেতনার বৃত্তি পরাক্ এবং প্রত্যক্ (Subjective) দুদিকেই কাজ করে। তাই বিষয় সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট হলেও আত্মসচেতনার কিছু না কিছু দেখা দেয়ই। আত্মা সচেতনতার প্রথম উন্মেষ হয় আচ্ছন্ন, জৈব মানস-বোধের সঙ্গে জড়ানো। এই অবিবিক্তবোধ বিবিক্ত হওয়ার সুযোগ পায় মানুষের মধ্যে। তার গোড়ায় থাকে একটা সচেতন উৎকর্ষণের প্রেরণা। মানুষ ছোট আমির উপরে দেখতে পায় একটা বৃহৎ আমিকে। দেখাটা স্পষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়ের পরাক্ বৃত্তিকে প্রত্যাহৃত করলে। তখন আত্মশক্তির একটা প্রশান্ত উজ্জ্বল প্রসন্ন এবং মহিমময় বোধের সুস্পষ্ট উন্মেষ হয়। ইন্দ্রিয় বোধের উজানে এই বোধি প্রথম দেখা দেয় বিদ্যুৎ চমকের মত। অভ্যাসে চঞ্চল বিদ্যুৎ স্থির হয়, হয় ইন্দ্রিয়ের পরাক্ বৃত্তিরও প্রবর্তক। তাতে সম্ভব হয় গীতোক্ত যোগস্থের কর্ম। প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যে-কোন মানুষের কর্ম প্রবৃত্তির মূলে এই ভাবটি আছে– অস্পষ্ট হয়ে, ব্যামিশ্র হয়ে। অন্তরাবৃত্তির ফলে যত তার ব্যামিশ্র ভাব কেটে যায়, ততই আত্মসমাহিতি এবং আত্মবিকিরণ দু-ই তার পক্ষে সহজ হয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই দুইটি ব্যাপারই শুদ্ধ বোধের ক্রিয়া এবং স্বরূপত তা অতীন্দ্রিয়।[৪০]

অথবা, 'অতীন্দ্রিয় আত্মবোধই হল দর্শনের মূল। অন্তত এ দেশে দর্শনের ইতিহাস তাই। পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম-দর্শন আর বিজ্ঞানের মাঝে একদিন খুবই

৪০। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

রেষারেষি চলেছিল, কিন্তু আজকাল তার ঝাঁঝ একটু কম। ধর্ম বিশ্বাসের অনুকূলে দার্শনিক যুক্তি আবিষ্কার করা এবং দার্শনিক যুক্তিতে বস্তুনিষ্ঠ করা, এই হল ও দেশে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ঐতিহাসিক ক্রম। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠতা সেখানে চিত্তের পরাক্ বৃত্তিকে বিশেষ করে আশ্রয় করেছে বলে অধ্যাত্ম জগতে আর বাস্তব জগতে একটা ফাঁক দেখা দিয়েছে। এদেশের তত্ত্ব জিজ্ঞাসুরা এ ভুলটি করেন নি। গোড়া থেকেই তাঁদের দৃষ্টি নিহিত রয়েছে আত্মবোধের উপরে, ধর্মবোধকে তাঁরা দিয়েছেন প্রত্য বৃত্তির মূল্য। তাতে অধ্যাত্মবিদ্যা আর মনোবিজ্ঞান বরাবরেই এদেশে পাশাপাশি চলেছে, যার ফলে মানসোত্তর একটা বিজ্ঞান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রয়াস এখনও থেমে যায় নি, আমরা পূর্ণযোগে দেখি তাঁরই একটি সমৃদ্ধতর অনুবৃত্তি। এ দর্শনে আধ্যাত্মিকবস্তুনিষ্ঠা এবং আধিভৌতিক বস্তুনিষ্ঠা দুই-ই মর্যাদা পেয়েছে এবং দুয়ের সমাহারে একটি পুর্ণাঙ্গ তন্ত্র গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।[৪১]

নিগমানন্দ দর্শনে শংকর একজন অসাধারণ অপরোক্ষ বিজ্ঞানী। গৌরাঙ্গদেবও চরম অদ্বৈতবাদের কাছে নির্যাতীত এবং নিগৃহীত হলেও নিগমানন্দ দর্শনে তার প্রতিভাজ্ঞান গরিমা এবং দর্শনকে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। প্রেম ভক্তি সাধারণ মানুষকে দান করার জন্যই পৃথিবীতে তাঁর আগমন–এ অতি সাধারণ ও তুচ্ছ আলোচনার অন্তর্ভূক্ত নয়। দু জনই মহাজ্ঞানী মহাভক্ত নিগমানন্দ দর্শন তাঁর দর্শনে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'মিথ্যা' শব্দটি অলীক অর্থে নয়, যেমন 'শশশৃংঙ্গ', 'আকাশ-কুসুম' জগতে কেউ দেখেনি। প্রকৃত মিথ্যা বলতে একেই বলতে হয়। কিন্তু শংকর দর্শনের মিথ্যা অর্থ যা প্রথমে সত্য রূপে প্রত্যক্ষ হয় পরে বাধিত হয়, তাই অসত্য বা মিথ্যা। এই ছিল, কিছু সময় পর নেই। এই অর্থেই শংকর জগত মিথ্যা বলেছেন। মিথ্যা অর্থ তুচ্ছত্বপ্রতীতি। নিগমানন্দ দর্শন কিন্তু আরেক ধাপ উপরে এগিয়ে

৪১। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, জগত একেবারে মিথ্যা নয়, সেবার জন্য জগত সত্য। জগতে মানুষ কিছু দেয়ার জন্যই জন্ম গ্রহণ করে। দিয়ে তৃপ্তি পায়, শান্তি পায়। এই দেয়ার তৃপ্তি একমাত্র সেবাবুদ্ধিতে আসে। কারণ সেবা-সুযোগ সবাই চায়। মহতের সেবা করেই প্রকৃত দেওয়ার সুযোগ অর্জন হয়। সব মিথ্যা হলেও সেবা মিথ্যা নয়। সেবাধর্ম মানুষকে মহীম করে। একমাত্র জগত সেবক রূপ শ্রী ভগবানের সাথে যুক্ত করায়। এই সেবার মাহাত্ম্যই প্রচার করেছেন শ্রী গৌরাঙ্গদেব। শংকরও সেবক, গৌরাঙ্গও সেবক। একজনের সেবা ব্রহ্মবুদ্ধিতে , একজনের সেবা জগতবুদ্ধিতে । যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। তিনিই প্রকাশ হয়েছেন দুই ভাবে। শ্রী নিগমানন্দ দর্শন এই সেবা বুদ্ধিকে জাগ্রত করার জন্যই জগত শিক্ষক রূপে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখানেই তাঁর অবতরণের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব। তিনি উভয় মনীষীকে এই দৃষ্টিতে এক করেছিলেন। জীবকে এই শিক্ষা দান করে গেছেন, তোমরা যে কাজই কর না কেন ভগবৎ বুদ্ধিতে , গুরুবুদ্ধিতে বা ব্রহ্মবুদ্ধিতে কর্ম করবে। এরই নাম সেবা। জীব জগত এই জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এই জীব জগত না থাকলে ঈশ্বর লাভের কোন কর্ম থাকতো কি? জীবব্রহ্ম শ্রী নিগমানন্দ এ কারণেই ভগবৎ বুদ্ধিতে কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন, এবং জগদ্ধিতকর কর্মের সূচনা করেগেছেন। জীব যাতে তার ক্ষুদ্র অহংকার নিমিষে চুর্ণ করতে সুযোগ পায়, নিষ্কামভাবে কর্ম করার বুদ্ধি লাভ করতে পারে। 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ক্ষুদ্র সার্থকে যাতে বড় করে না দেখে সহজেই জলাঞ্জলী দিতে পারি,– এই শিক্ষাই পৃথিবীকে একমাত্র শান্তির সূচক বলে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। জগতের সকলের সুখই আমার সুখ। আমার সুখ জগতের সুখ নয়। শ্রী নিগমানন্দ দর্শন এই শিক্ষাই জগতে দান করে গেছেন। অতএব নিগমানন্দ দর্শন মতে জীব জগত তুচ্ছ নয়, জীব জগত প্রবহমান সত্য। সেবার উপকরণ, অবলম্বন বা আশ্রয়ের বস্তু কখনো অসত্য, হীনতুচ্ছ হতে পারে না। সেবা বাধিত হোক নিগমানন্দ দর্শন স্বীকার করে না। ভগবৎ সেবা চিরকাল সত্য। 'নরই সাক্ষাত নারায়ণ'। নরকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবাই নরের উদ্ধার, নরের মুক্তি। পৃথিবীতে সব জীব নারায়ণ। 'জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ' জীব ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। শংকর দর্শনও এই কথা

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করেন। 'নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন ইহা হইতে ধর্ম আর নাহি সনাতন।[৪২] গৌরাঙ্গ দর্শনেরও এই মত। জীবে দয়া বৈষ্ণব জ্ঞানে (বিষ্ণু জ্ঞানে) জানাতে হবে। এই দয়াই তখন সেবা হবে। সেবা ভাব আসলে জীবের অহংকার চূর্ণ হবে। 'তৃণাদপিসুনিচেন' বোধ জাগ্রত হবে। জীব মুক্তি পথের আলো দেখতে পাবে। পৃথিবী থেকে হিংসা, ঘৃণা, নিন্দা, মিথ্যা, চুরি, ছিনতাই, খুন, নির্যাতন বন্ধ হবে। শান্ত সুন্দর মানুষ শান্তি সুন্দর পৃথিবী পাবে। সুন্দরের জগৎ সুন্দর হয়ে উঠবে। জ্ঞান ভক্তিতে জীব প্রেম সুধা পান করবে। কারও সুখ কেউ কেড়ে নিবে না। কাউকে কেউ দুঃখ দিবে না। সবার সুখে সবার দুঃখে সবাই সমভাগী হবে। জগৎ তখন 'সর্বস্খলিদংব্রহ্ম' হবে। তখন সবাই এক ভগবানকে দেখবে। এক ভগবানই তখন সব হবে। ভগবানের জগতে ভগবানই থাকবেন। মানুষগুলি সব ভগবান হবেন। যত বিরোধ শয়তানে ভগবানেই হয়ে থাকে। ভগবানে ভগবানে বিরোধ সম্ভব নয়।

নিগমানন্দ দর্শন জীবন ভর এই প্রত্যাশাই করে গেছেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহা সেবক রূপে জীব জগতের সেবা দ্বারা সেবা শিক্ষক রূপে শিক্ষা দান করে গেছেন– 'আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন'-ই যে জাতির মঙ্গল দিক এবং এই আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন ছাড়া যে দেশ জাতির কল্যাণ অসম্ভব ত্রিশ বছর ধরে প্রতি ঘরে ঘরে এই আদর্শই স্থাপন করে গেছেন। প্রতি গৃহস্থের ঘরকে তিনি মানুষ তৈরির কারখানা রূপে নির্বাচন ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কারণ এই কারখানা থেকেই জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বের হয়ে আসবে। যেহেতু সংসারাশ্রম জৈষ্ঠ্য ও শ্রেষ্ঠ আশ্রম। এই আশ্রমকে সুরক্ষার প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করতে পারলেই পৃথিবীতে মঙ্গল বয়ে আনা সম্ভব, অন্যথায় নয়। নিগমানন্দ দর্শন এই জন্যই আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং গৃহস্থদের নির্ভর ও সেবা দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ঘরে ঘরে সম্ভব নিজে আচরণ করে সেই শিক্ষাও দান করে গেছেন। নিগমানন্দ দর্শনের অভিমত এই কলির দুর্বল ইন্দ্রিয়সর্বস্ব ভোগলোলুপ, স্বার্থপর

৪২। পূর্বোক্ত, প্রেমিক গুরু, প্রষ্ঠা নং- ৩২

Dhaka University Institutional Repository

মনুষ্যজাতির মুক্তির একমাত্র সহজ সরল পথ জীবব্রহ্মের উপাসনা এবং নির্বিচারে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করা। জীবব্রহ্মের উপাসনাই হল বেদান্তবিদ্ আচার্যের উপসনা। দ্বৈতবাদে দেবদেবীর মূর্তির উপাসনার চাইতে সাক্ষাত বেদান্তবিদের উপাসনা চিত্তশুদ্ধির একান্ত সহায়ক রূপে অধিক এবং সহজ লভ্য। স্বরূপ সাক্ষাৎকার চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন এজন্যই সম্ভবপর নয়। চিত্তশুদ্ধিকে এই লক্ষেই পৃথিবীর সকল ধর্ম মত পথ একযোগে সাগ্রহে সবাই গ্রহণ ও বরণ করেছেন। এজন্য নিগমানন্দ দর্শন এই মতের প্রতি সবিশেষ জোর দিয়েছেন।

নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা সকলের আসেনা। কারণ সকলের রুচি, প্রকৃতি, ক্ষমতা ও প্রতিভা সমান নয়। নিগমানন্দ দর্শন এজন্যই অধিকারবাদ সমর্থন করেছেন। অধিকারী বিচারে নিগমানন্দ দর্শন তাঁর দর্শনের মূল লক্ষ্য রূপে স্বরূপ লক্ষণায়– এজন্যই সগুণ ব্রহ্ম, কুটস্থব্রহ্ম এবং জীবব্রহ্মের উপাসনা অধিকারীভেদে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। শ্রীভগবানের দয়ার রাজ্যে কেউ বিমুখ হবে না। শুধু বুক ভরা আকুলতা, বিরহ ও ব্যথা নিয়ে তাঁকে চাইতে পারলেই জীবের উদ্ধার। ভগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি– রামানুজ, মধ্ব, বল্লব বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সবারই এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত। দ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তই হল– জীব অনু, ভগবান্ বিভু, ভগবানের দাসই জীব; জগত সত্য এবং জীব কখনো ভগবানের সমান হতে পারে না। জীব অনু সেবক, আর ভগবান সেব্য। গৌরাঙ্গ দর্শনের এই শিক্ষা সর্বসাধারণ। কিন্তু তাঁর দর্শনের গভীরের বিশেষত্ব হল 'অচিন্তভেদাভেদ'। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের একান্ত পার্ষদ জীবগোস্বামীপাদ, বলদেব বিদ্যাভূষণ, রূপসনাতন, কবিরাজ গোস্বামী – প্রভৃতি মহাজনগণ ভক্ত ভগবানে কোন ভেদ পরিলক্ষণ করেননি। বিধিমার্গে আপাত ভেদ রাগমার্গে অন্তিমে একাকার বরং এই দর্শনই দান করে গেছেন। সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব বুঝলেই রাধাকৃষ্ণ কী এবং গৌরাঙ্গ কী বুঝতে পারবে। উক্ত মহাজনগণই জেনেছিলেন 'রাধাকৃষ্ণ মিলনে গৌর হইয়াছে'। রাধাকৃষ্ণ হল সাধ্যতত্ত্ব গৌরাঙ্গ হল সাধনতত্ত্ব বা ভক্তের ভাব। শ্রীনিগমানন্দ দর্শন একারণেই জানালেন–

Dhaka University Institutional Repository

ভগবান্ রাধাকৃষ্ণ অবতারে যে তত্ত্ব বিকাশ করিয়াছেন, সেই সাধ্যতত্ত্বের সাধনা প্রণালী গৌরাঙ্গ অবতারে প্রচারিত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব- সাধ্য অর্থাৎ ভগবানের ভাব আর গৌরাঙ্গতত্ত্ব- সাধনা অর্থাৎ ভক্তের ভাব। সুতরাং যিনি ভগদ্ভাবে রাধাকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন, তিনি ভক্ত ভাবে সেই লীলারস-মাধুর্য আস্বাদন করিয়া জীবকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ অবতারের বিভিন্নতা, নতুবা তাঁহাদিগের উপাদানগত কোন পার্থক্য নেই। ইহাই বৈষ্ণবীয় দর্শনের অচিন্তভেদাভেদ তত্ত্ব।[৪৩]

সমন্বয় সামঞ্জস্যবাদী নিগমানন্দ দর্শন এ রূপে তাঁর সাধন দৃষ্টি দ্বারা সর্বত্রই একাকার দর্শন করেছেন। আপাতভিন্ন, বৈষম্য যেখানেই প্রবল সেখানেই অভিন্ন সৌসম্য নিরন্তর, তিনি আবিষ্কার করে দেখিয়ে গেছেন। বেদের সৃষ্টি তত্ত্বের চিরভাস্বর বাণী- 'অহং বহুস্যাম প্রজায়তে' আমি এক বহু হয়েছি। এই চির পরস্পর বিরোধী বাণীর নিগমানন্দ নামের সার্থকতাস্বরূপ তিনি 'নিগম' অর্থ বেদ, এই বেদসার আবিস্কার করে আনন্দে অভিভূত হন। তাই তাঁর নাম 'নিগমানন্দ' হয়েছিল। এই বিরোধের পরিহার এবং প্রাণের ঐকান্তিক মিলন গড়াই ছিল তাঁর সমন্বয়ী দর্শন যা বর্তমান বৈরী বৈপরীত্যযুগের একমাত্র শান্তির আশ্রয় দর্শন। বুদ্ধি ও বোধির মিলিত দর্শন।

৪৩। পূর্বোক্ত, নিগমানন্দ দর্শন, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার সাথে নিগমানন্দ দর্শন চিন্তা ও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা

(দৃশ্ +অনট্ = দর্শন)। দৃশ্ ধাতুর সাথে অনট প্রত্যয় যুক্ত হয়ে দর্শন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। দর্শন শব্দের সাধারণ অর্থ হল দেখা। তবে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে দর্শন শব্দটিকে ঠিক সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হয় নি। ভারতীয় চিন্তা অনুযায়ী দর্শন হল সত্যের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা।

মানুষ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। অজানাকে জানার একটি অদম্য কৌতুহল সবসময় তার মধ্যে বিরাজ করে। তাই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতো শুধু জীবন ধারণ করেই তৃপ্ত হতে পারে না। সে জানতে চায় কেন সে বসবাস করে– কেমন করে সে বসবাস করে। কি তার উদ্দেশ্য, ইত্যাদি। এই সব জিজ্ঞাসার সদুত্তোরের জন্য মানুষ নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করে এবং এই চিন্তাই দর্শনের মুল।

মানুষের জীবনে এমন সময় আসে, যখন এই বিচিত্র জগৎ তাঁর মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে– তার মনে হয় জগত এবং জীবন রহস্যময়। তখন তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগে; যেমন আমি কে? পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে আমার বস্তুগত সম্পর্ক কী, আমার জীবনের শেষ কোথায়, বা কেন আমি জগতে এসেছি, জগৎ কী, জগত সৃষ্টির কারণ কী, কে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করল, ঈশ্বর কে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি আদৌ আছে, জগত জীব ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে, ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহ অবিরত মানুষের মনকে বিচলিত করে রাখে। তাই এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করে। মানুষের এই চিন্তাই দর্শন। এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে আদিকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে তাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপট থেকে এ সকল প্রশ্নের সদুত্তোর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয়রা তাদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম। মূলত এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় সম্প্রদায়ের বসবাস তাদের মধ্যে কেউ বা আস্তিক আবার কেউ বা নাস্তিক, কোন কোন সম্প্রদায় জড়বাদী আবার কেউ বা আধ্যাত্মিক মনোভাব সম্পন্ন। কোন কোন সম্প্রদায় বেদে বিশ্বাস করে আবার কেউ বা বেদে অবিশ্বাসী। কোন কোন সম্প্রদায় আত্মায় বিশ্বাস করে আবার কেউ বা অনাত্মবাদী। অর্থাৎ আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ভারতীয় চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। আর এই বিভিন্ন চিন্তার ধারক এবং বাহক হল ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে, এতে মোট নয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় রয়েছে যা নিম্নরূপ –

১. চার্বাক দর্শন

২. জৈন দর্শন

৩. বুদ্ধ দর্শন

৪. সাংখ্য দর্শন

৫. যোগ দর্শন

৬. ন্যায় দর্শন

৭. মীমাংসা দর্শন

৮. বৈশেষিক দর্শন

৯. বেদান্ত দর্শন

এই নয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় ভারতীয় তথা বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং আজ অবধি তার গতিধারা অব্যাহত রয়েছে। এই নয়টি মূল দর্শন ছাড়াও ভারতীয় দর্শনচিন্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আরও অসংখ্য শাখা প্রশাখায় যা মূলত বিভিন্ন মহামানব ঋষি এবং মনীষীদের

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি। নিগমানন্দ দর্শন শ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব নামক মহামানবেরই অনুপম সৃষ্টি, যে দর্শন সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা এখন নিগমানন্দ দর্শনের সাথে ভারতীয় দর্শনের মূল শাখাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করব।

চার্বাক দর্শন

ভারতীয় দর্শন চিন্তায় চার্বাক মত একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটি একটি বিশুদ্ধ জড়বাদী দর্শন। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে এ দর্শন চিন্তার যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। চার্বাক দর্শন নিছক জড়বাদী বলে –আত্মা, ঈশ্বর, বেদ কোন কিছুতে বিশ্বাস করে না। এই দর্শন মনে করে যে, ইন্দ্রিয় সুখই মানুষের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে চার্বাকদের বিখ্যাত উক্তি প্রচলিত আছে। [যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ] অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে সুখেই বাঁচবে। ঋণ করে হলেও ঘি খাবে। এ দর্শন তারস্বরে ঘোষণা করে যে, স্বর্গ নরক, মোক্ষ, পুনর্জন্ম কোনকিছুরই অস্তিত্ব নেই। এসবই ধূর্ত, ভন্ড, প্রতারক ব্রাহ্মণদের রচনা মাত্র। এ দর্শন মনে করে যে, প্রত্যক্ষই একমাত্র জ্ঞান। অনুমানমূলক জ্ঞান অসিদ্ধ। যেহেতু আত্মা, ঈশ্বর, মোক্ষ, স্বর্গ, নরক কোনকিছুর জ্ঞান প্রত্যক্ষ গত নয়, তাই এসকল কিছুই মিথ্যে। এ দর্শন সকল প্রকার কুসংস্কারের ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে চার্বাক দর্শনের সারমর্ম এটুকুই। অপর দিকে নিগমানন্দ দর্শন সম্পূর্ণরূপে একটি আস্তিক্যবাদী দর্শন। এ দর্শন ঈশ্বর লাভ বা ঈশ্বরের সাথে সাযুয্য লাভকেই জীবনের চরম পাওয়া মনে করে। ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি, স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম কোন কিছুকেই এ দর্শন অস্বীকার করে না। বেদের উপর নিগমানন্দের প্রচুর অনুরাগ ও ভক্তি। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় নিগমানন্দ দর্শন চার্বাক দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। একথা সত্যি যে, নিগমানন্দ দর্শন ও চার্বাক দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্যই অনেক বেশী। তবে সাদৃশ্য যে একেবারেই নেই এমনও বলা যাবে না। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

চার্বাক দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা

চার্বাক দর্শন অন্ধবিশ্বাস, অর্থহীন প্রচলিত রীতি-নীতি ও কুসংস্কারের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। নিগমানন্দের চিন্তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনিও অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অর্থহীন প্রচলিত রীতি-নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি বাণী বিশেষ প্রযোজ্য যা নিচে উল্লেখ করা হলো- "তোমাদের মধ্যে ধর্মের যে সকল মিথ্যা বা অন্ধ সংস্কার আছে তাহা দুর করিয়া সত্য সংস্কারের ব্রতী হও।"[১] চার্বাক দর্শন বিচার করলে দেখা যায় যে, এই দর্শন সাধারণ মানুষকে আত্মনির্ভরতার পথ দেখিয়েছে। নিগমানন্দের জীবন দর্শন ও ধর্মমত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনিও মানুষকে আত্মনির্ভর করতেই সব থেকে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি প্রযোজ্য। " আমি চাই তোমরা সকলে বাঘ হও, অপ্রতিহত বীর্য্যবান হও। আমি চাই তোমরা আমার চাইতে বড় হয়ে ওঠ। আমি চাই তোমরা বাঘের সন্তান বাঘ হয়ে ওঠ। এক নিগমানন্দ স্থলে তোমরা শত শত নিগমানন্দ হয়ে যাও।"[২] ঠাকুরের উপরোক্ত বাণী পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায় তিনি মানুষকে কত বেশী আত্মনির্ভর হতে বলেছেন।

১। পূর্বোক্ত, অভয় বাণী , পৃ.-১৫

২। পূর্বোক্ত ,আমি কি চাই, পৃষ্ঠা নং-২৬

Dhaka University Institutional Repository

জৈন দর্শন

জৈন দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করার আগে জৈন দর্শন কী সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিম্নে জৈন দর্শনের সারাংশ তুলে ধরা হলো। তারপর নিগমানন্দ দর্শনের সাথে এই দর্শনের তুলনামুলক আলোচনা করা হলো।

জৈন দর্শন অত্যন্ত প্রাচীন একটি দর্শন। জিন্ শব্দ থেকে জৈন শব্দের উৎপত্তি। এই জিন শব্দের অর্থ হলো জয়ী অর্থাৎ যারা কাম-ক্রোধ, লোভ, প্রভৃতি রিপুগুলোকে জয় করতে পেরেছেন, তারাই জৈন। আচার্য্য মহাবীরকে জৈন ধর্মের মূল প্রচারক ও প্রবর্তক বলে ধরে নেওয়া হয়। জৈন ধর্ম ও দর্শনের মুল ধর্মগ্রন্থগুলিতে যেসব উপদেশ ও বাণী প্রচলিত আছে সেইসব এই মহাবীরেরই দান।

জৈনগণ নিরীশ্বরবাদী। তাদের মতে সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের ধারণা নিছক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে তারা তীর্থঙ্করগণকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করে তাদের পুজা অর্চনা করেন। জৈন ধর্ম ও দর্শনের চিন্তায় দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। (১) অহিংসা ও পরমত সহিষ্ণুতা। (২) আত্মার বন্ধন ও মুক্তি। এই দুটি দিককে লক্ষ্য করেই মূলতঃ জৈন ধর্ম ও দর্শন পরিচালিত। জৈন দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তৎসঙ্গে তারা জন্মান্তরবাদকেও স্বীকার করে। এই দর্শন শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই মূল্যবান বলে মনে করে, অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অস্বীকার না করলেও তেমন মুল্যবান বলে গ্রহণ করেন না। জৈনরা মনে করেন চৈতন্য হলো জীব বা আত্মার অবিচ্ছেদ্য গুণ। অর্থাৎ এরা আত্মাকে চেতনা সম্পন্ন মনে করে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে জৈনরা জ্ঞান ও জ্ঞানের বস্তুকে ভিন্ন বলে মনে করে। এই দর্শন বেদকে শব্দ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে না। এই দর্শন পুদগলকে জগৎ সৃষ্টির কারণ বলে মনে করে। পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল ভোগ করার জন্য জীব জগতে জন্ম গ্রহণ করে এবং তার দেহ গঠিত হয় কর্মোপযোগী পুদগল পরমাণুর দ্বারা। মোটামুটি এই হল জৈন দর্শনের সারাংশ। নিম্নে জৈন দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শনের তুলনামুলক আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

জৈন দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা

নিগমানন্দ দর্শন ও জৈন দর্শন যদিও দর্শন ইতিহাসের দুটি ভিন্ন দিক তথাপি নৈতিক ও আদর্শিক দিক থেকে উভয় দর্শনের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু মিল পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে উভয় দর্শনের সাদৃশ্যগত দিকসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

সাদৃশ্যগত দিক

প্রথমত : জৈনগণ যদিও নিরীশ্বরবাদী তথাপি সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ঐশ্বরিকগুণে বিভূষিত তীর্থঙ্করগণকে তারা ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত মনে করে এবং তাদের মতে এই তীর্থঙ্করদের পূজা অর্চনা করা উচিত। অপরদিকে শ্রী নিগমানন্দ যদিও পুরোদস্তুর আস্তিক তথাপি তিনি গুরুবাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন "গুরুকৃপা ছাড়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা বেশ কঠিন এবং সদ্ গুরু বলতে তিনি সেই ব্যক্তিকে বুঝতেন যার ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাই লীলায়িত। তিনি এও মনে করেন যে, গুরুই ঈশ্বরের মূর্তরূপ। তিনি বলেন গুরু সেবা বা গুরুতে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।"[৩] মূলত জৈনগণ তীর্থঙ্কর বলতে যাদের বুঝিয়েছেন, নিগমানন্দ দেবও গুরু বলতে সে প্রকৃতির লোকদেরকেই বুঝিয়েছিলেন। এখানে নিগমানন্দ দর্শন ও জৈন দর্শনের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ জৈন শাস্ত্রমতে, জীব বা আত্মা দেহ হতে ভিন্ন। তবে প্রাক্তন কর্ম জনিত কামনা বাসনার জন্য জীব বা আত্মা বিভিন্ন দেহ ধারণ করে এবং যখন যে দেহ ধারণ করে সেই দেহের সমস্ত অংশকেই প্রদীপের মতো আলোকিত বা সচেতন করে। জৈনদের উপরোক্ত উক্তিটির আলোকে বলা

৩। পূর্বোক্ত, অভয় বাণী . পৃষ্ঠা নং-২৫

Dhaka University Institutional Repository

চলে জৈনরা নিঃসন্দেহেই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। নিগমানন্দও অনুরুপ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> মৃত্যুর পর ভোগান্তে জীবের যখন আবার জন্মের সময় হয় তখন সে প্রথমত ধ্রুবলোকে যায়। সেখান হতে শিশির বিন্দুর সঙ্গে মিশে পৃথিবীতে পড়ে এবং কোন গাছ বা ওষধির সঙ্গে মিশে যায়। দেশ কাল পাত্রানুসারে এমনি সুশৃঙ্খলে সে মাটিতে পড়ে যেয়ে যার ঔরসে সে জন্মগ্রহণ করবে সেই পুরুষই তাকে উদরস্থ করতে পারে। পুরুষের খাদ্যের সাথে উদরস্থ হয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমে সে রস, রক্ত, মজ্জা ও অবশেষে শুক্রের মাঝে জীবানুরূপে অবস্থান করে। তারপর যথাসময়ে মাতৃ আধারে জীবরূপে শোনিতের সঙ্গে মিশে যায়। যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে এবং জীবাত্মার গুণ ও কর্ম অনুযায়ী দেহ তৈরী হতে থাকে।[৪]
>
> শ্রী নিগমানন্দের মতে এভাবেই জন্মান্তর ক্রিয়া চলতে থাকে।

তৃতীয়ত : জৈনগণ জীব বা আত্মাকে সমার্থক বলে মনে করেন। তাদের মতে জ্ঞান বা চৈতন্য জীব বা আত্মার স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য গুণ। নিগমানন্দদেব যদিও জীব ও আত্মাকে সমার্থক বলে মনে করেন না তথাপি "চৈতন্য যে আত্মার স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য গুণ"[৫] একথা জৈনদের মতো তিনিও স্বীকার করেন।

চতুর্থত : সর্বজীবে অহিংসা এবং পরমতসহিষ্ণুতা জৈন ধর্ম ও দর্শনের মূল কথা। ঠাকুর নিগমানন্দদেবও বলতেন "অহিংসা পরম ধর্ম। তিনি তার ধর্মমতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হিংসা পরিত্যাগের কথা বলেছেন। সর্বধর্ম সমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম বিস্তারই ছিল নিগমানন্দদেবের উদ্দেশ্য। তার এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি মনে করেন পরমতসহিষ্ণু হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।"[৬]

৪। স্বামী সিদ্ধানন্দ, নিগম প্রসাদ, কলকাতা জনা প্রিন্টিং, ২য় সংস্করণ ১৪০৫, পৃষ্ঠা নং- ১৭

৫। পূর্বোক্ত জ্ঞানীগুরু, সপ্তদশ, পৃষ্ঠা নং- ৬৫

৬। পূর্বোক্ত, আমি কি চাই, পৃষ্ঠা-৭, ২৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত: আত্মা সম্পর্কে মত পোষণ করতে গিয়ে জৈনগন বলেন আত্মা স্বভাবত পূর্ণ। অনন্ত জ্ঞান অসীম শক্তি ও অফুরন্ত আনন্দের অধিকারী এবং চৈতন্য স্বরূপ। নিগমানন্দ দর্শনও আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে প্রায়ই অনুরূপ মত পোষণ করেন। "নিগমানন্দ দেবের মতে আত্মা সৎ-চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ এবং আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন বিধায় আত্মাও ব্রহ্মের মতো পূর্ণ।"[৭]

বৈসাদৃশ্য

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা নিগমানন্দ দর্শনের সাথে জৈন দর্শনের বিভিন্ন সাদৃশ্যগত দিকের আলোচনা করলাম। তবে এই দুই দর্শনের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণও কম নয়। নিম্নে উভয় দর্শনের পার্থক্যগত দিকগুলো আলোচনা করা হলো।

প্রথমত : জৈনগণের মতে জ্ঞান এবং জ্ঞানের বস্তু ভিন্ন। জ্ঞানের বস্তু জ্ঞান বা জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল নয়। জ্ঞান জ্ঞানের বস্তুকে প্রকাশ করে মাত্র। সূর্য যেমন নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে তেমনি জ্ঞানও নিজেকে এবং অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে। জৈন মতে জ্ঞানের বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কিন্তু নিগমানন্দ দর্শনের মতে "জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মূলত অভিন্ন। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মায়ার প্রভাব বশত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে ভিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু স্বরূপত জ্ঞাতাও যা জ্ঞানও তাই।"[৮]

দ্বিতীয়ত : নিগমানন্দ দর্শন বেদকে অপৌরুষেয় এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করে। বেদ যে ঈশ্বরের বাণী একথা নিগমানন্দ দর্শন দ্ব্যর্থ কণ্ঠে স্বীকার করে। কিন্তু জৈন দর্শন বেদকে ঈশ্বরের বাণী বলে স্বীকার তো করেই না বরং বেদকে তারা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে মানতেও নারাজ।

তৃতীয়ত: সাধারণত ধর্ম বলতে পূণ্যকে আর অধর্ম বলতে পাপকে বুঝায়। নিগমানন্দদেবের মতে "ধর্ম তাই যা মানুষকে ঈশ্বরের পথে চালিত করে, অপরপক্ষে অধর্ম হলো যা মানুষকে ঈশ্বর বিমুখ

৭। পূর্বোক্ত, নিগম প্রসাদ , পৃষ্ঠা নং-৩১,৩২

৮। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা নং- ৩

Dhaka University Institutional Repository

করে।"[৯] কিন্তু জৈনগণ ধর্ম ও অধর্মকে সাধারণ অর্থে তো নয়ই বরং নিগমানন্দ দর্শনের মতোও মনে করেন না। ধর্ম ও অধর্ম বলতে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তাদের মতে যে দ্রব্যের জন্য বস্তুর গতি সম্ভব সেই দ্রব্যই ধর্ম। আর যে দ্রব্যের জন্য বস্তুর স্থিতি সম্ভব হয় তাই অধর্ম।

চতুর্থতঃ আত্মার মুক্তি কিভাবে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জৈনরা বলেন, আত্মার মুক্তির জন্য প্রথম কাজ হলো আত্মার পুদগলের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এবং দ্বিতীয়ত কাজ হলো আত্মার পূর্ব সঞ্চিত পুদগলের অপসারণ করা। প্রথম ক্রিয়ার নাম হলো- সংবর এবং দ্বিতীয় ক্রিয়ার নাম হলো নির্জরা বা আত্মার কর্মনাশ। কিন্তু নিগমানন্দ দেবের মতে "আত্মদর্শন বা মুক্তি লাভের দুটি পথ রয়েছে। (১) কঠোর সন্ন্যাসযোগ, (২) ব্রহ্মবিদ গুরুর সেবা। প্রথম রাস্তাটি জ্ঞানের, দ্বিতীয়টি ভক্তির।"[১০]

পঞ্চমতঃ নিগমানন্দ দর্শনের মুল কেন্দ্রবিন্দুই হলো ঈশ্বর। নিগমানন্দ দর্শনের কোন তত্ত্বই ঈশ্বরকে ত্যাগ, উপেক্ষা বা অস্বীকার করে নয়। অপরপক্ষে জৈনগণ নিগমানন্দ দর্শনের মুল কেন্দ্রবিন্দু যিনি (ঈশ্বর) তাঁকেই অস্বীকার করেন। জৈনগণ নিরীশ্বরবাদী। তাঁরা কোনরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

৯। পূর্বোক্ত, **জ্ঞানী গুরু**, পৃষ্ঠা নং- ৩

১০। **পূর্বোক্ত, অভয় বাণী** , পৃষ্ঠা-১৩

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ দর্শন

গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে সে মতবাদই বৌদ্ধ ধর্ম বা বৌদ্ধ দর্শন। মানুষের জীবনের নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের পথ উদঘাটন করা এবং জনগণকে ঐ পথের নির্দেশ প্রদান করাই বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের প্রধান লক্ষ্য। নিম্নে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হবে – তৎপর নিগমানন্দ দর্শনের সাথে বৌদ্ধ দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

(ক) চারটি আর্যসত্য

দুঃখ হতে চিরমুক্তি কিভাবে লাভ করা যায়- এটি ছিল বুদ্ধদেবের প্রধান জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধদেব যে চারটি সত্যের সন্ধান পান সেই সত্যসমূহই একত্রীতভাবে বুদ্ধের চারটি আর্যসত্য নামে খ্যাত। আর্যসত্যসমূহ হলো- (১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখের নিবৃত্তি আছে, (৪) দুঃখ নিবৃত্তির পথও আছে। মূলত বৌদ্ধ দর্শনের সামগ্রিক চিন্তা চেতনা এই চারটি আর্যসত্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

প্রথম আর্যসত্য : অর্থাৎ "দুঃখ আছে" এই প্রেক্ষিতে বুদ্ধদেব বলেন, জন্ম,ব্যাধি, জরা, মরণ, শোক, উৎকণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ সবই দুঃখের বিষয় বস্তু। (সর্বং দুঃখম্) বুদ্ধদেব বলেন, জগত ও জীবন অনিত্য এবং যা অনিত্য তা দুঃখময় । সুখ এখানে ক্ষণস্থায়ী তাই সুখের অবসান সুনিশ্চিত। এবং এই সুখের অবসানও দুঃখের কারণ।

দ্বিতীয় আর্যসত্য : দ্বিতীয় আর্যসত্য হলো দুঃখের কারণ আছে। বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন সংসারে কেবল যে দুঃখ আছে তাই নয় এই দুঃখের কারণও আছে। বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় আর্য সত্যটি কার্যকারণ নিয়ম হতে নিঃসৃত। কার্যকারণ নিয়ম অনুসারে কারণ ছাড়া কার্যের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং দুঃখেরও কারণ আছে। বুদ্ধ দর্শনে দুঃখের কারণকে "দুঃখ সমুদয়" বলা হয়। বুদ্ধদেবের মতে সব দুঃখের কারণ

Dhaka University Institutional Repository

হলো জাতি বা জন্ম। সংসারে মানুষ জন্মগ্রহণ না করলে তাকে কোন দুঃখ ভোগ করতে হতো না। সুতরাং জন্মই সকল দুঃখের কারণ।

তৃতীয় আর্যসত্য: দুঃখের নিবৃত্তি আছে- নিঃসৃত হয় দ্বিতীয় আর্যসত্য- দুঃখের কারণ আছে হতে। বুদ্ধদেব বলেন, দুঃখ যেহেতু শর্তাধীন, সেহেতু শর্ত বা কারণকে অপসারিত করতে পারলেই দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। এই দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থাই হলো নির্বাণ। ইহাই জীবন মুক্তির অবস্থা। বুদ্ধদেবের মতে মানুষের কর্মের উপর তার জন্ম নির্ভর করে। তিনি কর্মকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। (১) সকাম কর্ম (২) নিষ্কাম কর্ম। তিনি আরও বলেন, মানুষের সকাম কর্মই বিষয়ানুরক্তির সৃষ্টি করে ব্যক্তির পুনর্জন্ম ঘটায় কিন্তু নিষ্কাম কর্ম বিষয়ানুরাগ সৃষ্টি করে না তাই নিষ্কাম কর্মের ফলে পুনর্জন্মের কোন সম্ভাবনা নেই।

চতুর্থ আর্যসত্য: বুদ্ধদেবের চতুর্থ আর্যসত্য হলো- 'দুঃখের নিবৃত্তির পথ বা মার্গ আছে"। তিনি মনে করেন এই পথের আটটি অঙ্গ বা স্তর আছে। তাই এই পথকে বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। এই স্তর সমূহকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করার মাধ্যমেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। এই মার্গের আটটি স্তর হলো, (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প (৩) সম্যক বাক, (৪) সম্যক কর্মান্ত, (৫) সম্যক আজীব, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক স্মৃতি, (৮) সম্যক সমাধি।

(খ) বৌদ্ধ দর্শনের নৈতিক উপদেশাবলীর অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব

বুদ্ধদেব দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধানের জন্য কোন সময় আগ্রহী ছিলেন না। নৈতিক উপদেশই ছিল তাঁর শিক্ষার প্রধান লক্ষণ তথাপি তাঁর নৈতিক শিক্ষার মূলে কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। এগুলো প্রধানত ৪টি যথা-(১) প্রতীত্য সমুৎপাদ বা শর্তাধীন সৃষ্টিবাদ (২) কর্মবাদ (৩) সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যবাদ এবং (৪) অনাত্মবাদ। নিম্নে এ মতবাদগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত - প্রতীত্য সমুৎপাদ বা শর্তাধীন সৃষ্টিবাদ : প্রতীত্য সমুৎপাদের সহজ অর্থ হলো যে কোন বস্তু বা ঘটনা পূর্ববর্তী বস্তু বা ঘটনা হতে সমুৎপন্ন। বুদ্ধদেবের মতে এই জগতে কোন বস্তু বা ঘটনা আত্ম নির্ভর নয় এবং বিনা কারণে বা আকস্মিক ভাবে কিছু ঘটে না। জাগতিক সকল বস্তুই এক সর্বব্যাপক ও অবশ্য স্বীকার্য কার্য-কারণ নিয়মের অধীনে। বৌদ্ধ মতে এই কার্য-কারণ নিয়ম জগতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করে চলেছে ঈশ্বর বা কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার দ্বারা এই নিয়ম পরিচালিত হয় না। এই কার্য কারণ নিয়মকে বৌদ্ধ দর্শনে প্রতীত্য সমুৎপাদ বলা হয়।

দ্বিতীয়ত- কর্মবাদ: কর্মবাদ প্রতীত্য সমুৎপাদ বা শর্তাধীন সৃষ্টিবাদের একটি বিশেষ প্রকাশ মাত্র। কর্মবাদ অনুসারে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে এবং যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল ভোগ করবে। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষের বর্তমান অবস্থা তার পূর্ববর্তী কর্মেরই পরিণতি এবং বর্তমান কর্মের পরিণতি হবে তার ভবিষ্যতের অবস্থা। বুদ্ধদেবের মতে কর্ম দুই প্রকার- (১) সকাম কর্ম এবং (২) নিষ্কাম কর্ম। বাসনা যুক্ত কর্ম হলো সকাম কর্ম আর বাসনাহীন মোহমুক্ত কর্ম হলো নিস্কাম কর্ম। বুদ্ধদেব বলেন নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমেই মানুষ শুধুমাত্র নির্বাণ লাভ করতে পারে। সকাম কর্ম মানুষকে জন্ম হতে জন্মান্তরে চক্রের মত ঘুরায়।

তৃতীয়ত- সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যবাদ : বৌদ্ধ দর্শন মতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল। সব কিছুই ধ্বংসশীল এবং সবকিছুই অনিত্য (সর্বং অনিত্যম্)। তিনি আরও বলেন যার আদি আছে তার অন্তও আছে। যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে। যেখানে মিলন আছে, সেখানে বিচ্ছেদও আছে। অক্ষয়, চিরস্থায়ী ও নিত্য বলে কিছুই নাই। আপাত দৃষ্টিতে কোন বস্তুকে চিরস্থায়ী বলে মনে হলেও আসলে তা চিরস্থায়ী নয়, তার বিনাশ হবেই। এটিই বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদ।

চতুর্থত- অনাত্মবাদ: বুদ্ধদেব মানুষের মধ্যে শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে জগতে সব কিছুই যখন অনিত্য তখন চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের মতে মানুষের আত্মা হল তার চেতনার অবিরাম ধারা বা প্রবাহ। মানুষের মধ্যে অনবরত চিন্তা,

Dhaka University Institutional Repository

অনুভূতি, ইচ্ছা যাওয়া আশা করছে। এই সকল মানসিক প্রবাহের ধারা বা প্রবাহই আত্মা। বুদ্ধদেবের মতে এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ক্ষণস্থায়ী এবং এদের অন্তরালে কোন চিরন্তন সত্তা নেই। কিন্তু প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে। উপরোক্ত আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে, বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তবে এও সত্য যে, নিত্য বা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই।

(গ) বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বরের স্থান

বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। তাই বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নেই। বৌদ্ধগণ বলেন প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে, কিন্তু পরিণতি কারণ বলে কিছু নেই। সুতরাং পরিণতি কারণ রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। নৈতিক অগ্রগতির জন্যও ঈশ্বরের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নৈতিকতার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করে। ঈশ্বর যদি সকল কিছুর কারণ হন, তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন এবং তাঁর ইচ্ছায় যদি জগতের সকল কিছুই ঘটে থাকে তবে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। অথচ স্বাধীনতা ছাড়া নৈতিকতার ধারণা অবাস্তব। সুতরাং সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই। তবে পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ধর্ম সমর্থিত মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধদেবকে ভগবানের আসনে উপবিষ্ট করিয়ে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণ করেছেন। মহাযান সম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের পূজার মত বুদ্ধদেবেরও পূজা অর্চনা করতে পারে এবং তাঁর করুণা ও সাহায্য প্রার্থী হতে পারে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এটি কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধদেবের মত নয়।

বৌদ্ধ দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা

বৌদ্ধ দর্শনের উপরোক্ত আলোচনা ও নিগমানন্দ দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয় দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। নিম্নে উভয় দর্শনের সাদৃশ্য সমূহ আলোচনা করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

সাদৃশ্যগত দিক

প্রথমত: বুদ্ধদেবের কর্মবাদ অনুসারে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে এবং যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল ভোগ করবে। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষের বর্তমান অবস্থা তার প্রাক্তন কর্মেরই পরিণতি এবং বর্তমান কর্মের পরিণতি হবে ভবিষ্যতের অবস্থা। বৌদ্ধদেব দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, মানুষের পূর্বজন্ম, বর্তমান জীবন এবং পরজন্ম এ তিনটির মধ্যে যে যোগসূত্র আছে তা হলো তার কৃতকর্ম। নিগমানন্দদেবও তাঁর দর্শনে কর্মফল ও পূনর্জন্ম বিষয়ে একই ধরনের মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তার লিখিত যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা এই রূপ

> ঈশ্বর ক্ষুদ্র-বৃহৎ, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, পন্ডিত-মুর্খ, সুখী-দুঃখী সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া, সমান স্নেহ বিতরণ করিয়া থাকেন। তাহার নিকট আত্ম-পর নাই। তাহার সৃষ্টিতে বৈষম্য নাই, পক্ষপাত নাই। তবে সৃষ্টিরাজ্যে এ বৈষম্যের কারণ কি? কারণ- অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টপূর্ণ অদৃষ্ট কি? অদৃষ্ট আর কিছুই নয়, স্ব-স্ব পূর্বাজন্মার্জিত কর্মফল। 'মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন, 'কর্মদোষেণ দরিদ্রতা' এই কর্মক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণরূপে কর্মের অধীন। গতজন্মে মানুষ যেমন কর্ম করিয়াছে বর্তমান জন্মে সেই কর্মই অদৃষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া ফল প্রদান করিতেছেন। মানুষেরা কর্মদ্বারা সুখভোগ করে; কর্ম দ্বারাই দুঃখ ভোগ করে। কর্মবশেই তাহারা জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম দ্বারা শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্মবশেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়।[১১]

দ্বিতীয়ত: রোগ, জরা এবং মৃত্যুর দৃশ্য দেখে বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন, এই সংসারের সবই দুঃখ ময়। তবে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা অনুভব করলেন- এই দুঃখ আকস্মিক বা দৈবিক ঘটনা নয়। এই দুঃখ কারণ প্রসূত। বুদ্ধদেব বলেন জরা মরণ প্রভৃতি দুঃখের কারণ হলো জাতি বা জন্ম। সংসারে মানুষ জন্মগ্রহণ না করলে তাকে কোন দুঃখ ভোগ করতে হতো না। সুতরাং জন্মই এই সকল

১১। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখের কারণ। আর জন্ম ও তার মধ্যবর্তী যত অবস্থা এসব কিছুরই মূল কারণ হলো অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বলে বুদ্ধদেব মনে করেন। তিনি আরও বলেন– তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবই অবিদ্যা। এই অবিদ্যার কারণে মানুষ অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলে মনে করে, অস্থায়ী সুখকে যথার্থ সুখ বলে মনে করে। মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করে। সুতরাং অবিদ্যাকে দুঃখের মূল কারণ বলা যায়। নিগমানন্দদেবও তার দর্শনে দুঃখের কারণ সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করেন। দুঃখের কারণ ও তার মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

> আত্মা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলে সেই সংযোগবশত দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব উভয় শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সেই কারণেই এই জগত প্রপঞ্চ বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই সংযুক্ত হইবার একমাত্র কারণ অজ্ঞান। জীবের জন্ম-জন্মান্তরের অবিদ্যা সম্ভূত ভ্রম জ্ঞানের সংস্কার আছে। এই সূক্ষ্ম সংস্কার জ্ঞান পরমাণুজাত জগতে গন্ধাদি মনোহর বিষয় নানা রূপে প্রকটিত করে। তাহার সহিত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সংযোগ হওয়ায় সুখ-দুঃখ অনুভব হয়। তাহাতে সুখ তৃষ্ণা জন্মে। সুখ-তৃষ্ণা হইতে চেষ্টা আইসে। মানসিক ও শারীরিক চেষ্টায় কর্মফল উৎপন্ন হয়। কর্মফল হইতে জীবের জন্ম হয়। অতএব জন্মই দুঃখের কারণ। এই দুঃখ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানই ইহার হেতু। 'তদভাবাৎ সংযোগভাবো স্থান; তদ্দৃশের কৈবল্যম।' এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। সাধনা দ্বারা এই সংযোগ নাশ করাই প্রয়োজন, উহাই আত্মার কৈবল্যপদে অবস্থিতি।[১২]

তৃতীয়তঃ মানুষ পূজা- বুদ্ধদেব মানুষকে কত গৌরব ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন ধর্মপদে তাঁর একটি মাত্র শ্লোকেই পরিচয় মিলে–

১২। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

মাসে মাসে সহস্রসেন যো যজেম শতং সমং

একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে,

সা যে ব পূজনা যেয্যো যঞ্চে বস্সসতং হুতং।[১৩]

শত বর্ষ ধরিয়া কেহ যদি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া মাসে মাসে যজ্ঞ করে এবং সেই ব্যক্তি যদি অন্য একজন স্থিতপ্রজ্ঞ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্যক্তিকে মুহূর্তে মাত্রও পূজা করে, তবে শত বর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ। শ্রী নিগমানন্দদেবও বলেছেন "ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা পূজাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র সহজ উপায়। তিনি আরো বলেন, তোদের গুরু সদ্গুরু (ব্রহ্মবিদ্ গুরু), শুধু এই কথাটা বিশ্বাস করে তোরা আমার কাজ করে যা, সহস্র যোগ তপস্যা করিয়াও যে ফল লাভ করা যায় না, আমি তোদের সেই ফলই প্রদান করিব। তাহা দিবার ক্ষমতা আমার না থাকিলে তোদের এই মিথ্যা কথা দ্বারা ভুলাইয়া আমার কাজ হাসিল করিয়া নিতাম না।"[১৪] লোকগুরু বুদ্ধদেব ও সদ্গুরু নিগমানন্দদেব এর সাদৃশ্য এখানেই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি আত্মপ্রত্যয়কারী বুদ্ধ নিগমানন্দই একমাত্র সগৌরবে এই বাণী জগৎ কল্যাণে দান করে উভয়েই নিজেদের স্বরূপের পরিচয় দিয়ে গেছেন। উভয়ে দেখেছিলেন মানুষকে– মানুষের জ্বলন্ত আত্মাকে। ক্রিয়াকান্ডকে উভয়ে বড় করে দেখেন নি। মানুষের ইচ্ছা শক্তির দাম উভয়ে দিয়ে গেছেন।

বৈসাদৃশ্য

বৌদ্ধ দর্শন ও নিগমানন্দ দর্শন পর্যালোচনা করলে উভয়ের মধ্যে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায় তেমনি উভয় দর্শনের মধ্যে অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়।

প্রথমতঃ বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। তাই বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধগণ বলেন, প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে। কিন্তু পরিণতি কারণ বলে কিছু নেই। সুতরাং পরিণতি কারণ রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। বুদ্ধদেব কর্ম নিয়মকে

১৩। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ৬৮

১৪। পূর্বোক্ত, অভয় বাণী, পৃষ্ঠা-৩৪,৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সকলের উপর স্থান দিয়েছেন। কর্ম নিয়মের সাহায্যে জগতে জীবের দুঃখ দুর্দশার ব্যাখ্যা করা যায়, কর্মের ফলে জীবের জন্ম হয়। সুতরাং সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই। অপর দিকে নিগমানন্দ দর্শনের মূল কেন্দ্র বিন্দুই হলো ঈশ্বর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন "এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। দেবতা বল, অসুর বল, ভূত বল, মানুষ বল, বৃক্ষ বল, পর্বত বল, জল, বায়ু, অগ্নি যাহা কিছুই বল– সমস্তই ব্রহ্ম।

একমেবাদ্বিতীয়ঃ সৎগামরূপবিবর্জিতম

সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্যতে॥[১৫]

দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধদেব মানুষের মধ্যে শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে জগতে সব কিছুই যখন অনিত্য তখন চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন মানুষের আত্মা হলো, তার চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ধারা বা প্রবাহ। এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ক্ষণস্থায়ী এবং এদের অন্তরালে কোন চিরন্তন সত্তা নেই, তবে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে। কাজেই বলা যায় বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। কিন্তু নিত্য বা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বকে তিনি পুরোদমে অস্বীকার করেছেন। নিগমানন্দ দর্শন বৌদ্ধদেবের অনাত্মবাদকে স্বীকার করেনি। এ মতে "আত্মা অজড়, অমর, নিত্য ও শাশ্বত। তিনি আরও বলেন– চক্ষু, কর্ণাদি, ইন্দ্রিয় অথবা মন, প্রাণ ও জ্ঞান সমষ্টি ইহারা আত্মা নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্যই আত্মা।"[১৬]

তৃতীয়তঃ বুদ্ধদেবের মতে, এই জগতে কোন বস্তু বা ঘটনা আত্মনির্ভর নয় এবং বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে কিছু ঘটে না। প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার কারণ আছে। জাগতিক সকল বস্তুই এক সর্বব্যাপক ও অবশ্য স্বীকার্য কার্য-কারণ নিয়মের অধীন। ঈশ্বর বা কোন অতীন্দ্রিয় চেতন সত্তার দ্বারা এই নিয়ম পরিচালিত হয় না। এই কার্য কারণ নিয়মকে বৌদ্ধ দর্শনে প্রতীত্য সমুৎপাদ (Theory

---

১৫। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ৩৪
১৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

of dependant origination) বলা হয়। নিগমানন্দ দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের কার্য কারণ তত্ত্বকে অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। তাঁর মতে ঈশ্বর হলো সমস্ত কারণের আদি কারণ এবং সেখান থেকেই সব কিছু উৎসারিত।

চতুর্থত: "বেদ" হিন্দুগণের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, হিন্দুরা এই গ্রন্থকে অপৌরুষেয় বলে মনে করে। কিন্তু বুদ্ধদেব এই বেদের তীব্র নিন্দা করেন এবং এটিকে ভন্ড-প্রতারক ব্রাহ্মণদের রচনা বলে মনে করে অস্বীকার করেন। নিগমানন্দদেব কিন্তু বেদের প্রতি প্রচন্ড আস্থাশীল এবং এটি শ্রেষ্ঠ ও অপৌরুষেয় বলে আখ্যা দেন। তিনি মনে করেন বেদের প্রত্যেকটি রচনা মুনি ঋষিদের দীর্ঘ সাধনার ফসল। তাই তা কখনও মিথ্যে হতে পারে না এবং তিনি নিজেই প্রমাণরূপে এর প্রত্যক্ষ কর্তা।

পঞ্চমত:

> নির্বাণ শব্দটি নি- উপসর্গের সাথে বাণ/বাণ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'বাণ' তৃষ্ণারই নামান্তর। তৃষ্ণা অপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবনকে ভব হতে ভবান্তরে রজুবৎ বন্ধন করায় বলে "বাণ" নামে অভিহিত। "নি" উপসর্গ তৃষ্ণার অভাব বা নিরবশেষ অতিক্রম অর্থ প্রকাশ করছে (দৃ+ অতএব যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে স্বয়ং উপলব্ধি করলে জন্ম জন্মান্তর ধরে কৃত তৃষ্ণা বন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হয় তাই নির্বাণ বলে বুদ্ধদেব মনে করেন।[১৭]

অর্থাৎ- কামনা-বাসনার আত্যন্তিক নিবৃত্তি যেখানে হয় তাই নির্বাণ বলে বৌদ্ধদেব মনে করেন। অপরদিকে নিগমানন্দ দর্শন নির্বাণ শব্দটিকে কিন্তু ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে "পুরুষ যখন নির্গুণ হন, অর্থাৎ যখন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন কোন প্রকার প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত হয় না, আত্মা যখন চৈতন্য মাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, আত্মার যখন বিকার দর্শন হয় না তখন এ রূপে নির্বিকার হওয়াকেই নির্বাণ মুক্তি বলে।"[১৮]

১৭। ড. সুকোমল চৌধুরী, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলকাতা জনা প্রিন্টিং প্রেস, ১ম সংস্করণ পৃষ্ঠ- ১৫৯

১৮। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সাংখ্য দর্শন

পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মহর্ষি কপিলদেব যে দর্শন গড়ে তুলেছেন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তাই সাংখ্য দর্শন নামে খ্যাত। গৌড়পাদ-এর 'সাংখ্যকারিকা ভাষ্য', বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্ব কৌমুদী', বিজ্ঞান ভিক্ষুর 'সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য' এবং সাংখ্যসার অনিরুদ্ধের 'সাংখ্য প্রবচনের সূত্রবৃত্তি' প্রভৃতি সাংখ্য দর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে সাংখ্য দর্শনের বিস্তৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শন মূলত দ্বৈতবাদী দর্শন। এ দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই মূল তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলা হয়ে থাকে যেহেতু এই দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এই দর্শন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বা চরম লক্ষ্য বলে মনে করে। ক্রমান্বয়ে এই দর্শনের মূল তত্ত্ব সমূহ আলোচনা করা হবে। তৎপর নিগমানন্দ দর্শনের সাথে সাংখ্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

প্রথমত- কার্য-কারণবাদ : সাংখ্য দর্শন কার্য কারণ মতবাদে বিশ্বাসী । এই দর্শনের কার্য কারণবাদকে সৎ কার্যবাদ বলা হয়। এই সৎ কার্যবাদই সাংখ্য দর্শনের প্রধান ভিত্তি। সাংখ্য মতে কারণ ব্যতীত কোন কার্য ঘটে না। তবে এই দর্শনে কার্য-কারণের সম্পর্কটি ভিন্ন রকমের। সাংখ্য দর্শন মতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা উপাদান কারণের মধ্যে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে যেমন তিল হতে যখন তেল হয় তখন তেলরুপ কার্যের উপাদান কারণ হয় তিল। সাংখ্য মতে তিলের মধ্যে তেল অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সাংখ্য দার্শনিকগণের মতে সৎ হতেই শুধু সৎ এর উৎপত্তি সম্ভব , অসৎ হতে সৎ এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত- প্রকৃতি : প্রকৃতি সাংখ্য দর্শনের অন্যতম মূল তত্ত্ব। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, জড় জগতের আদি উপাদান কারণ হলো প্রকৃতি। তবে প্রকৃতি অব্যক্ত, শুধুমাত্র অনুমানের সাহায্যেই

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতিকে জানা যায় । প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেন, প্রকৃতি এক, বহু নয়। প্রকৃতি জড়, 'যেহেতু তার চেতনা নেই; প্রকৃতি অসীম, সেহেতু সে সর্বব্যাপী। প্রকৃতি নিত্য, যেহেতু তার ধ্বংস নেই। প্রকৃতি অজ, যেহেতু তার জন্ম নেই। প্রকৃতি স্ব-নির্ভর যেহেতু তার সৃষ্টির জন্য কারও উপর নির্ভর করতে হয় না। প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত। সত্ত্বঃ রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের সমষ্টি এবং সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি।

তৃতীয়ত- পুরুষ বা আত্মা: পুরুষ সাংখ্য দর্শনের দ্বিতীয় মূলতত্ত্ব। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে পুরুষ বলা হয়। এই পুরুষ বা আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। এই পুরুষ ও প্রকৃতির ন্যায়- স্বপ্রকাশ, যেহেতু তাঁকে কেউ প্রকাশ করে নি। তার কোন কারণ নেই। পুরুষ নিত্য ও শাশ্বত যেহেতু তার উৎপত্তিও নেই আবারও বিনাশও নেই। এই পুরুষ অজ, যেহেতু তার জন্ম নেই। পুরুষ জড় নয়- তবে জড়ের প্রকাশক। পুরুষ নির্বিকার যেহেতু তার কোন পরিবর্তন নেই। এই পুরুষ সৃষ্টি নয় আবার স্রষ্টাও নয়। এই পুরুষ জ্ঞাতা এবং ভোক্তা উভয়ই। পুরুষ নির্গুণ এবং সচেতন। পুরুষ ত্রিগুণাতীত বলে তার সুখ, দুঃখ মোহ কিছুই নেই। এই পুরুষ স্বভাবত মুক্ত। অহঙ্কার বশত পুরুষ যখন নিজেকে কর্তা মনে করে তখন দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার অভিন্নত্ব বোধ জন্মে এবং তখনই বন্ধন প্রাপ্ত হয়। আসলে পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত । সাংখ্য দার্শনিকগণের মতে এই পুরুষ বা আত্মা এক নয় বরং বহু। তাঁদের মতে ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বা পুরুষ বিরাজমান।

চতুর্থত - সাংখ্য জ্ঞানতত্ত্ব : সাংখ্যমতে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় কোন পুর্ব জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে পুরুষের নিকৃষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ অবগতিকেই যথার্থ জ্ঞান বলে। সাংখ্যকারগণের মতে এই যথার্থ জ্ঞান তিনটি উপায়ে লাভ করা যা। (ক) প্রত্যক্ষ, (খ) অনুমান (গ) শব্দ। নিম্নে এই তিনটি মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) প্রত্যক্ষ জ্ঞান : সাংখ্য স্বীকৃত প্রমাণগুলোর মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রথম প্রমাণ। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সাক্ষাৎ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়। যেমন আমার সামনে রাখা একটি আম সম্পর্কে আমার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়।

(খ) অনুমানলব্ধ জ্ঞান: সাংখ্য দার্শনিকগনের মতে, কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে সেই প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে, সেই বিষয়ের সঙ্গে নিরত বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ যুক্ত অন্য আর একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকে অনুমান বলা হয়। যেমন দূরে কোন পর্বতে ধুম প্রত্যক্ষ করে যদি ধারণা করা হয় যে, এ পর্বতে আগুন আছে তবে এই জ্ঞানকে অনুমান লব্ধ জ্ঞান বলা যায়।

(গ) শব্দ জ্ঞান : শব্দ জ্ঞানকে সাংখ্যকারগণ আপ্তবাক্যও বলে থাকেন। যেমন বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সাহায্যে জানা যায় না, তাদের শব্দ প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। শব্দ জ্ঞানের যথার্থতা নির্ভর করে তার অর্থ উপলব্ধির উপর। আপ্তবাক্যের অর্থ সঠিক ভাবে বুঝতে না পারলে যথার্থ জ্ঞান সম্ভব নয়। এই শব্দ জ্ঞান দুই প্রকার- (ক) লৌকিক (খ) বৈদিক

পঞ্চমঃত-পুরুষ বা আত্মার বন্ধন ও মুক্তি: পুরুষ বা আত্মা স্বরূপত মুক্ত ও নিত্য। এটি দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় হতে ভিন্ন। কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানের প্রভাবে পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে এক বলে মনে করে। ফলে সুখ, দুঃখ যা মনেরই বৃত্তি যেগুলোকে পুরুষ নিজের বলে মনে করে। পুরুষ বা আত্মার এই অবস্থার নামই বন্ধন (Bondage), আত্মা যে অনাত্মা বা দেহ প্রভৃতি হতে পৃথক এটি বুঝতে না পারাকে সাংখ্য দর্শনে অবিবেক বলা হয়। এই অবিবেকই আত্মা বা পুরুষের বন্ধন তথা দুঃখ কষ্টের কারণ। সাংখ্যকারগণের মতে, দুঃখ ত্রিবিধ (১) আধ্যাত্মিক (২) আধিভৌতিক (৩) আধি দৈবিক এবং এই ত্রিবিধ দূঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পুরুষের মোক্ষ বা মুক্তি। আর এই মোক্ষ বা মুক্তি লাভই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বলে সাংখ্য দার্শনিকগণ মনে করেন।

ষষ্ঠত - ঈশ্বর প্রসঙ্গ : ঈশ্বর সম্পর্কে সাংখ্য দর্শনের ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন ভাষ্যকার সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলেছেন। আবার কোন কোন

Dhaka University Institutional Repository

ভাষ্যকারের মতে সাংখ্য দর্শন ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের মত ঈশ্বরবাদী দর্শন। প্রাচীন সাংখ্য দার্শনিকগণ সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে প্রাচীন সাংখ্য দার্শনিকেরা এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, ঈশ্বর বলে কেউ নেই। প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। তবে বিজ্ঞান ভিক্ষু ও সাংখ্য দর্শনের কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাতা সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলেন না। তাঁদের মতে সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরবাদী। তবে আমাদের এই কথা মনে রাখা উচিত যে, বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতবাদ খুব বেশি লোকের স্বীকৃতি লাভ করে নি। প্রায় সকলেই সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলে মনে করেন। অতএব আমরাও সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলবো।

সাংখ্য দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা

কপিলের সাংখ্য দর্শনের মতাবলির সঙ্গে নিগমানন্দ দর্শনের মতাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উভয় দর্শনের মতবাদসমূহের মধ্যে অনেকাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমান। আমরা প্রথমে উভয় দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্যসমূহ দেখতে চেষ্টা করব। তারপর বৈসাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করব।

সাদৃশ্য

প্রথমত: সাংখ্য দার্শনিকগণের মতে পুরুষ নির্বিকার, কিন্তু প্রকৃতির বিকার আছে কারণ তাদের মতে প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল। যেহেতু প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল তাই বলা যায় প্রকৃতি বিকারযুক্ত। নিগমানন্দ দর্শনও প্রকৃতি সম্পর্কে সাংখ্যগণের এই মতই সমর্থন করেন, নিগমানন্দদেব এই প্রসঙ্গে বলেন- "দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখ-দুঃখ, মোহ প্রভৃতি গুণ সমূদয় প্রকৃতি হতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।"[১৯]

১৯। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত: পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ সাংখ্যকারগণ নিম্নোক্ত ভাবে প্রকাশ করেছেন। পুরুষ, নিত্য বা শাশ্বত, প্রকৃতিও নিত্য বা শাশ্বত। পুরুষ সর্বব্যাপী ও স্বানর্ভর, প্রকৃতিও তাই। পুরুষ যেমন অজ, প্রকৃতিও তেমনি অজ। পুরুষ নির্বিকার কিন্তু প্রকৃতির বিকার আছে। প্রকৃতি স্রষ্টা, কিন্তু পুরুষ সৃষ্টিও নয়- স্রষ্টাও নয়। প্রকৃতি দৃশ্য, আর পুরুষ দ্রষ্টা। প্রকৃতি জ্ঞেয় কিন্তু পুরুষ জ্ঞাতা। প্রকৃতি ভোগ্যা কিন্তু পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। প্রকৃতি অচেতন কিন্তু পুরুষ সচেতন।

পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিগমানন্দ দর্শনও প্রায় অনুরূপ মত ঘোষণা করেছেন, যেমন "প্রকৃতি জড়, আর পুরুষ চৈতন্য, প্রকৃতি পরিণামিনী, পুরুষ নির্বিকার, প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ। প্রকৃতি দৃশ্য , পুরুষ দ্রষ্টা। প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি বিষয় পুরুষ বিষয়ী।"[২০]

বৈসাদৃশ্য

সাংখ্যকারগণের মত নিগমানন্দদেবও জগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি তত্ত্বকেই স্বীকার করেছেন। তথাপি উভয় দর্শনের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে পার্থক্যসমূহ দেখানো হলো–

প্রথমত : সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী দর্শন– একে পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুই মূল তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং সাংখ্য দর্শন একদিকে যেমন অদ্বৈতবেদান্তের বিরোধী অপরদিকে ন্যায় বৈশেষিকের বহুত্ববাদেরও বিরোধী। কিন্তু নিগমানন্দ দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই দর্শনে ভাবের দিক থেকে দ্বৈতবাদী হলেও মূলগত ভাবে কিন্তু খাটি অদ্বৈতবাদী। এ প্রসঙ্গে নিম্নের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য- "পরমাত্ম স্বরূপ ভগবান সৃষ্টি কার্যের জন্য যোগাবলম্বন করিয়া আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এ ভাগদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণ অর্ধাঙ্গ পুরুষ ও বামার্ধাঙ্গ প্রকৃতি।"[২১]

২০। পূর্বোক্ত, **জ্ঞানী গুরু**, পৃষ্ঠা, ১৪৬
২১। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈত বেদান্তের মতবাদও সাংখ্য দার্শনিকগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ অদ্বৈত বেদান্তের আত্মা বা পুরুষকে চৈতন্য স্বরূপ আবার আনন্দ স্বরূপও বলা হয়েছে। সাংখ্যকারেরা বলেন, আনন্দ ও চেতনা ভিন্ন জিনিস কাজেই তারা একই সত্তার স্বরূপ হতে পারে না। নিগমানন্দ দর্শনে কিন্তু "পুরুষ অনাদি ও অনন্ত। তাহার স্বভাব স্বভাবতই আনন্দঘন"।[২২]

তৃতীয়তঃ মোক্ষ বা মুক্তি সম্পর্কে সাংখ্য দার্শনিকগণ বুদ্ধদেবের মত মতামত পোষণ করেন। সাংখ্যদের মতে মুক্তি হলো দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সুখ বা আনন্দের অনুভূতির অবস্থা নয়। কারণ সুখ এবং দুঃখ আপেক্ষিক শব্দ। কাজেই যেখানে দুঃখ নেই সেখানে সুখ থাকতে পারে না। কিন্তু নিগমানন্দদেব মোক্ষাবস্থাকে "পরম আনন্দের অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।"[২৩] যেমন অদ্বৈত বেদান্তমতে মুক্তি এক আনন্দঘন অবস্থা।

চতুর্থতঃ সাংখ্যকারগণের মতে প্রকৃতি জ্ঞেয় আর পুরুষ জ্ঞাতা। প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। প্রকৃতি অচেতন কিন্তু পুরুষ সচেতন অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি স্বতন্ত্র সত্তা। কিন্তু নিগমানন্দ দর্শনের মতে, "পুরুষ প্রকৃতি কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই উভয়াত্মকই অদ্বৈত ব্রহ্ম। প্রকৃতি পুরুষ ভাব অজ্ঞান দ্বৈতবাদীগণের পক্ষে, অদ্বৈত যোগী পুরুষের পক্ষে নহে। শক্তিমান হতে শক্তি যেমন পৃথক নহে, তদ্রুপ পুরুষ হইতে প্রকৃতির পৃথক সত্তা নাই।"[২৪]

পঞ্চমতঃ সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বিরাজ করে। সুতরাং সাংখ্য মতে আত্মা বা পুরুষ এক নয়, বহু। কিন্তু নিগমানন্দ দর্শন সাংখ্যের এই মতকে অস্বীকার করে বলেন যে, "সকল জীবদেহে একই আত্মা বা পুরুষ বিরাজ করে। কাজেই আত্মা বা পুরষ কখনও বহু হতে পারে না।[২৫]

২২। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ১৪৮
২৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯১
২৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪৭
২৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭১

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠত : প্রায় অধিকাংশ সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। অধিকন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে সাংখ্য দর্শনে ব্যাপক আলোচনা আছে । তাই প্রায় সকলেই সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলে মনে করেন। কিন্তু নিগমানন্দ দর্শনের মূল কেন্দ বিন্দুই হলো ঈশ্বর। ঈশ্বর ছাড়া এই দর্শনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। তাই বলা যায় সাংখ্য দর্শন হলো নিরীশ্বরবাদী। নিগমানন্দ দর্শন হলো পুরোমাত্রায় ঈশ্বরবাদী।

যোগ দর্শন

মহর্ষি পতঞ্জলী "যোগ দর্শনের" প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। পতঞ্জলীর নামানুসারে "যোগদর্শন" কে পাতঞ্জল দর্শনও বলা হয়। সাংখ্য ও যোগ সমপর্যায়ের দর্শন। তাই এই দুই দর্শনকে এক সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ প্রভৃতি সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে এবং প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণত্রয়কে যোগ দর্শনও মেনে নিয়েছেন। তবে যোগ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও স্বীকার করা হয়েছে। এসব কারণে যোগ দর্শনকে "ঈশ্বরবাদ সাংখ্য" বলা হয়। যোগ দর্শনের আদি গ্রন্থ হলো, যোগসূত্র বা পাতঞ্জল সূত্র। বেদব্যাস রচিত যোগভাষ্য যোগসূত্রের একটি মুলবান ভাষ্য। দুঃখ কষ্ট জর্জরিত জগৎ জীবন হতে মুক্তি লাভই যোগ দর্শনের মূল লক্ষ্য। মুক্তি লাভের পথে যোগ দর্শনের নিদিষ্ট প্রক্রিয়া খুবই সহায়ক। মনে যদি স্থিরতা ও শুচিতা না থাকে তবে তত্ত্ব জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়, এবং যোগ দর্শনের নির্দিষ্ট সাধনাই আত্মশুদ্ধির প্রশস্ত পথ। পতঞ্জলির মতে, তাই যোগাভ্যাসের গুরুত্ব কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। নিম্নে যোগ দর্শনের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো যাতে নিগমানন্দ দর্শনের সাথে, এ দর্শনের তুলনা করা সহজ হয়।

যোগদর্শনে আত্মা: যোগ দর্শন মতে আত্মা স্বরূপত মুক্ত। জীব হলো স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট আত্মা। এই আত্মা একটি চেতনশীল, অপরিবর্তনীয় বিকারহীন সত্তা । এই আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

তাই তাঁর যেমন বন্ধন নেই তেমনি কোন মুক্তিও নেই। কিন্তু অবিদ্যার কারণে আত্মার বন্ধন এবং তা হতে মুক্তির প্রশ্ন দেখা দেয়। বুদ্ধির ধর্ম যখন আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়, তখন আত্মা ভ্রমবশতঃ বুদ্ধির ধর্মকে নিজের বলে মনে করে এবং নিজেকে ভোক্তা বা কর্তা বলে মনে করে এমন কী নিজেকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন বলেও মনে করে। এটিই আত্মার বন্ধন বা বন্ধাবস্থা। যোগদর্শন মতে আত্মা ও পুরুষ অভিন্ন।

যোগদর্শনে চিত্ত বা মন

সাংখ্যের বুদ্ধি, অহংকার, ও মন এই তিন তত্ত্বের সমষ্টিকে যোগদর্শনে চিত্ত বা মন নামে অভিহিত করা হয়। আত্মা স্বরূপত সম্পর্কযুক্ত নয়। তবে অবিদ্যাবশত আত্মা নিজেকে চিত্ত বলে মনে করে। চিত্ত স্বরূপত অচেতন তবে আত্মার চৈতন্য চিত্তে প্রতিম্বিত হয় বলে তাকে চেতন বলে মনে হয়। চিত্তের সঙ্গে যখন কোন বিষয়ের সংযোগ ঘটে, তখন চিত্ত বিষয়াকার ধারণ করে। চিত্তের বিষয়াকার ধারণের নাম বৃত্তি। চিত্তের এই বৃত্তিকে সাধারণত জ্ঞান বলা হয়। যোগ দর্শনের মতে এই চিত্তের যেমন বিকার আছে তেমনি পরিবর্তনও আছে।

যোগ দর্শন মতে প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞান

যোগ দর্শন মতে প্রমাণ তিন প্রকার। যেমন (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) শব্দ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তাকে যোগ দর্শনে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়। যেমন চোখের দ্বারা ঘাসের সবুজ রংকে প্রত্যক্ষ করা। উপস্থিত কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে ব্যাপ্তি জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদৃশ্য কোন বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান হয় তাকে অনুমান বলে, যেমন ধোঁয়া দেখে আগুন অনুমান করা অর্থাৎ জ্ঞেয় থেকে অদৃশ্য অজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। আপ্ত বা বিশ্বাসযোগ্য কোন পুরুষের বাক্য শ্রবণ করে যে জ্ঞান হয় তাকে শব্দ জ্ঞান বলা হয। তাছাড়াও যোগ দর্শনে আরও চার প্রকার জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যেমন (১) বিপর্যয় বা ভ্রান্ত জ্ঞান (২) বিকল্প (৩) নিদ্রা (৪) স্মৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দর্শনের ত্রিতাপ বা তাপত্রয়

ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের মত যোগ দর্শন মনে করে যে জগৎ দুঃখময়। যোগ দার্শনিকগণের মতে দুঃখ তিন প্রকার। যথা (১) পরিণাম দুঃখ (২) তাপ দুঃখ (৩) সংস্কার দুঃখ। সাধারণ লোকের ধারণা জগতে দুঃখ যেমন আছে তেমনি সুখও আছে। কিন্তু যোগ দার্শনিকগণ বলেন, সকল সময় সুখপ্রদ এমন কোন বস্তু বা বিষয় জগতে নেই। কারণ জগৎ পরিবর্তনশীল। তাই কোন বস্তু আপাতত সুখ প্রমাণ করলেও পরিণামে তা দুঃখ প্রদান করবে। তদুপরি সুখ ভোগের দ্বারা সুখ ভোগের তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। বরঞ্চ তা বৃদ্ধি পায়। আসলে জগৎ আত্যন্তিক ভাবেই দুঃখ ময় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ।

যোগের লক্ষণ ও প্রকারভেদ

যোগদর্শন মতে চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ (যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধ) যোগ দর্শনে যোগ শব্দকে সংযোগ অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই, সমাধি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পুরুষ বা আত্মা ভ্রমবশতঃ নিজেকে মন বুদ্ধি ও অহংকারের সাথে অভিন্ন মনে করে। পুরুষ বা আত্মার এই ভ্রান্ত জ্ঞান বিনাশ করে তার মধ্যে বিবেক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করাই যোগের উদ্দেশ্য। যোগ দর্শন মতে এই উদ্দেশ্য শুধু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে চিত্ত বৃত্তি নিরোধের মাধ্যমে।

সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ জ্ঞানের প্রাধান্য ও ক্রিয়া অনুসারে যোগ দর্শনে চিত্তের স্তরভেদ করা হয়েছে। চিত্তের এই স্তরকে ভূমি বলা হয়। যোগ দর্শন মতে চিত্ত ভূমি পাঁচ প্রকারের যথা- (১) ক্ষিপ্ত (২) মূঢ় (৩)বিক্ষিপ্ত (৪) একাগ্র (৫) নিরুদ্ধ। যোগ দর্শন মতে চিত্তের ক্ষিপ্ত মূঢ় এবং বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থা যোগ সাধনার উপযোগী নয়। কেবল একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায় যোগ সাধনা সম্ভব এবং এই দুই অবস্থা মোক্ষ লাভের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

Dhaka University Institutional Repository

যোগের অষ্ট অঙ্গ

সাংখ্য ও যোগ দর্শনমতে আত্মার উপলব্ধিই মুক্তির কারণ কিন্তু আত্মোপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন শুদ্ধ, স্থির ও শান্ত চিত্তের। চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করার জন্য যোগ দর্শনে অষ্টাধিক অনুশীলনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যথা- (১) যম, (২) নিয়ম (৩) আসন (৪) প্রাণয়াম (৫) প্রত্যাহার (৬) ধারণা (৭) ধ্যান (৮) সমাধি। এই অনুশীলনসমূহকে যোগাঙ্গও বলা হয়। এই অষ্টাধিক যোগাঙ্গ আত্মকামনা তথা মুক্তি লাভের সহায়ক। তাই যোগ দার্শনিকগণ এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

যোগ দর্শনে ঈশ্বরের স্থান

যোগ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই জন্য যোগ দর্শনকে ঈশ্বর বলা হয়। পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন বটে। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি কোন তাত্ত্বিক আলোচনা করেন নি। তাঁর ঈশ্বর ব্যবহারিক অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। পতঞ্জলি বলেন, ঈশ্বর যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভের সহায়ক। ঈশ্বরের চিন্তা ও উপাসনার দ্বারা যোগী অচিরেই সমাধি তথা মুক্তি লাভে সক্ষম হন।

যোগ দর্শনমতে ঈশ্বর পরম পুরুষ। তিনি অন্যান্য সাধারণ পুরুষ হতে ভিন্ন। সাধারণ পুরুষ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ-দ্বেষ ও অভিনিবেশ- এই পঞ্চ ক্লেশ, কর্ম বিপাক অর্থাৎ কর্মফল ও বিষয় কামনা দ্বারা প্রপীড়িত। কিন্তু ঈশ্বর এ সকলের উর্ধ্বে। ঈশ্বরের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলেন, অবিদ্যা, অস্মিতা, প্রভৃতি পঞ্চ ক্লেশ কর্ম বিপাক ও আশা হতে যে পুরুষ মুক্ত তিনিই ঈশ্বর।

যোগ দার্শনিকগণ আরও বলেন, ঈশ্বর সর্বদোষমুক্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং বিভূতি অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজিত। তিনি নিত্য, ঐশ্বর্যশালী, পূর্ণ,অনাদি ও অনন্ত। তার ইচ্ছায় জগৎ চলে, তিনিই জগতের শাসক। যোগ দর্শনমতে ঈশ্বর পরম গুরু। এমন কি তিনি মুক্ত পুরুষদেরও গুরু।

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দর্শনে কৈবল্যের স্বরূপ

যোগ দর্শনমতে পুরুষ বা আত্মার স্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য বা মুক্তি। পুরুষ স্বভাবতঃ নিত্যযুক্ত । তাই সত্যিকার অর্থে তাঁর বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। কিন্তু অবিদ্যার কারণে পুরুষের বন্ধন এবং তা হতে মুক্তির প্রশ্ন দেখা দেয়। যোগ দর্শনে বর্ণিত ত্রিতাপও (পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ) অবিদ্যার জন্য। এই অবিদ্যার জন্যই দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্য প্রকৃতির সংযোগ ঘটে এবং এই সংযোগের ফলে দুঃখের উদ্ভব হয়। যে অবিদ্যা বন্ধন এবং দুঃখের কারণ সেই অবিদ্যাকে দুরীভুত করতে না পারলে পুরুষ বা আত্মার মুক্তি তথা দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হলো অবিদ্যাকে দুরীভূত করা যায় কেমন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে যোগাচায্যগণ বলেন, যোগ সাধনার দ্বারা যোগীর চিত্তের মলিনতা বা অশুদ্ধতা দূর হলে যোগীর বিবেক খ্যাতি জন্মে। বিবেক খ্যাতি লাভ করতে পারলে যোগী আত্মার প্রকৃত স্বরুপ উপলব্ধি করতে পারে। তখন বুদ্ধির ধর্ম আর পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় না এবং পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে। পুরুষের এই অবস্থাই কৈবল্য বা যুক্তি । অদ্বৈত বেদান্তের মতে যোগ দর্শনে কৈবল্য বা মুক্তিকে আনন্দময় অবস্থা মনে করা হয় না, তাদের মতে মুক্তি হলো দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির অবস্থা।

যোগ দর্শনের সঙ্গে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা যোগ দর্শন সম্পর্কে মোটামুটি কিছু ধারণা পেয়েছি। মূলতঃ নিগমানন্দের দর্শন ও ধর্ম মতে এই যোগের প্রাধান্য খুবই প্রবল। নিগমানন্দদেব বিশ্বাস করতেন যে, যোগ পথে চিত্ত বৃত্তির নিরোধ করে মানুষ, ঈশ্বর লাভ ও মুক্তি- দুটিই লাভ করতে পারেন। তার দর্শন চিন্তায় যোগের প্রাধান্য যে কত প্রবল তা তাঁর লিখিত যোগী গুরু নামক গ্রন্থ পাঠ করলে সহজেই বুঝা যায়। তাই বলা যায়– যোগ দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শনের সাদৃশ্য প্রচুর– তবে কিছু যে বৈসাদৃশ্য নেই তাও নয়। নিম্নে– উভয় দর্শনের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যর আলোচনা করা হলো –

Dhaka University Institutional Repository

সাদৃশ্য

উভয় দর্শনের সাদৃশ্যমূলক দিকসমূহ নিম্নরূপ-

প্রথমত: যোগ দর্শন মতে চিত্ত বৃত্তি নিরোধই যোগ, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মা বা পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করতে পারে না। নিগমানন্দ দর্শনও যোগ সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করে। এ প্রসঙ্গে নিগমানন্দদেব তার লিখিত যোগী গুরু গ্রন্থে বলেন "চিত্তমল বিদুরিত করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করার নাম যোগ। যম নিয়মাদি সাধনে হিংসা কাম লোভাদি পাপমল বিদুরিত ও কামনা বাসনা বিজড়িত চিত্তবৃত্তি প্রবাহ নিরুদ্ধ করিতে পারিলে হৃদয়স্থ চৈতন্য পুরুষের সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকে।"[২৬]

দ্বিতীয়ত : যোগ দর্শন মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা নিজেও ক্লেশ বা দুঃখ এবং অন্যান্য ক্লেশ বা দুঃখের কারণ। নিগমানন্দ দর্শনও অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকে দুঃখের কারণ বলে মনে করেন এবং অজ্ঞানের নিবৃত্তি হলেই দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় এই অভিমত প্রকাশ করেন।

তৃতীয়ত: চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করার জন্য যোগ দর্শনে অষ্টবিধ অনুশীলনের উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে যথা- (১) যম (২) নিয়ম (৩) আসন (৪) প্রাণায়াম (৫) প্রত্যাহার (৬) ধারণা (৭) ধ্যান (৮) সমাধি। এই অনুশীলনগুলিকে যোগাঙ্গও বলা হয়। এই অষ্টবিধ আত্মজ্ঞান তথা মুক্তি লাভের সহায়ক বলে যোগদার্শনিকগণ মনে করেন। নিগমানন্দ দর্শনে "নিগমানন্দদেবও হুবহু যোগদার্শনিকগণের ন্যায় যোগের উক্ত আটটি অঙ্গের কথা স্বীকার করেন এবং তিনিও মনে করেন স্বরূপ জ্ঞান লাভ করতে হলে এই অষ্টযোগাঙ্গের সাধনা অবশ্যই করতে হবে।"[২৭]

চতুর্থত: যোগ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, এজন্য যোগদর্শনকে ঈশ্বর সাংখ্য বলা হয়। যোগ দর্শন মতে ঈশ্বর পরম পুরুষ, তিনি অন্যান্য সাধারণ পুরুষ হতে ভিন্ন। যোগ দার্শনিকগণ

২৬। স্বামী নিগমানন্দ, যোগী গুরু,১৩৭৫, কলকাতা শশধর প্রিন্টিং, চতুর্দশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা নং-২৭
২৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

আরও বলেন, ঈশ্বর সর্বদোষমুক্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং বিভূ, তিনি নিত্য, ঐশ্বর্যশালী পূর্ণ, অনাদি ও অনন্ত। তাঁর ইচ্ছায় জগৎ চলে, তিনি জগতের শাসক, তিনি পরমেশ্বর। নিগমানন্দ দর্শনেরও কেন্দ্রবিন্দু হল ঈশ্বর। শ্রীনিগমানন্দদেবও তাঁর বিভিন্ন লেখনিতে ঈশ্বর সম্পর্কে যোগ দার্শনিকগণের অনুরূপ মতবাদ পোষণ করেন।

বৈষাদৃশ্য: যোগদর্শন ও নিগমানন্দ দর্শন পর্যালোচনা করলে উভয়ের মধ্যে শুধু যে, সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাই নয়; বরং উভয় দর্শনের মধ্যে কিছু বৈষাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বৈষাদৃশ্যসমুহ বর্ণনা করা হল।

প্রথমত: যোগ দর্শন মতে কৈবল্য বা মুক্তি হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে যোগ দার্শনিকগণের মনোভাব নেতিবাচক অপর দিকে নিগমানন্দদেব মুক্তি বা কৈবল্যের অবস্থাকে অদ্বৈত বেদান্তের মত আনন্দময় অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কৈবল্য সম্পর্কে নিগমানন্দ দর্শনের মনোভাব ইতিবাচক।

দ্বিতীয়ত: যোগদর্শন যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে তবুও এ দর্শনে ঈশ্বর ব্যবহারিক, অভ্যন্তরীণ নয়। ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য যোগদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।কিন্তু নিগমানন্দ দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল ঈশ্বর। আর এ ঈশ্বর শুধু ব্যবহারিক নয় বরং একান্তভাবে অভ্যন্তরীণ।

তৃতীয়ত: যোগদর্শনে, ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের মত জগতকে দুঃখময় বলা হয়েছে। এ দর্শন অনুযায়ী জগতে সুখের লেশমাত্র নেই। যেটিকে আপাত সুখের বলে মনে হয়– তা আসলে দুঃখেরই নামান্তর। নিগমানন্দ দর্শনও জগতকে দুঃখময় বলেছেন, কিন্তু তাঁর এই উক্তি নিম্নতর সত্য। কিন্তু মূলগত সত্য হল জগতে সবকিছু মধুময়। কারণ জগতের যা কিছু তার সবই যদি ব্রহ্মের সৃষ্টি হয়, আর ব্রহ্ম যদি আনন্দময় সত্তা হয়ে থাকেন তাহলে বস্তুগত অর্থে জগতে কোন দুঃখ থাকতে পারেনা।

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় দর্শন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ন্যায় দর্শন অতি উন্নত একটি দর্শন সম্প্রদায়। মহর্ষি গৌতম হলেন এই দর্শন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কোন্ কোন্ নিয়ম অনুসরণ করলে আমাদের চিন্তা বা তর্ক ফলপ্রদ হয় এবং কী কী উপায় অবলম্বন করলে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা যায়, এই সকল নির্দেশ দেয় বলে ন্যায় দর্শনকে তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়বিদ্যা বলা হয়। ন্যায়দর্শন মূখ্যত প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করে বলে একে প্রমাণ শাস্ত্রও বলা হয়। প্রদীপ যেমন সকল বস্তুকে আলোকিত করে তেমনি ন্যায় দর্শনও সকল শাস্ত্রকে নির্ভুলভাবে প্রতিভাত হতে সাহায্য করে। এ কারণে ন্যায় দর্শনকে সর্ববিদ্যার প্রদীপ বলে অভিহিত করা হয়।

ন্যায়দর্শন বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ সাধন সত্তায় বিশ্বাসী, তাই একে বস্তুবাদী দর্শন বলা হয়। এই দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে তাই একে আস্তিক দর্শনও বলা হয়। ন্যায় দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করলেও এর মতবাদ স্বাধীনচিন্তা ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ন্যায় দর্শনে যুক্তিতত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা প্রাধান্য লাভ করলেও এই আলোচনা ন্যায় দর্শনের চরম উদ্দেশ্য নয়। ন্যায় দর্শনের চরম উদ্দেশ্য হল মোক্ষ বা মুক্তি। সুতরাং ন্যায় দর্শন কেবল তর্কশাস্ত্র বা প্রমাণ শাস্ত্র নয়, এ যোগ শাস্ত্রও বটে। আলোচনার সুবিধার্থে সমস্ত ন্যায়দর্শনকে চার ভাগে ভাগ করা যায় যথা – (১) জ্ঞানতত্ত্ব (২) জগৎ তত্ত্ব (৩) জীবাত্মার স্বরূপ বা মুক্তি তত্ত্ব (৪) ঈশ্বর তত্ত্ব। নিম্নে এই চারভাগের উপর নির্ভর করে ন্যায় দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

প্রথমত - জ্ঞানতত্ত্বঃ ন্যায়দর্শনে বুদ্ধিতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈয়ায়িকগণের মতে প্রমাণ বা জ্ঞান চার প্রকার (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) উপমান ও শব্দ। ন্যায় মতে জ্ঞান হল বিষয়ের প্রকাশ। প্রদীপ যেমন ঘট পট প্রভৃতি তার সামনের যাবতীয় বস্তুকে আলোকিত করে তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের জ্ঞান ও তার সামনের যাবতীয় বিষয়কে আমাদের কাছে প্রকাশিত করে। ন্যায় মতে জ্ঞান প্রধানত দুই প্রকার (১) প্রমা (যথার্থ জ্ঞান) (২) অপ্রমা (অযথার্থ জ্ঞান)। প্রমাকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। অপ্রমাণও চার প্রকার যথা– স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম বা বিপর্যয় ও তর্ক। কোন বস্তু বা বিষয়ের অসন্দিগ্ধ ও যথার্থ অনুভবকে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলে। যেমন আমার সন্মুখস্থ টেবিলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষানুভূতি প্রমা, কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে আসলে যে গুণ নাই, সেই গুণকে যদি আমি তাতে বর্তমান বলে জানি তবে আমার জ্ঞানকে অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান বলা হবে । যেমন কোন একটি রজ্জুর মধ্যে যদি আমি সর্পের গুণ অনুভব করি, তবে আমার জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান।

দ্বিতীয়ত জগততত্ত্বঃ নৈয়ায়িকগণের মতে জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা আছে । এগুলি নিছক মনের ধারণা নয়। অর্থাৎ জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব কেবল জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন, জ্ঞানের বিষয় বারটি যথা– আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি,যশ,পুর্ণজন্ম,ফল,দুঃখ এবং মুক্তি। দ্রব্য, গুণ, কার্য, সামান্য, বিশেষ,সমবায়, ও অভাব এই পর্যন্ত পদার্থের অস্তিত্ব ও নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন। এবং তাঁদের মতে এই সকল পদার্থও প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয়ের অর্ন্তগত। নৈয়ায়িকগণের মতে, সব প্রমেয় জড় জগতের অংশ নয়। যেমন– আত্মা, বুদ্ধি, ও মন ভৌতিক নয় বলে জড় জগতের অংশ নয়। আকাশ, দেশ ও কাল নিত্য ও অসীম দ্রব্য । দেশ ও কাল ভৌতিক দ্রব্য নয়, তবে ভৌতিক দ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, আকাশ ভৌতিক পদার্থ তবে কোন বস্তুকে উৎপন্ন করেনা।

নৈয়ায়িকগণের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এ চারটি মহাভূতের দ্বারা জগৎ গঠিত। এবং এই চারটি মহাভূতের । উপাদান কারণ হল– চার প্রকারের পরমাণু। এই পরমাণুগুলো নিত্য অপরিবর্তনীয় এবং অপরিহার্য। সব যৌগিক বস্তুই পরমাণু দ্বারা গঠিত। নৈয়ায়িকেরা সরল বস্তুবাদী

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক, তবে তারা দ্বৈতবাদী। যেহেতু তারা জড়জগৎ ও আত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

তৃতীয়ত - জীবাত্মার স্বরূপ ও তার মুক্তিতত্ত্ব : আত্মা বলতে দুই রকমের আত্মাকে বুঝায়, যথা– (১) জীবাত্মা (২) পরমাত্মা। ন্যায় বৈশেষিক মতে জীবাত্মা একটি অভৌতিক দ্রব্য। এটি নিত্য ও সর্বব্যাপী। দেশ ও কাল আত্মাকে সীমিত করতে পারেনা । নৈয়ায়িকদের মতে এক একটি দেহে এক একটি আত্মা বিদ্যমান এবং চৈতন্য আত্মার একটি আগন্তুক গুণ। আত্মা যখন দেহস্থিত হয় তখন চৈতন্যরূপ গুণের আবির্ভাব হয়। আত্মা যখন দেহবিযুক্ত হয় তখন তাতে চৈতন্যরূপ গুণ থাকেনা। চৈতন্য ছাড়াও আত্মার অনেক গুণ আছে। যথা– রাগ, দ্বেষ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি। নৈয়ায়িকগণ আত্মাকে একটি অভৌতিক দ্রব্য বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা আত্মাকে চৈতন্যের আধার বলেও স্বীকার করেন। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা আত্মা সর্ম্পকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, আত্মা একটি চেতন দ্রব্য। আত্মা হল– কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, এবং অহংকারের আশ্রয় বা অহংপদবাচ্য দেহ, ইন্দ্রিয়, মন,সবকিছুই আত্মার রূপ।

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মতে ন্যায় দর্শনও জীবাত্মার মুক্তি লাভকে জীবের পরম পুরুষার্থ বলে অবিহিত করেছে এবং আত্মার মুক্তি বলতে নৈয়ায়িকেরা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই বুঝিয়েছেন। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলতে বুঝায় যে, দুঃখের আর পুনরাবৃত্তি হয় না । আত্মার বদ্ধাবস্থা তথা দুঃখের কারণ সর্ম্পকে নৈয়ায়িকেরা বলেন দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচনা করে। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয় হতে আত্মার সম্পূর্ণ বিচ্যুতি না হওয়া পর্যন্ত তার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তথা মুক্তি সম্ভব নয়। তাই মুক্ত অবস্থায় আত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয় হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন, জন্ম প্রসঙ্গের কারণে আত্মার সাথে দেহের মিলণ ঘটে, আর জন্ম গ্রহণ ঘটে জীবের প্রবৃত্তির কারণে ফলে প্রবৃত্তির অভাবে জীবের পূণর্জন্ম হয় না। আর জন্ম নিরোধ হলেই আত্মার সাথে দেহের সংযোগের কোন প্রশ্ন উঠে না। আত্মার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

দেহের সংযোগ না ঘটলে দুঃখেরও কোন প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে এবং জীব মুক্তি লাভ করে।এই মুক্তিই ন্যায় দর্শন মতে জীবের পরম পুরাষার্থ। নৈয়ায়িকগণের মতে তত্ত্ব জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই তিনি সন্ন্যাসীই হন অথবা গৃহস্থই হন মুক্তি লাভের অধিকারী।

চতুর্থত - ন্যায় ঈশ্বর তত্ত্ব : ন্যায় দর্শন মতে আত্মা দুই প্রকারের যথা জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। তিনি জগতের স্রষ্টা, রক্ষক এবং সংহারকারী পরমাণু – দেশ, কাল, আকাশ, মন এবং আত্মার সাহায্যেই ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্ঠি করেছেন। পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন ও আত্মা এ গুলি যদিও নিত্য দ্রব্য এবং জগতের উপাদান কারণ, ঈশ্বর এই নিত্য দ্রব্যগুলো সৃষ্টি করেন নাই, সুতরাং ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নন নিমিত্ত কারণ। তিনি এই সব নিত্য দ্রব্যের সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং জগৎকে রক্ষণ করেন, এবং প্রয়োজন বোধে তিনিই জগতকে ধ্বংশ করেন তাই ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক বলা হয়। ঈশ্বর এক, তিনি অসীম এবং নিত্য। ঈশ্বর জগতের কর্মফল দাতা, জীব নিজের উদ্ধারে কর্ম করে বটে, কিন্তু কর্মফল ও তার উদ্ধার জীবের উপর নির্ভর করে না। ঈশ্বরই জীবের কর্মের গুণাগুণ বিচার করে কর্মের গুণানুসারে ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। নৈয়ায়িক চিন্তার আরেকটি বিশেষ দিক হলো তারা বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত গ্রন্থ বলে মনে করেন, কারণ তাদের মতে বেদ কোন মানুষের রচনা হতে পারেনা, বেদের রচয়িতা হলেন একমাত্র ঈশ্বর। তাই বেদ অভ্রান্ত।

ন্যায় দর্শনের সঙ্গে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার তুলনামুলক আলোচনা

উপরোক্ত ন্যায় দর্শনের মতবাদসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নিগমানন্দ দর্শন ও ধর্মমতের সাথে এই মতবাদের প্রচুর মিল রয়েছে, অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, উভয় মতবাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই, নিম্নে উভয় দর্শনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনা সাপেক্ষে উভয় মতবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

সাদৃশ্যগত দিক সমূহ

উভয় মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্যগত দিকসমূহ নিম্নরূপ–

প্রথমত: ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষকে জ্ঞান লাভের অন্যতম মাধ্যম বলে মনে করা হয়। এই দর্শনে প্রত্যক্ষকে নানা ভাগে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন – (১) নির্বিকল্প (২) সবিকল্প (৩) প্রত্যাভিজ্ঞ (৪) সামান্য লক্ষণ (৫) জ্ঞান লক্ষণ (৬) যোগজ – নিগমানন্দ দর্শনে যদিও জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসেবে প্রত্যক্ষের এমন ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়নি। তবে নিগমানন্দ যে, নৈয়ায়িকগণের মত নির্বিকল্প, সবিকল্প, প্রত্যক্ষ, যোগজ কে জ্ঞান লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করেন, সেটা তাঁর বিভিন্ন লেখা পড়লে সহজেই বুঝা যায়।

দ্বিতীয়ত: নয়ায়িকগণের মতে মুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজন তত্ত্ব জ্ঞানের। আত্মা যে দেহ , মন বা ইন্দ্রিয় কোনটিই নয় এই জ্ঞানই নৈয়ায়িকগণের মতে তত্ত্বজ্ঞান। এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন অজ্ঞানই জীবের বদ্ধদশার কারণ। আর এই অজ্ঞানতার জন্যই জীব বারবার জন্ম গ্রহণ করে। নিগমানন্দ দর্শনে শ্রীনিগমানন্দদেবও অনুরূপ কথা বলেন। তিনিও মনে করেন নেতি নেতি করে বিচার করে অর্থ্যাৎ আমি দেহ নই, মন নই, ইন্দ্রিয় নই এভাবেই জীব স্বরূপের সন্ধান পায় ও মুক্তি লাভ করে। তত্ত্ব জ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন একান্ত প্রয়োজন – নৈয়ায়িকদের এই বক্তব্য নিগমানন্দদেবও স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণের মত নিগমানন্দদেবও মনে করেন অজ্ঞানতাই জীবের বদ্ধদশার কারণ। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হলো–"অজ্ঞানতা যতই হ্রাস পাবে– জ্ঞান চক্ষু ততই উন্মিলিত হবে, যেদিন অজ্ঞানতা নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেদিন আত্মা এমনি তার স্বরূপ বুঝতে পারবে এবং তার সাধনা পূর্ণ হবে।"[২৮]

তৃতীয়ত: নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে নৈয়ায়িকগণ বলেন, পরমাত্মাই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনি জগতের স্রষ্টা, রক্ষক, ও সংহারক। ঈশ্বর

২৮। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা-৩০২

Dhaka University Institutional Repository

এক, তিনি অসীম ও নিত্য। ঈশ্বরই জীবের কর্ম ও কর্মফল নিয়ন্ত্রণ করেন। নিগমানন্দদেবও তাঁর দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ আলোচনায় নৈয়ায়িকদের অনুরূপ মত পোষণ করেন। কাজেই বলা যায় ঈশ্বরের স্বরূপ বিচারে উভয় দর্শন প্রায় অভিন্ন মত পোষণ করে।

চতুর্থত: নৈয়ায়িকগণের মতে প্রত্যেক মানুষের বর্তমান অবস্থা তার কৃত কর্মের ফল। মানুষের সুকর্ম সুফল প্রদান করে। আর কু-কর্ম কু-ফল প্রদান করে। মানুষের শুভাশুভ কর্মফল সঞ্চিত থাকে এবং যেখানে সঞ্চিত তাকে অদৃষ্ট বলে। আর মানুষ তার অদৃষ্ট অনুসারে সুখ, দুঃখ, ভোগ করে। নৈয়ায়িকগণের এই কর্মফল নীতিকে নিগমানন্দদেব পুরাপুরি স্বীকার করেন, তিনিও মনে করেন মানুষ তার কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে। এই ভোগকে তিনি প্রারব্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বৈশাদৃশ্য

ন্যায় দর্শন ও নিগমানন্দ দর্শন উভয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয় দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য যতটুকু বৈসাদৃশ্য তার থেকে অনেক বেশি। নিম্নে বৈসাদৃশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো।

প্রথমত: নৈয়ায়িকগণের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি হলো সৃষ্টির উপাদান কারণ এবং ঈশ্বর হলো সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণের মতে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ এক নয় তারা মনে করেন ঈশ্বর এই চারটি উপাদান কারণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তারা আরও মনে করেন যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি পৃথক সত্তা তারা কখনও এক হতে পারে না।

নৈয়ায়িকগণের এই সৃষ্টি তত্ত্ব নিগমানন্দদেব পুরাপুরি অস্বীকার করেন। সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন "এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। দেবতা বল, অসুর বল, ভূত বল, মানুষ বল, বৃক্ষ বল, পর্বত বল, জল বল, বায়ু অগ্নি যা কিছুই বল সমস্তই ব্রহ্ম। ভগবান জগৎ সৃষ্টির বাসনা করিয়া বলিলেন, 'অহং বহু স্যাম' - 'আমিই বহু হইব"[২৯] এবং তিনি ক্রমান্বয়ে সবকিছু হলেন। অর্থাৎ নিগমানন্দদেব শঙ্করের মত বলতে চান, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নাই বরং তিনিই সবকিছু হয়েছেন

২৯। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ঈশ্বর একাধারে এই জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ দুই-ই। আর এজন্যই নিগম দর্শন দ্ব্যর্থ কণ্ঠে স্বীকার করে যে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়তঃ নৈয়ায়িকগণ বেদের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন এবং এও বলেন যে বেদ একটি অভ্রান্ত গ্রন্থ, কারণ স্বয়ং সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হলেন বেদের রচয়িতা অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ বেদের রচয়িতা হিসেবে কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপকে মেনে নিতে রাজি নন। নিগমানন্দদেবও পুরোমাত্রায় বেদের কতৃত্ব স্বীকার করেন এবং তিনিও মনে করেন যে, বেদ অভ্রান্ত গ্রন্থ, কিন্তু বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের রচনা এ কথাটি তিনি মানেন না এবং বেদের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন বেদ হলো "অপৌরুষেয় অপরোক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন বিভিন্ন মুণি ঋষিদের পুঞ্জিভূত জ্ঞান ভান্ডার"[৩০] অর্থাৎ বেদ মুণি ঋষিদের দ্বারা সৃষ্ট এবং স্মৃতি ও শ্রুতি রূপে পরিব্যাপ্ত।

তৃতীয়তঃ নৈয়ায়িকগণের মতে পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন ও আত্মার সাহায্যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন ও আত্মা এগুলি সবই ঈশ্বরের মতো নিত্য পদার্থ এবং জগতের উপাদান কারণ। তারা এও বলেন যে, ঈশ্বর এই নিত্য দ্রব্যগুলিকে সৃষ্টি করেন নাই। নিগমানন্দদেব নৈয়ায়িকগণের এই বক্তব্য পুরোমাত্রায় অস্বীকার করেন। তিনি ঈশ্বরের সমকক্ষ আর কোন কিছুকে নিত্য বলতে নারাজ। তিনি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন যে, ঈশ্বরই এক মাত্র নিত্য তাছাড়া আর যা কিছু আছে সবই অনিত্য।

চতুর্থত : নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের সাথে জীবের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, জীবের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক হলো 'পিতা-পুত্রের সম্পর্ক'। নিগমানন্দদেব তাঁর ধর্ম মতে যদিও ঈশ্বরের সাথে জীবের বিভিন্ন সম্পর্ক গড়া সম্ভব বলে তার 'প্রেমিক গুরু' গ্রন্থে উল্লেখ করেন তবে এ সম্পর্ক চরম নয় তার মাত্র 'জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ' অর্থ্যাৎ জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অর্থাৎ উভয়ে যেখানে অভিন্ন সেখানে কোন সম্পর্ক থাকতে পারেনা।

৩০। পূর্বোক্ত, **জ্ঞানী গুরু**, পৃষ্ঠা- ৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত: ন্যায় মতে আত্মা একটি অভৌতিক দ্রব্য এটি নিত্য ও সর্বব্যাপী। নৈয়ায়িকরা আরও বলেন, এক একটি দেহে এক একটি আত্মা বিদ্যমান। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা রাগ, দ্বেষ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণ যুক্ত। এই আত্মা চৈতন্য বিশিষ্ট, তবে চৈতন্য হলো আত্মার আগন্তুক গুণ। আত্মা সম্পর্কে নৈয়ায়িকগণের এই সকল অভিমত নিগমানন্দদেব তাঁর দর্শনে জোরালো ভাবে অস্বীকার করেন। নিগমানন্দদেবর মতে আত্মা এক, আত্মা কখনো বহু হতে পারে না। নিগম দর্শন বলে, আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত। সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ এই সকল গুণ আত্মায় কখনো প্রযুক্ত হতে পারেনা। নিগমানন্দদেব চৈতন্যকে আত্মার আগন্তুক গুণ বলে মেনে নিতে নারাজ। তাঁর মতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। চৈতন্য আত্মার অবিচ্ছেদ্য গুণ, এটি কখনো আগন্তুক হতে পারেনা।

বৈশেষিক দর্শন

বিশেষ নামক একটি পদার্থের বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে দিয়ে যে দর্শনের জন্ম হয় তাই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বৈশেষিক দর্শন নামে খ্যাত। এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি কণাদ। মহর্ষি কণাদের প্রকৃত নাম ছিল উলুক। এই দুই নামানুসারে তাঁর প্রণীত দর্শন কণাদ দর্শন বা উলুক দর্শন নামে পরিচিত। বৈশেষিক দর্শনের মূল গ্রন্থের নাম হলো 'বৈশেষিক সূত্র'। ন্যায় দর্শনের সাথে এই দর্শনের অনেক বেশি সামঞ্জস্য রয়েছে। তাই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে সমান তন্ত্র বলা হয়।

বৈশেষিক দর্শন মতে জীবের চরম লক্ষ্য হলো মুক্তি বা মোক্ষ, এবং এই মুক্তি বা মোক্ষ হলো দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই দর্শন অজ্ঞানতাকে যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ বলে মনে করে এবং তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি রূপ মুক্তি লাভ করা যায় বলে এই দর্শন বিশ্বাস করে। বৈশেষিক দর্শনকে বস্তুবাদী এবং বহুত্ববাদী দর্শন বলা হয়। নিম্নে এই দর্শনের আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হলো।

দ্রব্য: যে পদার্থকে আশ্রয় করে গুণ ও কর্ম অবস্থান করে, সেই পদার্থকে দ্রব্য বলে। বৈশেষিকগণের মতে গুণ মাত্রই কোন না কোন দ্রব্যের গুণ এবং কর্ম মাত্রই কোন না কোন দ্রব্যের কর্ম। গুণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারেনা। যদিও কর্ম দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে তথাপি দ্রব্য গুণ ও কর্ম হতে ভিন্ন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ দ্রব্যকে গুণ ও কর্মের সমষ্টি বলে মনে করেন, কিন্তু বৈর্শেষিকগণ এ বিষয়ে বৌদ্ধদের সঙ্গে একমত নন। বৈশেষিকগণের মতে দ্রব্য গুণ ও কর্মের সমষ্টি নয়। গুণ ও কর্মের আধার রূপী একটি স্বতন্ত্র সত্তা।

গুণ : যে পদার্থ দ্রব্যে অবস্থান করে এবং যার কোন কর্ম নেই তাই গুণ। গুণের কোন গুণও নেই। গুণ সব সময় দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। দ্রব্য গুণের আধার দ্রব্য ছাড়া গুণের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। যেমন–'শ্বেত' গুণটি কোন না কোন দ্রব্যেই থাকা সম্ভব। গুণ একটি ভাব পদার্থ। দ্রব্য কোন যৌগিক পদার্থের সমবায়ী বা উপাদান কারণ হতে পারে, কিন্তু গুণ কোন কিছুর সমবায়ী বা উপাদান কারণ হতে পারে না। গুণ দ্রব্যের নিষ্কৃয় বিশেষণ হিসেবে দ্রব্যে অবস্থান করে। তবে দ্রব্যে অবস্থান করলেও গুণ দ্রব্য হতে ভিন্ন। এটি কর্ম হতেও ভিন্ন।

কর্ম: বৈশেষিকগণের মতে, জড় পদার্থের গতিই হলো কর্ম। গুণের মত কর্মেরও আশ্রয় হলো দ্রব্য। কর্ম গুণ ও দ্রব্য হতে ভিন্ন। কর্মের কোন গুণ নেই। কর্ম ও গুণের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কর্ম গতিশীল ও সক্রিয় আর গুণ স্থিতিশীল ও নিষ্ক্রিয়। কর্ম হলো ক্ষণিক আর গুণ হলো স্থায়ী। কর্মের জন্যই দ্রব্যের সংযোগ ও বিভাগ সম্ভব হয়। মহর্ষি কণাদ কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, কর্ম হলো তা যা দ্রব্যে অবস্থান করে অথচ গুণ নয় এবং যা দ্রব্যের সংযোগ ও বিভাগের প্রত্যক্ষ কারণ। কর্ম দ্রব্যেই অবস্থান করে বটে, তবে সব দ্রব্যের কর্ম থাকেনা, যেমন আকাশ, দিক , কাল ও আত্মা এই সব বিষয় অমূর্ত ও সর্বব্যাপী দ্রব্য বলে এদের কোন কর্ম নাই। কেবল সীমিত ও মূর্ত দ্রব্যে কর্ম অবস্থান করে।

সামান্য: বৈশেষিক মতে সামান্য এক জাতীয় নাম নয় এবং তাদের সমান গুণের মাত্রও নয়। সামান্য এক জাতীয় দ্রব্যের নাম ও সমান গুণের সমষ্টির অতিরিক্ত একটি নিত্য পদার্থ। এর দ্রব্য নিরপেক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, কিন্তু সামান্যের উৎপত্তিও নাই বিনাশও নাই। যেমন প্রতিটি মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে কিন্তু তার মনুষত্ব অপরিবর্তিত।

বিশেষঃ যে পদার্থ কোন অংশহীন নিত্য দ্রব্যে অবস্থান করে এবং তার ভেদসাধক তাকে বিশেষ বলা হয়। বিশেষ সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। কেবল নিত্য পদার্থেই বিশেষের অধিষ্ঠান।ক্ষিতি,অপ, তেজ ও মরুৎ,পরমাণু, আকাশ, দেশ, কাল, মন ও আত্মা এইসব নিত্য দ্রব্য। তাই এদের প্রত্যেকরই বিশেষ আছে এবং এই বিশেষের জন্যই এদের প্রত্যেককে পৃথক অস্তিত্বশীল বলে জানা যায়।

সমবায়ঃ দুটি পদার্থের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ও নিত্য সম্পর্কের নাম সমবায়। যেমন সুতার সাথে কাপড়ের সর্ম্পক। সম্বন্ধ যুক্ত পদার্থ দুটির একটি অপরটিতে অবস্থান করে। যেমন কাপড় সুতার মধ্যে অবস্থান করে। সমবায় সম্পর্ক পাঁচ প্রকারের যথা–(১) দ্রব্য এবং গুণের সম্পর্ক (২) দ্রব্য ও কর্মের সম্পর্ক (৩) ব্যাক্তি ও জাতির সম্পর্ক (৪) নিজ দ্রব্যের সাথে বিশেষের সম্পর্ক (৫) অবয়বের সাথে অবয়বীর সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে গুণও কর্ম দ্রব্যেই থাকে।

অভাবঃ অভাব হলো কোন কিছুর অস্তিত্বহীনতা। যেমন – রাত্রির আকাশে সুর্য্যের অভাব বলতে আমরা বুঝি যে রাত্রির আকাশে সূর্য্যের অস্তিত্ব নেই। অভাব একটি নঞর্থক প্রত্যয় বা অবস্থা। এটি ভাব পদার্থের বিপরীত। বৈশেষিকগণ বলেন, অভাবকে অস্বীকার করা যায় না। টেবিলের উপর কলমটি আছে এটি যেমন সত্য টেবিলের উপর দোয়াতটি নেই এও তেমনি সত্য। সুতরাং অভাবকে একটি পদার্থ রূপে স্বীকার করতেই হয়। বৈশেষিকগণ অভাবকে সপ্তম পদার্থ রূপে গণ্য করেছেন।

জগৎ সৃষ্টি ও লয়ঃ বৈশেষিকগণ পরমাণুবাদের সাহায্যে জগতের সৃষ্টি ও লয় ব্যাখ্যা করেছেন। জগতের প্রতি ভারতীয় দার্শনিকদের একটি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। বৈশেষিক পরমাণুবাদেরও এই ক্ষেত্রে কোন বাতিক্রম নেই। বৈশেষিকদের মতে, জড় জগতের যাবতীয় যৌগিক বস্তু ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ–এই চার প্রকার পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয় এবং এই পরমাণুগুলির বিযুক্তিতে বিনষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এখন প্রশ্ন কার দ্বারা এই চেতনাহীন পরমাণুগুলি সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়? পরমাণুগুলো নিজে নিজে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয় এই কথা স্বীকার করা যায় না, যেহেতু তাদের কোন চেতনা নেই। সুতরাং কোন বুদ্ধিমান কর্তা আছেন যিনি পরমাণুগুলোকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন। বৈশেষিক মতে ঈশ্বরই হলেন সেই বুদ্ধিমান কর্তা। বৈশেষিকগণ আরও বলেন যে, জীবাত্মা যাতে মুক্তি লাভ করতে পারে তার জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। সুতরাং বৈশেষিক মতে জগৎ সৃষ্টি উদ্দেশ্যপূর্ণ।

পরমাণুবাদ : বৈশেষিক পরমাণুবাদ অনুসারে জগতে যে সকল জড়বস্তু আমরা দেখি তার সবগুলোই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, এই চার জাতীয় পরমাণুর সংমিশ্রণে গঠিত এবং এই পরমাণুগুলি বিযুক্ত হলেই যাবতীয় জড়বস্তুর বিনাশ ঘটে। তাই বৈশেষিকগণ বলেন – এই পরমাণুগুলি জগতের যাবতীয় উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপমান। এই পরমাণুগুলি অতি সূক্ষ্ম অভিভাজ্য এবং জড়। পরমাণুর আর কোন পরমাণু থাকেনা। পরমাণুগুলি সৎ, যেহেতু এদের সত্তা আছে। এগুলি নিরবয়ব, অংশহীন, নিষ্ক্রিয়, গতিহীন এবং দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশ।

পরমাণুগুলো নিত্য, যেহেতু এদের সৃষ্টিও নেই আবার বিনাশও নেই। পরমাণুগুলো যেহেতু নিষ্ক্রিয়, সেহেতু ঈশ্বরই পরমাণুগুলোতে গতি সঞ্চার করে– জগতের সৃষ্টি করেন। তাই বলা যায় পরমাণুগুলো জগতের উপাদান কারণ আর ঈশ্বর হলেন জগতের নিমিত্ত কারণ।

ঈশ্বর: বৈশেষিকগণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তবে ঈশ্বর সম্পর্কে ব্যাপক কোন আলোচনা তাঁরা করেননি। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য হল, ঈশ্বর বেদের রচয়িতা তাঁর কোন ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারেনা । তিনি অনন্ত , সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী। তিনি সর্বপ্রকার রাগ দ্বেষ ও সংস্কারবর্জিত । পরমাত্মা এক কিন্তু জীবাত্মা বহু। তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বর ও পরমাণু সহবস্থানকারী।

আমরা উপরোক্ত আলোচনায় বৈশেষিক দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত মতবাদ পেলাম। এই মতবাদসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে– নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর ধর্মমতের সাথে এই দর্শনের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে নিম্নে উভয় দর্শনের মধ্যকার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে উভয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

সাদৃশ্যগত দিক

বৈশেষিক দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর ধর্মমতের বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে, নিম্নে সাদৃশ্য সমূহ দেখানো হল।

প্রথমত: বৈশেষিকগণ আত্মাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। (১) জীবাত্মা (২) পরমাত্মা । নিগমানন্দও বৈশেষিকগণের মত আত্মাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য প্রমাণ করেন তাহল "সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পরের সখা । তাঁহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) সুস্বাদু ফল ভোগ করেন, অন্য (পরমাত্মা) নিরসন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র।"[৩১]

দ্বিতীয়ত: বৈশেষিকগণের মতে, জগৎ সৃষ্টির পেছনে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যাঁর ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ সাধিত হয়। নিগমানন্দ দর্শনও জগৎ সৃষ্টির পেছনে বৈশেষিকগণের এই বক্তব্যটুকু স্বীকার করেন। নিগমানন্দদেবও বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং তাঁর ইচ্ছায় জগতের বিলয় হবে ।

তৃতীয়ত: বৈশেষিকগণ ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী। তিনি সর্বপ্রকার রাগ, দ্বেষ, সংস্কার বর্জিত ; তিনি এক। নিগমানন্দ দর্শন ও ধর্ম মতে ঈশ্বরের যে স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেও বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী, এবং তিনি সকল প্রকার রাগ, দ্বেষ ও সংস্কার বর্জিত ।

৩১। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থতঃ বৈশেষিক দর্শন মতে জীবের চরম লক্ষ্য হল– মুক্তি বা মোক্ষ, এবং অজ্ঞানতাই হল বন্ধনের কারণ। নিগমানন্দ দর্শনও মনে করে জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি। অজ্ঞানতা বা মায়া বিদূরিত হলেই মানুষের ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে বা মুক্তি লাভ সম্ভব।

বৈসাদৃশ্যগত দিক

বৈষেশিক দর্শন ও নিগমানন্দ দর্শন পর্যালোচনা করলে উভয়ের মধ্যে যতটুকু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তার তুলনায় বৈসাদৃশ্যের পরিমান অনেক বেশি। নিম্নে উভয় দর্শনের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য দেখান হল।

প্রথমতঃ বৈষেশিক দর্শনে আত্মাকে নিত্য সর্বব্যাপী দ্রব্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিগমানন্দ দর্শনেও আত্মাকে যদিও নিত্য ও সর্বব্যাপী বলা হয়েছে, কিন্তু আত্মাকে দ্রব্য বলে স্বীকার করা হয়নি। নিগম দর্শন মতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ তাই তা কখনও দ্রব্য হতে পারেনা।

দ্বিতীয়তঃ বৈষেশিক দর্শনে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, পরমাণু, দেশ, কাল, মন, আত্মা, পভৃতি দ্রব্যকে নিত্য বলা হয়েছে। নিগমানন্দ দর্শন মনে করে ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য পদার্থ। ব্রহ্ম ছাড়া আর যা কিছু আছে সবই অনিত্য।

তৃতীয়ত : বৈষেশিকগণের মতে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এবং জগৎ সৃষ্টি উদ্দেশ্য পূর্ণ। কিন্তু নিগমানন্দদেব মনে করেন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নি। তিনি সৃষ্ট বা বহু হয়েছেন এবং বহু হওয়াটা তাঁর লীলা। এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেই।

চতুর্থতঃ বৈষেশিকগণের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ আর পরমাণুসমুহ জগতের উপাদান কারণ। নিগমানন্দদেবের মতে ঈশ্বর একাধারে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ দুই-ই। এ দর্শন পৃথক কোন উপাদান কারণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

পঞ্চমতঃ বৈষেশিকগণ মনে করেন ঈশ্বর ও পরমাণু সহ অবস্থানকারী। নিগমানন্দ বৈষেশিকগণের এই বক্তব্যটুকু দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে ব্রহ্মই জগতের একমাত্র এবং আদি কারণ, এবং

Dhaka University Institutional Repository

জগতের যা কিছু সবই ব্রহ্ম হতে নিঃসৃত। কাজেই পরমাণু ব্রহ্ম হতে নিঃসৃত হতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সহবস্থানকারী হতে পারেনা ।

মীমাংসা দর্শন

মহর্ষি জৈমিনি প্রতিষ্ঠিত দর্শনের নাম মীমাংসা দর্শন । প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে মীমাংসা দর্শনের আরেক নাম জৈমিনি দর্শন । বেদের দুই ভাগ – (১) পূর্বকান্ড বা কর্মকান্ড (২) উত্তরকান্ড বা জ্ঞানকান্ড। মীমাংসা দর্শন বেদের পূর্বকান্ড বা কর্মকান্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদের পূর্বকান্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মীমাংসা দর্শনকে পূর্বমীমাংসা বলা হয়। জৈমিনি প্রণীত "মীমাংসা সূত্র" মীমাংসা দর্শনের মূল গ্রন্থ। প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্ট মীমাংসা দর্শনের অন্যতম দুইজন ভাষ্যকার । প্রভাকর মিশ্রের ভাষ্যকে মিমাংসা দর্শনে সব থেকে মূল্যবান ভাষ্য বলে মনে করা হয়।

মীমাংসা দর্শনের মূখ্য কাজ হল নির্দিষ্ট যাগ যজ্ঞাদির ব্যাখ্যা করা এবং যুক্তির সাহায্যে তাদের সমর্থন করা । বৈদিক যাগ যজ্ঞের মূল ভিত্তি হল কতকগুলি বিশ্বাস। যথা– বেদ,প্রামাণ্য, আত্মা, অমর, স্বর্গ আছে, জগৎ ও জীবন সত্য, জীবনের কোন কর্মই ব্যর্থ নয়। জন্মান্তরেও যজ্ঞ ফল লাভ করা যায় ইত্যাদি। মীমাংসা দর্শন এই বিশ্বাসগুলির যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। আলোচনার সুবিধার্থে মীমাংসা দর্শনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা – (১) জ্ঞান (২) তত্ত্ব এবং (৩) নীতি ও ধর্ম। এখন এই ভাগ অনুসারে মীমাংসা দর্শনের আলোচনা করা যাক।

মীমাংসা জ্ঞান তত্ত্বঃ মীমাংসা মতে পূর্বে অজ্ঞাত কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সম্যক পরিচয়ই হলো যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা। যথার্থ জ্ঞান অবাধিত, অর্থাৎ এই জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারেনা। জ্ঞানের ব্যাপারে মীমাংসকেরা বস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী তাদের মতে বিষয় ছাড়া কোন জ্ঞান সম্ভব নয় এবং জ্ঞানের বিষয় সব সময় জ্ঞান হতে ভিন্ন। সুতরাং মীমাংসা মতে জ্ঞানের জন্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইয়েরই নিতান্তই প্রয়োজন। মীমাংসা মতে জ্ঞান দুই প্রকার– (১) প্রত্যক্ষ এবং (২) পরোক্ষ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ জ্ঞান : মীমাংসা মতে কোন অস্তিত্বশীল বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে যে জ্ঞান হয় তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার (১) নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ, (২) সবিকল্প প্রত্যক্ষ। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হলো বস্তুর নিছক অনুভূতি বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের যখন সংযোগ ঘটে তখন প্রথমে বস্তু সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট চেতনার উদ্ভব হয় এই অস্পষ্ট চেতনাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এটি হলো বস্তুর প্রথম স্তরের জ্ঞান। দ্বিতীয় স্তরে যখন বস্তুটির জাতি, ধর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান হয় তখন তাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলা হয়। মীমাংসকগণের মতে নির্বিকল্প এবং সবিকল্প একই বস্তুর প্রত্যক্ষের দুইটি স্তর মাত্র। নির্বিকল্প হলো প্রথম স্তর আর সবিকল্প হলো দ্বিতীয় স্তর।

পরোক্ষ জ্ঞান: যে জ্ঞানে বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাত সংযোগ ঘটে না তাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। যেমন – দূরে কোথাও ধোঁয়া দেখে আমরা অনুমান করি যে সেখানে আগুন আছে, এই হলো পরোক্ষ জ্ঞান। মীমাংসকগণ পরোক্ষ জ্ঞানকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন যথা – (১) অনুমান (২) শব্দ (৩) উপমান (৪) অর্থাপত্তি (৫) অনুপলব্ধি।

মীমাংসা তত্ত্ব বিদ্যা : মীমাংসকরা তত্ত্ব বিদ্যাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ভাগগুলো আলোচনা করা হলো।

জগৎ : মীমাংসকগণ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর সত্যতা প্রমাণ করা যায়। বৌদ্ধ দার্শনিকদের শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ আর অদ্বৈত বৈদান্তিকদের জগৎ মিথ্যাত্ববাদ মীমাংসকগণ মানেন না। তাঁরা বলেন যা কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় তাই সত্য। জগৎ এবং জাগতিক বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয়, সুতরাং জগৎ এবং জাগতিক বস্তু সত্য। তাছাড়াও মীমাংসকগণ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে আত্মা, স্বর্গ-নরক ও দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। মীমাংসকগণের মতে জগৎ নিত্য। জগতের সৃষ্টিও নেই ধ্বংসও নেই যেহেতু এমন কোন সময় নেই যখন জগৎ ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি ও অপূর্ব : কার্য কারণ তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে মীমাংসকগণ 'শক্তির' অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে প্রত্যেক কারণের মধ্যে একটি অপ্রত্যক্ষ শক্তি প্রছন্ন অবস্থায় থাকে এবং সেই শক্তিই কার্য উৎপন্ন করে। কোন প্রকারে যদি ঐ কারণস্থিত শক্তি নষ্ট হয়ে যায় তবে ঐ কারণ হতে কোন কার্য উৎপন্ন হয় না।

বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি বর্তমানে সম্পাদন করলে দীর্ঘদিন পরে এমন কি পরজন্মে বাঞ্ছিত ফল প্রসব করে কেমন করে – এই প্রশ্নের সমাধানে মীমাংসকেরা উপরি উক্ত শক্তিবাদের সহায্যে গ্রহণ করেছেন । তাঁরা বলেন ইহকালে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি যজ্ঞকারীর আত্মায় এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি সৃষ্টি করে । এই শক্তিকে মীমাংসকেরা 'অপূর্ব ' নামে অভিহিত করেছেন। এই অপূর্ব যজ্ঞকারীর আত্মায় অবস্থান করে এবং সুযো-গ উপস্থিত হলেই যজ্ঞকারীকে তার যথাযথ কর্মফল প্রদান করে। মীমাংসকদের এই অপূর্ববাদ ব্যাপক কর্মবাদের অর্ন্তগত ।

আত্মা: আত্মা সম্পর্কে মীমাংসকদের ধারণা– ন্যায় বৈষেশিক ধারণারই অনুরূপ। মীমাংসকদের মতে আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা দেহ মন ইন্দ্রিয় হতে ভিন্ন। দেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। দেহ বিনিষ্ট হলে দেহস্থিত আত্মা নিজ কর্মফল ভোগের জন্য দেহান্তরে গমন করে । আত্মার নিত্যতা যদি স্বীকার করা না যায় তবে আত্মা বিনিষ্ট হয় এবং স্বর্গ লাভের জন্য বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অর্থহীন হয়। এ লক্ষ্যে মীমাংসকেরা বলেন, আত্মা অবিনাশী । তারা আরও বলেন, আত্মা নিষ্ক্রিয় ও স্বরূপত নির্গুণ। চৈতন্য আত্মার স্বরূপগত গুণ নয়, আগন্তুক গুণ । মীমাংসকদের মতে আত্মা এক নয় বহু , এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বিরাজ করে ।

ধর্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব

ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে মীমাংসকদের মতবাদ নিম্নরূপ

ধর্ম: মীমাংসকদের মতে বৈদিক বিধি অনুসারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করাই ধর্ম। আর বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করাই অধর্ম। মীমাংসকেরা বলেন – বেদ বিহিত যাগ যজ্ঞাদির কর্মই মানুষের কর্তব্য কর্ম ।

Dhaka University Institutional Repository

এই কর্ম যে ব্যক্তি সম্পাদন করেন তিনিই ধার্মিক। মীমাংসকেরা বৈদিক যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান সমর্থন করলেও যজ্ঞভোজী দেবতাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাঁরা বলেন কোন দেবতার নামে যজ্ঞ করা হয় মাত্র, এছাড়া দেবতা বিশেষ কিছু নয়– তাঁদের মতে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠানটাই মুখ্য, দেবতা গৌণ।

পরম পুরুষার্থ: প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গ লাভই মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ বা চরম লক্ষ্য এবং স্বর্গে অনন্ত সুখ বিরাজ করে। কিন্তু পরবর্তি মীমাংসকগণ বন্ধন মুক্তি বা মোক্ষকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা বলেন সকাম কর্ম ফলদায়ক এবং এই ফল ভোগের জন্য মানুষকে পুর্নজন্ম গ্রহণ করতে হয়। সংসারে জন্মগ্রহণ করলেই দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম কোন ফল প্রসব করেনা তাঁদের মতে মানুষ যখন বুঝে যে, সমস্ত জাগতিক বস্তুই শেষ পর্যন্ত দুঃখদায়ক, তখন তার পক্ষে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব। এবং নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন করলে সেই কর্ম নুতন কোন ফল প্রসব তো করেই না অধিকন্তু পূর্ব সঞ্চিত কর্মফলকেও ক্রমে ক্রমে নষ্ট করে দেয়। ফলে কর্মফল ভোগ করার জন্য মানুষকে আবার পুর্নজন্ম গ্রহণ করতে হয়না এবং তার আত্মা মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করে।

নিরীশ্বরবাদ: মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি জৈমিনি জগৎ প্রতিষ্ঠা রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। প্রাচীন মীমাংসকগণও ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং তাদের আলোচনায় ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। তাদের মতে কর্ম নিয়ম অনুসারে জগতের সৃষ্টি হয়েছে এবং কর্ম নিয়ম অনুসারেই জীব তার কর্মফল ভোগ করে। প্রভাকর এবং কুমারিলও জগৎ স্রষ্টা রূপে বা কর্মফলদাতা রূপে বা পাপ-পূণ্যের নিয়ামক রূপে বা বেদের রচয়িতা রূপে কোন ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। অধিকন্তু মীমাংসকেরা বলেন যে, ঈশ্বর যদি জগত স্রষ্টা হন, তবে তাঁকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলতে হয়। যেহেতু তিনি জগতে কাউকে সুখী এবং কাউকে দুঃখী করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে এই কথাও স্বীকার করা যায় না । অতএব মীমাংসা দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলতে হয়। বস্তুতঃ মীমাংসা দর্শনে বেদই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছে।

মীমাংসা দর্শনের সাথে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত মীমাংসা দর্শন এক বিশেষ স্থানের অধিকারী এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। অনুরূপভাবে নিগমানন্দ দর্শনও ভারতীয় চিন্তার জগতে একটি অতি উন্নত সংযোজন। উভয় দর্শন পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, উভয় দার্শনিকের চিন্তার মধ্যে নানান দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে; অনুরূপ নানান দিক থেকে উভয় দার্শনিকের চিন্তার মধ্যে বিস্তর বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। নিম্নে উভয় দার্শনিকের মতবাদের সাদৃশ্যগত ও বৈসাদৃশ্যগত দিক তুলে ধরে উভয় দর্শনের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

সাদৃশ্যগতদিক: উভয় দর্শন পর্যালোচনা করলে দার্শনিকদের চিন্তার মধ্যে যে সাদৃশ্যগত দিক সমূহ পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ –

প্রথমত : মীমাংসকগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন । (১) নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ (২) সবিকল্প প্রত্যক্ষ। তাঁরা আরও বলেন এই উভয় প্রকার প্রত্যক্ষই একই বস্তুর প্রত্যক্ষের দু'টি স্তর। নির্বিকল্প হল প্রথম স্তর, আর সবিকল্প হল দ্বিতীয় স্তর। নিগমানন্দও প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অনুরূপ দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যথা– (১) সম্প্রজ্ঞাত (২) অসম্প্রজ্ঞাত। নিগমানন্দদেবের সম্প্রজ্ঞাত জ্ঞান আর মীমাংসকদের নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ একই জিনিস। অপর দিকে নিগমানন্দদেবের অসম্প্রজ্ঞাত জ্ঞান মীমাংসকদের সবিকল্পের অনুরূপ। এ কারণেই বলা যায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দিক থেকে উভয় দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: আত্মার ধারণা দিতে গিয়ে মিমাংসকগণ বলেন, আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী। আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় হতে ভিন্ন। দেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার কোন বিনাশ নেই। তাঁরা আরও বলেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

আত্মা নিষ্ক্রিয় ও স্বরূপত নির্গুণ। নিগমানন্দদেবও আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মীমাংসকদের অনুরূপ মত পোষণ করেন। নিগমানন্দদেবও মনে করেন যে, আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী। এই আত্মা – দেহ নয়, মন নয় বা ইন্দ্রিয় কোনটিই নয় এবং এই আত্মার কোন বিনাশ নেই। এই আত্মা অজড় ও অমর। এই লক্ষ্যে বলা যায় আত্মার স্বরূপ বিবেচনায় উভয় দর্শনে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

তৃতীয়ত : মীমাংসকদের মতে জগতে দুই ধরণের কর্ম রয়েছে– (১) নিষ্কাম কর্ম (২) সকাম কর্ম। তাঁরা আরও বলেন সকাম কর্ম ফলদায়ক এবং এই ফল ভোগের জন্য। মানুষকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। নিষ্কাম কর্ম কোন ফল প্রসব করেনা, ফলে এই কর্ম সাধনের জন্য মানুষকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না এবং এই কর্ম পূর্ব সঞ্চিত কর্মফলকেই ক্রমে নষ্ট করে দেয় এবং তার ফলে আত্মা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করে । মীমাংসকগণ এই কর্মফলবাদ ও তার উপর ভিত্তি করে জন্মান্তর তত্ত্ব উভয়ই স্বীকার করেন, কর্মফল ও জন্মান্তর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নিগমানন্দদেব বলেন, "কর্ম ক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণরূপে কর্মের অধীন। গত জন্মে মানুষ যেমন কর্ম করিয়াছে বর্তমান জন্মে সেই কর্মই অদৃষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া ফল প্রদান করিতেছে। মানুষেরা কর্ম দ্বারা সুখ ভোগ করে – কর্ম দ্বারাই দুঃখ ভোগ করে, কর্মবশেই তাহারা জন্ম গ্রহণ করে, কর্মদ্বারা শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ম বশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"[৩২]

বৈসাদৃশ্য : মীমাংসা দর্শন ও নিগমানন্দ দর্শন পর্যালোচনা করলে উভয় দর্শনের মধ্যে যতটুকু সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়– বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ তার তুলনায় অনেক বেশি। নিম্নে উভয় দর্শনের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যসমূহ তুলে ধরা হল।

প্রথমত: মীমাংসকদের মতে জগৎ নিত্য, জগতের সৃষ্টিও নেই ধ্বংসও নেই। নিগমানন্দদেব তাঁর ধর্ম ও দর্শনে মীমাংসকদের জগৎ সর্ম্পকীয় এই মতববাদকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে জগৎ পরিবর্তনশীল তাই জগৎ কখনও নিত্য হতে পারেনা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁর

৩২। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ইচ্ছায় জগৎ একদিন লয় প্রাপ্তও হবে। তাই– জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ নেই- মীমাংসকদের এই মতবাদ নিগমানন্দদেব মেনে নিতে পারেন নি।

দ্বিতীয়তঃ আত্মার আলোচনা করতে গিয়ে মীমাংসকগণ বলেন, আত্মা একটি দ্রব্য । চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ । তারা এও বলেন যে,আত্মা এক নয়, বহু, ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বিরাজ করে। নিগমানন্দদেব আত্মা সম্পর্কে মীমাংসকদের উপরোক্ত প্রত্যেকটি ধারণাকে অস্বীকার করেন । নিগমানন্দদেব বলেন, আত্মা কখনও দ্রব্য হতে পারে না বরং আত্মা একটি সত্তা। তিনি আরও বলেন- চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ নয় বরং স্বরূপগত জ্ঞান । অতএব আত্মা চৈতন্য বিশিষ্ট সত্তা। নিগমানন্দদেব আত্মার বহুত্ববাদ স্বীকার করেন না, তাঁর মতে আত্মা এক এবং এক আত্মাই সর্বত্র বিরাজিত, তবে দেহভেদে মন ভিন্ন হতে পারে।

তৃতীয়তঃ মীমাংসা দর্শন নিরীশ্বরবাদী। মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি জৈমিনি জগৎ স্রষ্টা রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। প্রাচীন মীমাংসকগণও ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নি। প্রভাকর ও কুমারিল ভট্টও জগৎ স্রষ্টারূপে বা কর্মফলদাতা রূপে বা পাপ-পুণ্যের নিয়ামকরূপে বা বেদের রচয়িতা রূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এক কথায় বলা যায় মীমাংসকগণ কোন ভাবেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ টেনে তো আনেন নি-ই বরং ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মীমাংসা দর্শন নিরীশ্বরবাদী। নিগমানন্দ দর্শন ঈশ্বর বিষয়ে মীমাংসকদের একেবারেই বিপরীত। এই দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দুই হল 'ঈশ্বর' যার অস্তিত্ব নিত্য বর্তমান। এই দর্শন এও বিশ্বাস করে যে,ঈশ্বর প্রাপ্তিই প্রত্যেকটি মানুষের পরম এবং একমাত্র লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বেদান্ত দর্শন

বেদান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, 'বেদের অন্ত বা শেষ'। বেদান্ত বলতে মূখ্যত উপনিষদকে বুঝায় । উপনিষদ্ অর্থ= উপ+নি+ষদ্ অর্থাৎ গুরু সমীপে বা নিকটে বসে জ্ঞান লাভ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান যা গুরুলব্ধ, অর্থাৎ গুরুর নিকট হতে সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষভাবে উক্ত জ্ঞান লাভ করতে হয়। এই লক্ষ্যে উপনিষদকে এক অর্থে জ্ঞানকান্ড বা বেদান্তের অন্তভাগ বলা হয়। এখানে অন্ত অর্থ শেষ নয় বরং শুরু অর্থাৎ জ্ঞান লাভই হল সর্বশেষ লক্ষ্য। বৈদিক যুগের ঋষি ও মুনিগণ ছিলেন এই জ্ঞানানুসন্ধানের প্রকৃত সন্ধানদানকারী। এই অর্থেই বেদান্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ নিখূত দর্শন বলা হয়ে থাকে। বিশেষত্ব হল– বেদান্ত ঈশ্বর লাভের যত প্রকার সিদ্ধান্ত আছে সবগুলি মতপথের আলোচনা করেছে।

এই উপনিষদগুলিতে যে সকল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে– তাদের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য লক্ষ করা যায়, কিন্তু এই ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আবার মতভেদ লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন কালে রচিত উপনিষদগুলির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহর্ষি বাদরায়ণ সর্বসম্মত বক্তব্যগুলিকে একত্র করে 'ব্রহ্মসূত্র' রচনা করেন। এই ব্রহ্মসূত্র বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা– বেদান্ত সূত্র, শারীরিক সূত্র, বাদরায়ণ সূত্র, শারীরিক মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, উপনিষদকে সাধারণতঃ বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি বলে মনে করা হলেও উপনিষদ বেদান্ত দর্শনের একমাত্র ভিত্তি নয়। বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি হলো তিনটি যথা– (১) উপনিষদ, (২) ভগবদগীতা, (৩) এর বিভিন্ন ভাষ্যসহ ব্রহ্মসূত্র। এই তিনটিকে একত্রে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। এই তিনটিকে স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করে বেদান্ত দর্শনের ইমারত গড়ে উঠছে।

ব্রহ্ম সূত্রের সূত্রগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত বলে তাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ ছিল। তাই বিভিন্ন ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের উপর বিভিন্ন ভাষ্য লিখেছেন। এই সকল ভাষ্যকারদের মধ্যে শঙ্কর, রামানুজ,

Dhaka University Institutional Repository

মধ্ব, বল্লভাচার্য মূলত উল্লেখযোগ্য। শঙ্করাচার্যের শারীরিক ভাষ্য, রামানুচার্যের শ্রীভাষ্য, মাধবাচার্যের "পুর্ণভাষ্য" প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞ সমাজে খুবই সমাদর লাভ করেছে। এই সকল উল্লেখযোগ্য ভাষ্যের মধ্যে আবার শঙ্কর এবং রামানুজের ভাষ্যই সুপ্রসিদ্ধ।

শঙ্কর এবং রামানুজ উভয়েই অদ্বৈতবাদী, দুজনই সর্বব্যাপী এক পরম তত্ত্বে বিশ্বাসী, উভয়ের মতেই জগৎ জড়ের সৃষ্টি নয়, এমন কি, জড় ও চেতনের সংযোগেও জগৎ সৃষ্টি হতে পারে না। ঈশ্বর জড় উপাদান দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এই মত তাঁদের দুজনের কেউ বিশ্বাস করেনা। তাঁদের মতে অচেতন জড় এবং চেতন জীব, পৃথক তত্ত্ব নয়। পরন্তু উভয়ে ব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় দার্শনিকেরই দর্শন চিন্তা বাদরায়ণের ব্রহ্ম সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরপর মিল থাকা সত্ত্বেও উভয় দার্শনিকের দর্শন চিন্তায় ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। দর্শন চিন্তার ইতিহাসে এঁদের একজন কেবল দ্বৈতবাদী, এর অপর জন বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদী। শঙ্করাচার্য কেবলাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক। রামানুজ বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক। কেবলাদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদ উভয় মতবাদই বেদান্ত দর্শনের অন্তর্গত। আমরা আমাদের প্রয়োজনের খাতিরে প্রথমে শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ আলোচনা করবো এবং তারপর নিগমানন্দ দর্শন ও ধর্ম মতের সাথে শঙ্করের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করব। পরবর্তীতে আমরা রামানুজের বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদ নিয়েও আলোচনা করব এবং নিগমানন্দ দর্শন ও ধর্ম মতের সাথে এই মতবাদেরও সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করব।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ: অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন মতবাদ, এই মতবাদের সাথে শঙ্করাচার্যের নাম বিশেষভাবে জড়িত। শঙ্করাচার্যকে অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক বলা হয়, যদিও প্রাক্ শঙ্কর যুগে এর উৎস পাওয়া যায়। তবে এই কথা সকলে স্বীকার করে যে, অদ্বৈতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মূলে আছেন শঙ্করাচার্য। সাধারণ লোক জানে, অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্যেরই মতবাদ। নিম্নে আমরা শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

জগৎ সম্পর্কে শঙ্করের মত : শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের মূল কথা হলো ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীবই ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ)। অর্থাৎ শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা। জগতের কোন সত্তা নেই। এই জগৎ স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু বা ভ্রম প্রত্যক্ষের বস্তুর ন্যায় মিথ্যা অবভাস মাত্র। এটি মায়ার সৃষ্টি। শঙ্কর আরও বলেন যে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতে পরিণত হন না, জগৎ রূপে প্রতিভাত হন মাত্র। যেমন- রজ্জুতে যখন সর্প ভ্রম হয় তখন রজ্জু সর্পে পরিণত হয় না। সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলেছেন। এখন প্রশ্ন কোন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে জগৎ মিথ্যা? শঙ্করের মতে যে দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানপ্রসূত তা পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। আর যে দৃষ্টিভঙ্গি অজ্ঞানতাপ্রসূত তা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ সত্য এবং ব্রহ্মই এর স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক।

ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রহ্ম হতে জগতের সৃষ্টিক্রম নিম্নরূপ। প্রথমে ব্রহ্ম হতে আকাশের আবির্ভাব হয় এবং তারপর ক্রমে-ক্রমে বায়ু,অগ্নি, অপ ও ক্ষিতির আবির্ভাব হয়। এইগুলিকে বলা হয় পঞ্চতন্মাত্র। এই পঞ্চতন্মাত্রের পাঁচ প্রকার সংমিশ্রণ হতে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়।

শঙ্করের ব্রহ্মবাদঃ শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগত মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মস্বরূপ। শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী । কারণ তিনি ব্রহ্মের সত্তা ছাড়া আর কোন কিছুর সত্তা স্বীকার করেন নি। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে শংকর বলেন, ব্রহ্ম নিত্য,শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম ও নির্গুণ। ব্রহ্ম এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই , আত্মাই ব্রহ্ম ।

তিনি আরও বলেন, ব্রহ্ম সৎ, চিদ, আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম– সৎ অর্থে তিনি অসৎ নন, চিৎ– অর্থে তিনি অচেতন বা জড় নন,আনন্দ স্বরূপ অর্থে – তিনি দুঃখ স্বরূপ নন। ব্রহ্ম নির্বিশেষ অর্থাৎ তাঁর কোন বিশেষ নেই । তবে শঙ্কর ব্রহ্মকে বা সেই আদি সত্যকে দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন (১) ব্যবহারিক (২) পারমার্থিক। শংকরের মতে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নির্গুণ। তিনি আরও বলেন, পারমার্থিক দৃষ্টি-ভঙ্গিই সত্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি। তবে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনার উপকারিতা শংকর স্বীকার করেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। যেহেতু চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে নির্গুণ ব্রহ্মের কোন ধারণাই বর্তায় না।

শংকরের মতে আত্মা বন্ধন ও মোক্ষ: (আত্মা চ ব্রহ্ম) শংকরের মতে আত্মা ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। উপনিষদেও পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে, জীব ও ব্রহ্ম এক। শংকর কেবলাদ্বৈতবাদী। তিনি কোন প্রকার ভেদে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ; প্রভৃতি সকল প্রকার ভেদই মায়াকল্পিত ও মিথ্যা।

শংকর বলেন আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় – মানব দেহ-আত্মার সমষ্টি, কিন্তু আসলে তা নয়। মানুষের দেহ অন্যান্য জড়বস্তুর মত মিথ্যা অবভাস মাত্র। কেবল আত্মাই সৎ বস্তু , দেহ সৎ বস্তু নয়। এই আত্মাই ব্রহ্ম । শংকরের মতে উপনিষদের মহাবাক্য ' তৎ-তম্- অসি' বাক্যের অর্থও তাই। 'তৎ' অর্থাৎ– 'সেই' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝায়। 'ত্বম্' অর্থাৎ তুমি শব্দের দ্বারা মানুষের অন্ত র্নিহিত আত্মাকেই বুঝায় । সুতরাং আত্মা ও ব্রহ্ম এক। অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছুই নয়।

আত্মার বন্ধন হল দেহের সঙ্গে আত্মার একাত্মবোধ । আত্মা স্বরূপগত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশত আত্মা নিজেকে দেহের সাথে অভিন্ন মনে করে এবং নিজেকে কর্তা জ্ঞাতা ও ভোক্তা মনে করে। ফলে দেহের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক প্রভৃতি নিজের বলে মনে করে এবং এটিই আত্মার বদ্ধাবস্থা। বদ্ধ অবস্থায় আত্মা তার ব্রহ্মত্ব বিস্মৃত হয়। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানের এই অভাবই তার বদ্ধাবস্থার কারণ।

এখন প্রশ্ন কিভাবে আত্মার মুক্তি সম্ভব? শঙ্কর বলেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দুর হলে আত্মা তার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং তখনই আত্মার মুক্তি হয়। শঙ্করের মতে বৈদিক যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মার মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। কেবল আত্মজ্ঞানই অর্থাৎ আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়।

Dhaka University Institutional Repository

শঙ্করের মতে মায়া: শঙ্করের মতে মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি এবং এটি অবর্ণনীয়। মায়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শঙ্কর আরও বলেন, মায়া ব্রহ্ম হতে ভিন্ন সত্তা নয়। আগুনের দাহিকা শক্তিকে যেমন আগুন হতে পৃথক করা যায় না, তেমনি মায়াকেও ব্রহ্ম হতে পৃথক করা যায় না। এই মায়াকে তিনি যাদুকরের যাদু শক্তির সাথে তুলনা করেছেন। যাদুকর যেমন তার যাদু শক্তির বলে একটি টাকাকে অনেক টাকা দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে পারে। তেমনি ব্রহ্মও জানেন যে, তাঁর মায়া শক্তি কিছুই নয়।এই মায়ারূপ শক্তি মানুষকে অসত্য জগতকে সত্য বলে মনে করাতে পারে। যাদুকর যেমন জানে যে, তার যাদু শক্তি চালাকি বা ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি ব্রহ্মও জানেন যে, তাঁর মায়াশক্তি তাঁরই আত্মশক্তি। লীলাময় শক্তি।

শঙ্করের মতে জ্ঞান : শঙ্করের মতে পারমার্থিক সত্তা এবং ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁর মতে একমাত্র ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে এবং এই ব্রহ্মজ্ঞানই পরাবিদ্যা। পরাবিদ্যায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। আর অপরা বিদ্যা হলো ব্যবহারিক সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান এবং এই জ্ঞান নিম্নস্তরের জ্ঞান। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানই সত্য জ্ঞান এবং এই জ্ঞান হলো অনুভব (Intuition) বিচার বুদ্ধি (Reason) নয়। তবে বিচার বুদ্ধি অনুভবের একটি উপায়। শঙ্করের মতে পরাবিদ্যা নিরপেক্ষ জ্ঞান, আর অপরাবিদ্যা আপেক্ষিক জ্ঞান। তবে আপেক্ষিক জ্ঞান, নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভের সোপান স্বরূপ। অর্থাৎ– শঙ্করের মতে জ্ঞান দুই প্রকার (১) পারমার্থিক (২) ব্যবহারিক। এবং পারমার্থিক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের সাথে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর আধ্যাত্ম ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক অনন্য মতবাদ। বস্তুতঃ এই দর্শন ভারতীয় চিন্তার জগৎকে যত বেশি প্রভাবিত ও আন্দোলিত করেছে, আর কোন দর্শন চিন্তাই হয়তো ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসকে এত বেশি প্রভাবিত ও আন্দোলিত করতে পারেনি। শঙ্করের জন্মের প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

বার শত বৎসর পর নিগমানন্দ দেবের জন্ম হলেও তার দর্শন ও ধর্ম চিন্তায় শঙ্করাচার্যের দর্শন ও ধর্ম চিন্তার প্রভাব ছিল অভাবনীয়। মুখ্যত নিগমানন্দদেব শঙ্করাচার্যের দর্শন চিন্তায় এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর দর্শন চিন্তার শিরোনামই দিয়েছিলেন, "শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ"। যদিও শঙ্করের অধিকাংশ মতই নিগমানন্দদেব স্বীকার করেছিলেন তাই বলে নিগমানন্দ দর্শনকে শঙ্করের দর্শনের নকল বলা যাবে না। কারণ নিগমানন্দদেবের একটা নিজস্ব জীবন বোধ ছিল, এবং তাঁর দর্শনের একটি নিজস্ব স্বকীয়তাও ছিল। এখন আমরা ক্রমান্বয়ে উভয় দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের দিকসমূহ খতিয়ে দেখব এবং উভয় দর্শনের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করব।

সাদৃশ্যগত দিক

উভয় দার্শনিকগণের দর্শন চিন্তার পর্যালোচনা করলে যে সাদৃশ্যগত দিক সমূহ পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ–

প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য কঠোর অদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে একমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা আছে, ব্রহ্ম ছাড়া আর যা কিছু সবই মিথ্যা। তিনি দ্বৈতবাদ এবং বহুত্ববাদের ঘোর বিরোধী। নিগমানন্দদেবও অদ্বৈতবাদী। তিনিও ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অদ্বৈতবাদই হিন্দু শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। অদ্বৈতই পরমার্থ এবং দ্বৈত সেই অদ্বৈতরেই কার্য। যখন সমাধি উপস্থিত হয় তখন দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না। যাহারা দ্বৈতবাদী তাঁহারা ভ্রান্ত, কারণ শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে, "একমেবাদ্বিতীয়ম" সেই পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং অদ্বৈত বৈদিক মত সর্বদা অবিরুদ্ধ।[৩৩]

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেন, "ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত ও নির্গুণ। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে

৩৩। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃ. ৭৫-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

নিগমানন্দদেবও শঙ্করের অনুরূপ মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তার 'জ্ঞানীগুরু' গ্রন্থে যে বক্তব্য প্রদান করেন তা প্রণিধানযোগ্য।

> হিন্দুধর্ম যে বেদান্তমূলক, সেই বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই কিছু থাকিতে পারে না। তিনি অনাদি ও অনন্ত এবং অদ্বিতীয় নিত্য বস্তু। তিনি একমাত্র সত্তা স্বরূপ বলিয়া বৈদিক ঋষি উদ্দালক তাঁহাকে সৎ স্বরূপ বলিয়াছেন। এ জগতে সেই সত্তার চৈতন্য রূপের পরিচয় সর্বত্রই। অতএব সেই সত্তা চৈতন্য স্বরূপ। তাই ঋক্ বেদে তিনি চিৎরূপে উক্ত হইয়াছেন। যাহা চিৎ স্বরূপ, তাহা অবশ্যই আনন্দময়। সুখের অভাবই দুঃখ। সুখের অনন্ত রূপই নিত্যানন্দ। এ জগতে যে সুখের পরিচয় আছে সেই সুখ অপরিছন্নরূপে অনন্ত হইলেই নিত্যানন্দময় হয়, তাই পরম ঋষি সনৎ কুমার ব্রহ্মকে আনন্দ স্বরূপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ।[৩৪]

তৃতীয়ত

শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা। জগতের কোন সত্তা নেই। এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু বা ভ্রম প্রত্যক্ষের বস্তুর ন্যায় মিথ্যা আভাস মাত্র। জগৎ মায়ার সৃষ্টি। জগতের স্বরূপ সম্পর্কে নিগমানন্দদেবের কণ্ঠেও অনুরূপ প্রতিধ্বণি শোনা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> স্বপ্নবস্থায় যেরূপ অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং আমি স্বপ্ন দেখিতেছি বলিয়া কখনই বোধ হয় না। সেইরূপ মায়া বলে এই অসত্য জগতকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে এবং আমি যে মায়া বিমোহিত হইয়া এরূপ দেখিতেছি, তাহা কখনই বোধ হয় না। তিনি আরও বলেন, অজ্ঞানাবস্থায় এই জগৎ সত্যবদ প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞানোদয় হইলে, এই জগতের অস্তিত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৩৪। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য বেদান্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই জগৎ কে স্বপ্নের ন্যায় অনিত্য, মিথ্যা, ভ্রমাত্মক ও অলীক বলিয়া জানেন।[৩৫]

চতুর্থতঃ আত্মা, আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শঙ্কর বলেন যে, "আত্মাই ব্রহ্ম" এবং এই আত্মা যখন দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে তখনই আত্মা বন্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আত্মার বন্ধাবস্থার একমাত্র কারণ হলো অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা যখন দুরীভূত হয় তখন আত্মা তার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং তখনই আত্মার মুক্তি হয়। আত্মা , আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ সম্পর্কে নিগমানন্দদেবও শঙ্করের অনুরূপ মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "ব্রহ্মই আত্মা, আত্মা প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত হইলে এই জগৎ প্রপঞ্চ বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে। এবং এই সংযুক্ত হইবার একমাত্র কারণ অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া যায় এবং উহাই আত্মার কৈবল্য পদে অবস্থিতি।"[৩৬]

পঞ্চমতঃ শঙ্করের মতে মুক্তির সঙ্গে নিষ্কাম কর্মের কোন বিরোধ নেই মুক্ত ব্যক্তি যদি নিষ্কাম কর্ম করেন তবে তার বন্ধন হয় না। অতএব বলা যায় নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব। নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে নিগমানন্দদেবও অনুরূপ মত পোষণ করেন, তিনি বলেন, "কর্ম না করিলে যখন কোন উপায় নাই, তখন কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু সেই কর্ম সম্পূর্ণ আসক্তিহীন হইয়া করিবে। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া অনাসক্ত চিত্ত হইয়া কর্ম করাকেই কর্মযোগ বলে এবং মানুষ আসক্তিশূন্য হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলেই মোক্ষ লাভ করে।"[৩৭]

বৈসাদৃশ্য গত দিক

শঙ্কর দর্শন ও নিগমানন্দ দর্শনের মধ্যে যেমন কিছু সাদৃশ্য আছে তেমনি নানান দিক থেকে উভয় দর্শনের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। নিম্নে বৈসাদৃশ্যসমূহ দেখানো হলো–

৩৫। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃ. ১৩৮
৩৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১২৮
৩৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত: শঙ্কর দর্শন কারণ কে যে অর্থে স্বীকার করেছেন কার্যকে সে অর্থে গ্রহণ করেন নি। শঙ্কর তাঁর দর্শনে বলেন- মহাশক্তি অনাদি অতএব তিনি সততই এই সংসারে কারণ রূপে বিদ্যমান আছেন, কখওনই কার্যরূপ হন না। কিন্তু সৃষ্টি ব্যাপারে নিগমানন্দ দর্শন নিমিত্ত কারণ পুরুষ এবং উপাদান কারণ প্রকৃতি এই উভয়কে স্বীকার করে।

দ্বিতীয়ত: শ্রীনিগমানন্দদেব জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে যেমন অদ্বৈতবাদী মানতেন, প্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে তেমনি নিজেকে দ্বৈতবাদী বলতেও কুণ্ঠিত বোধ করতেন না। কিন্তু শঙ্করাচার্য ছিলেন খাঁটি অদ্বৈতবাদী। তিনি শুধু জ্ঞান পথকেই তাঁর দর্শনের লক্ষ্যে রেখে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, পুরাপুরি স্বীকার করেছেন। প্রেম বা ভক্তির পথ তার দর্শনে অস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন।

তৃতীয়ত: শঙ্কর দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি হতে ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করেছেন, (১) ব্যবহারিক (২) পারমার্থিক। তাঁর মতে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ জগৎ সত্য, এবং ব্রহ্মই এই জগতের সৃষ্টি কর্তা। এই দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নানাবিধ গুণ সমন্বিত, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিরাজমান পুরুষ, শঙ্কর এই ব্রহ্মকে সগুণ ব্রহ্ম নামে আখ্যায়িত করেছেন। সাথে সাথে তিনি এও বলেছেন যে, ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্য নয় বরং অজ্ঞনতা প্রসূত। আর পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক কিছুই নন, তিনি নিরাকার ও নির্গুণ অর্থাৎ দ্রষ্টা বা সাক্ষী স্বরূপ। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি যথার্থ বা জ্ঞান প্রসূত বলেছেন। কিন্তু নিগমানন্দ দর্শন অধিকারভেদে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি স্থূল ,সূক্ষ্ম, শান্ত, অনন্ত সাকার-নিরাকার প্রভৃতি সকল ভাবই বিশ্বাস করি।"[৩৮]

চতুর্থত: শঙ্কর তাঁর দর্শনে জ্ঞান পথকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং জ্ঞান পথেই শুধুমাত্র ব্রহ্মকে লাভ করা যায়- এ কথা তাঁরস্বরে ঘোষণা করেছেন। নিগমানন্দদেব জ্ঞান পথকে মূল্যায়ন করলেও শুধু জ্ঞান পথেই যে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় আর অন্য কোন পথ নেই তা স্বীকার করেন নি।

৩৮। পূর্বোক্ত, শ্রী শ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী, পৃষ্ঠা- ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর সাধন জীবনে তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেম এই চতুর্বিধ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন, তাই তিনি চারিটি পথকেই সত্য বলে মনে করেন। তা ছাড়াও তিনি 'নর রূপে নারায়ণ সেবা' ও 'ব্রহ্মবিদ্ গুরু সেবা' এই দুই পথেও ঈশ্বর লাভ করা যায় বলে মনে করেন।

পঞ্চমত: নিগমানন্দ দর্শন হলো সমন্বয়বাদী দর্শন, জ্ঞান ও ভক্তির মিলনই তাঁর দর্শনের মূল লক্ষ্য। এজন্যই তিনি জ্ঞান ও ভক্তিকে যুগপৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু শঙ্কর দর্শন এ সমন্বয় বিশ্বাস করে না। শঙ্কর দর্শন মতে নির্গুণ ব্রহ্ম লাভই জীবনের একমাত্র পরুষার্থ এবং জ্ঞান পথই একমাত্র পথ। শঙ্করের মত উদার হলেও পথ সংকীর্ণ। শ্রীনিগমানন্দ এজন্যই তাঁর মত কে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পথের সংকীর্ণতা ত্যাগ করে তাঁর স্বীয় সাধন লব্ধ বিভিন্ন পথের সন্ধানে সুফল প্রকাশ করেছেন। এখানেই এই দর্শন বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

দর্শনের পরব্রহ্মবাদ এবং ধার্মিকের ঈশ্বরবাদের সমন্বয় সাধারণের প্রচেষ্টায় যে মতবাদের উৎপত্তি তাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক । রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। হিরিয়ানার (Hiriyanna) মতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উৎস দ্বিবিধ। একদিকে বেদ, উপনিষদ্, ভাগবত গীতা প্রভৃতি, অপর দিকে তামিল ভাষায় রচিত দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য, এই উভয়ের কথা চিন্তা করে রামানুজের দর্শনকে উভয় বেদান্ত নামে অভিহিত করা হয়। রামানুজ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বিশিষ্টাদৈতবাদের বিষদ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে – বেদান্ত সংগ্রহ, শ্রীভাষ্য, বেদান্ত দীপ, বেদান্ত সার প্রভৃতি অন্যতম। তিনি তাঁর লিখিত এ সব গ্রন্থের মাধ্যমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিষদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিম্নে তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দর্শন আলোচনা করা হল–

Dhaka University Institutional Repository

জগত সম্বন্ধে রামানুজের মত: রামানুজের মতে জগত সত্য ও সনাতন, তবে ব্রহ্মাধীন। ব্রহ্মই এই জগতের স্রষ্টা। ব্রহ্ম তাঁর চিৎ অংশ হতে জীব, এবং অচিৎ অংশ হতে জড় জগতের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মে কোন অভাব নেই, কোন অভাব পূরণের জন্য তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন নি। জগৎ সৃষ্টি হল তাঁর শক্তি ও আনন্দের লীলা। রামানুজ সৎ কার্যবাদের সমর্থক। সৎ কার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপন্ন হওয়ার আগে উপাদান কারণের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কার্য - কারণের ব্যক্ত রূপ। রামানুজের মতে ব্রহ্মের চিৎ অংশ জীবের এবং অচিৎ অংশ জগতের উপাদান কারণ। যেহেতু জীব ও জগতের আবির্ভাব হয় এই দুই উপাদান হতে। এই আবির্ভাব ব্রহ্ম নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ব্রহ্মকে জীব ও জগতের নিমিত্ত কারণও বলা হয়। রামানুজের মতে সৃষ্টির আগে জীব ব্রহ্মের চিৎ অংশে, আর জড় ব্রহ্মের অচিৎ অংশে বিদ্যামান থাকে। আবার প্রলয়ের সময় বিশ্ব যখন ধ্বংস হয় তখন জীব ব্রহ্মের চিৎ অংশে এবং জগৎ তার অচিৎ অংশে বিলীন হয়ে যায়। রামানুজ আরও বলেন জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সৃষ্ট জগৎ যেমন সত্য তেমনি তাঁর মায়া শক্তিও সত্য। শঙ্করের ন্যায় তিনি মায়াকে কখনো অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলেন নি।

রামানুজের ব্রহ্মবাদ: রামানুজের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ম) তিনি চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট পরম সত্তা তাঁর বাইরে কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নেই। কিন্তু তাঁর অভ্যন্তরে চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়) এই দুই সত্তা বিদ্যামান। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মেরই দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্রহ্ম যেমন নিত্য তাঁর অংশগুলিও তেমনি নিত্য। রামানুজের মতে এক ব্রহ্মে বহুর স্থান আছে। রামানুজের মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলার কারণ এই যে রামানুজ চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলেছেন। রামানুজ বলেন ব্রহ্ম ভেদহীন নয় যদিও ব্রহ্মের স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নেই কিন্তু তাঁর স্বগত ভেদ আছে যেহেতু তাঁর অভ্যন্তরে জীব ও জড় রয়েছে।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম অসংখ্য সৎ গুণের অধিকারী, তাঁর মধ্যে কোন অসৎ গুণ নেই। এই কারণে উপনিষদে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়েছে। তিনিই জগতের স্রষ্টা রক্ষক ও সংহারক। রামানুজের

Dhaka University Institutional Repository

মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সচেতন পুরুষ। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনি করুণাময় তিনি ভক্তকে তাঁর বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন । তিনি অজ্ঞানীকে জ্ঞান, শক্তিহীনকে শক্তিদান করেন এবং অপরাধীকে ক্ষমা করেন। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীবের উপাস্য এবং ঈশ্বর প্রাপ্তিই জীবের লক্ষণ, ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া জীবের মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

রামনুজের মতে আত্মা: রামানুজের মতে আত্মা ব্রহ্মেরই অংশ। যেহেতু ব্রহ্মের অংশ সেহেতু আত্মা অসীম নয় সসীম। আত্মা, দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হতে পৃথক। দেহযুক্ত আত্মাই জীব। জীবের দেহ ব্রহ্মের অচিৎ অংশ হতে সৃষ্ট। কিন্তু আত্মা সৃষ্ট নয়। আত্মা ব্রহ্মের চিৎ অংশ। আত্মা নিত্য তাই অজর ও অমর। আত্মা অতি সুক্ষ্ম একটি অণু। তাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। চৈতন্য আত্মার নিত্য গুণ সর্ববস্থায় চৈতন্য আত্মায় অবস্থান করে।

রামানুজের মতে উপনিষদে ব্রহ্ম ও জীবাত্মার যে অভেদের কথা বলা হয়েছে তাতে সর্বতোভাবে অভেদ বুঝায় না। কারণ সসীম জীবাত্মার এবং অসীম ব্রহ্ম সর্বতোভাবে অভিন্ন হতে পারে না। আবার জীবাত্মা ও ব্রহ্ম ভিন্নও হতে পারে না। কারণ আত্মা যেহেতু ব্রহ্মেরই অংশ তাই রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম ও জীবাত্মার মধ্যে যে সম্পর্ক তা হল ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক ।

আত্মার বন্ধন: রামানুজের মতে কর্মফল ভোগের জন্যই আত্মা দেহের মধ্যে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। নিজ নিজ কর্মানুসারে আত্মা দেহ ধারণ করে । আত্মার দেহ ধারণই হল আত্মার বন্ধন। আত্মা তাঁর নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ বলে নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে । আত্মা ও দেহের এই একীকরণের নাম অহংকার । এই অহংকারের জন্যই আত্মা পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত হয় এবং সকাম কর্ম সম্পাদন করে। ফলে বারবার তাকে জন্ম গ্রহণ করতে হয় এবং এই জন্মই হল বন্ধন। সুতরাং রামানুজের মতে অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাই আত্মার বন্ধনের কারণ ।

আত্মার মুক্তি: রামানুজের মতে আত্মার মুক্তি লাভের জন্য কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন। কর্ম বলতে রামানুজ বর্ণাশ্রম অনুসারে বেদ নির্দেশিত যাগ যজ্ঞাদি উদ্‌যাপন করাকে বুঝিয়েছেন। আরও

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম বলতে তিনি নিষ্কাম কর্মকে বুঝিয়েছেন। অবশ্য যথার্থ জ্ঞান হতেও যে বুদ্ধি লাভ সম্ভব একথাও রামানুজ স্বীকার করেন। রামানুজের মতে যথার্থ জ্ঞান হলো ঈশ্বরের ধ্রুবা স্মৃতি অর্থাৎ সবসময় ঈশ্বরের স্মরণ। এর দ্বারা ধ্যান উপাসনা ও ভক্তিও বুঝায়। অনুক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যানের ফলে মোক্ষকামী প্রেমময় ঈশ্বরের দর্শন পান। ফলে মোক্ষকামীর আর দেহ ধারণ করতে হয় না এবং পুনর্জন্মের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তিনি চির মুক্তি লাভ করেন। রামানুজ মনে করেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া কেবল মানুষের চেষ্টায় মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। রামানুজ জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে দেহ থাকলে বা দেহ ধারণের সম্ভাবনা থাকলে মুক্তি সম্ভব নয়। মুক্তি বলতে তিনি বিদেহী মুক্তিকেই বুঝিয়েছেন। রামানুজ আরও বলেন, মুক্তি লাভের পরও জীবাত্মা ব্রহ্মের সাথে এক হতে পারে না। কারণ সসীম আত্মার পক্ষে অসীম ব্রহ্মের সাথে এক হওয়া সম্ভব নয়।

রামানুজের জ্ঞানতত্ত্ব

রামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই তিন প্রকার জ্ঞানের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রত্যক্ষ: রামানুজের মতে প্রত্যক্ষ হলো সাক্ষাত জ্ঞান। এবং এই জ্ঞান যথার্থ, তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, (১) নিত্য (২) অনিত্য। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সকল সময় সব বস্তু প্রত্যক্ষ করেন তাই তাঁর প্রত্যক্ষ নিত্য প্রত্যক্ষ । আর মানুষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ করে তা হলো অনিত্য প্রত্যক্ষ। অনিত্য প্রত্যক্ষ আবার দুই প্রকার (১) যোগজ (২) অযোগজ। তাছাড়াও তিনি প্রত্যক্ষের আরও দুটি ভাগ স্বীকার করেছেন (১) নির্বিকল্প (২) সবিকল্প।

অনুমান: রামানুজের মতে সাধারণ সত্য হতে পাওয়া জ্ঞানই অনুমান। তিনি বলেন, সাধারণ সত্যে পৌঁছাতে একাধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ একটি দৃষ্টান্ত হতেই সাধারণ সত্য লাভ করা যায়। একাধিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা আমাদের সংশয়কে দূর করি। তর্কের সহায়তায় এবং সদর্থক ও সমার্থক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বর্জন করি এবং সাধারণ সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করি।

Dhaka University Institutional Repository

আগম: রামানুজের মতে শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানই আগম। তাঁর মতে অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান কেবল শাস্ত্রের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। চরম সত্তাকে শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে জানায় না। তবে শাস্ত্রকে সমর্থন করার জন্য বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগান যেতে পারে।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সাথে নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর আধ্যাত্ম ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। বিশেষত ভারত উপমহাদেশের সমস্ত ভক্তিবাদী আন্দোলনই কমবেশি রামানুজের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নিগমানন্দদেবের ধর্ম পথে যেভাবে দ্বৈতবাদকে স্বীকার করা হয়েছে তাতে এতটুকু নিঃশন্দেহে বলা যায় যে, নিগমানন্দ দর্শন ও তাঁর ধর্ম মতে রামানুজের প্রভাব কিছুটা হলেও আছে। উভয় দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয় দার্শনিকের চিন্তায় নানান দিক থেকে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি বৈষাদৃশ্য রয়েছে প্রচুর । আমরা এখন ক্রমান্বয়ে দার্শনিকদ্বয়ের চিন্তার সাদৃশ্যগত ও বৈষাদৃশ্যগত দিকসমূহ তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

সাদৃশ্যগত দিকসমূহ

দার্শনিকদ্বয়ের ধর্ম ও দর্শন চিন্তার সাদৃশ্যগত দিকসমূহ নিম্নরূপ–

প্রথমত: রামানুজের মতে ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া জীবের মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করে তাঁর কৃপা লাভ করতে পারলেই জীব মুক্তি লাভ করতে পারে। অর্থাৎ রামানুজ মানুষের পূর্ণতার জন্য বা ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য ঈশ্বরের কৃপাকে একান্ত আবশ্যিক বলে মনে করেন। নিগমানন্দদেবও মনে করেন যে, ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কিছুই হতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনী ও বাণী গ্রন্থে যা বলেন তা নিম্নরূপ – "অনন্ত অসীম বিশ্বে জীব কণা মাত্র কি করে যে ধরবে সেই বিরাটকে, সসীম অসীমকে বুঝবে কি করে ? তবে এই মাত্র বুঝবে তিনি লীলাময় – এ বিশ্বময়

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর লীলা খেলা। এ ছাড়া তাঁকে কিছু জানতে পারবে না। যদি কেউ কিছু জানে তা তাঁর কৃপায়, নচেৎ নয়।"[৩৯]

দ্বিতীয়তঃ রামানুজ তাঁর দর্শনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে নির্বিকল্প ও সবিকল্প এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। নিগমানন্দদেবও তাঁর দর্শনে নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেছেন।

তৃতীয়তঃ রামানুজের মতে মোক্ষ লাভের জন্য প্রয়োজন যথার্থ জ্ঞানের এবং অনুক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যান। অর্থাৎ রামানুজ ঈশ্বর লাভ বা মোক্ষ বা ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথকেই স্বীকার করেছেন। নিগমানন্দদেবও জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে বিশ্বাসী। তিনি এও মনে করেন জ্ঞান-ভক্তি উভয় পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "জ্ঞান লাভ বা আত্ম দর্শনের (মুক্তি) দুই পথ, এক কঠোর সন্ন্যাস যোগ দুই ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা, তোমরা ভক্তি পথে জ্ঞান লাভ করবে, এটাকেই আমি বলি 'শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ'।"[৪০]

চতুর্থতঃ রামানুজ কর্মফল ও সেই অনুসারে জন্মান্তর স্বীকার করেন। তাঁর মতে, আত্মা তার নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ বলে নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে। আত্মা ও দেহের এই একীকরণের নাম অহংকার। এই অহংকারের জন্যই আত্মা পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত হয় এবং সকাম কর্ম সম্পাদন করে। এ কারণে তাঁকে বারবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়। নিগমানন্দদেবও তাঁর দর্শন চিন্তায় জন্মান্তর ও কর্মফল সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মানুষেরা কর্মদ্বারা সুখ ভোগ করে, কর্মদ্বারাই দুঃখ ভোগ করে, কর্মবশেই তাহারা জন্ম গ্রহণ করেন, কর্মদ্বারাই শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্মদ্বারাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই সমস্ত কারণে আর্য জাতির জন্ম-জন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস।"[৪১]

৩৯। পূর্বোক্ত, শ্রী শ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী, পৃষ্ঠা- ১৫৯।
৪০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৬১
৪১। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

বৈসাদৃশ্যগত দিকসমূহ

এতক্ষণ রামানুজের দর্শন চিন্তার সাথে নিগমানন্দদেবের দর্শন চিন্তারও ধর্মমতের সাদৃশ্যগত দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল। উভয়ের দর্শন চিন্তার সাদৃশ্যের পরিমাণ যতটুকু বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ তার থেকে অনেক বেশি । নিম্নে উভয় দার্শনিকের চিন্তার বৈসাদৃশ্যগত দিকসমূহ তুলে ধরা হল।

প্রথমত: রামানুজের মতে জগৎ সত্য ও সনাতন এবং ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা । শ্রী নিগমানন্দদেব রামানুজের এই মতকে স্বীকার করেন না । জগৎ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল– "যেরূপ শুক্তিতে রজত জ্ঞান মিথ্যা সেইরূপ পরমাত্মাতে জগত জ্ঞান মিথ্যা, এই পরিদৃশ্যমান জগত মায়াময় ও কেবল ভ্রম মাত্র।"[৪২]

দ্বিতীয়ত: রামানুজ দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী । তাঁর মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি পৃথক। স্রষ্টা অসীম কিন্তু সৃষ্টি সসীম। কাজেই সসীম জীব কখনই অসীম হতে পারেনা। নিগমানন্দদেব যদিও দ্বৈতবাদকে স্বীকার করেছেন কিন্তু দ্বৈতবাদ চরম সত্য বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে আমাদের উদ্দেশ্য হলো দ্বৈতের ভিতর দিয়ে অদ্বৈতকে প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অদ্বৈতবাদ হিন্দু শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে অন্য কোন প্রকারে জীবাত্মা পরামুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না।"[৪৩]

তৃতীয়ত: রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু নিগমানন্দদেব তাঁর দর্শন ও ধর্ম মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম নির্গুণ কিন্তু ঈশ্বর সগুণ, ব্রহ্ম অব্যক্ত কিন্তু ঈশ্বর ব্যক্ত।

চতুর্থত: রামানুজের মতে আত্মা ব্রহ্মের অংশ। আত্মা অসীম নয়, সসীম। রামানুজ আত্মাকে সর্বব্যাপী বলে মনে করেন না। তিনি চৈতন্যকে আধার স্বরূপ বলেও স্বীকার করেন না। নিগমানন্দদেব আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে রামানুজের এই সকল মতবাদকে স্বীকার করেন না।

৪২। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃষ্ঠা- ১৮৪
৪৩। ঐ, পৃষ্ঠা-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

নিগমানন্দদেবের মতে আত্মা ব্রহ্মের অংশ নয় বরং ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন। তিনি আরও মনে করেন, যেহেতু ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন সেহেতু ব্রহ্মের মত আত্মাও সর্বব্যাপী। তিনি রামানুজের মত চৈতন্যকে আত্মার নিত্য গুণ বলে মনে করেন না। তাঁর মতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ গুণ।

পঞ্চমতঃ রামানুজ জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী নন তাঁর মতে দেহ থাকলে বা দেহ ধারণের সম্ভাবনা থাকলে মুক্তি সম্ভব নয়। মুক্তি বলতে তিনি বিদেহী মুক্তিকে বুঝিয়েছেন। রামানুজ আরও বলেন, মুক্তি লাভের পরও জীবাত্মা ব্রহ্মের সাথে এক হতে পারে না, কারণ সসীম আত্মার পক্ষে অসীম ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মুক্তি সর্ম্পকে রামানুজের এই মতবাদ নিগমানন্দদেব স্বীকার করেন না। তিনি জীবন্মুক্তি ও বিদেহী মুক্তি উভয় প্রকার মুক্তিকেই স্বীকার করেছেন। তিনি যে জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর অন্যতম প্রমাণ হলো – তিনি নিজেকে জীবন্মুক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুক্তির পরেও জীবাত্মা ব্রহ্মের সাথে এক হতে পারেনা, রামানুজের এই উক্তির বিরোধিতা করে নিগমানন্দদেব বলেন, মুক্তির পর আত্মা পরমত্মাতে লীন হয়ে যান, যেহেতু আত্মা পরমাত্মার মধ্যে কোন ভেদ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আমাদের সময়ে নিগমানন্দ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা ও উপসংহার

বিদ্যা-বুদ্ধি-বল-অর্থ-প্রাচুর্য-স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা জগতে যা কিছুই চাই না কেন বা চাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিনা কেন মূলে কিন্তু একজন খাঁটি মানুষ তৈরি হয়েই তা উপভোগ এবং বিনিয়োগ করা। জ্ঞানানুশীলন চার দেয়ালে সীমিত রেখে স্বস্তি পায় না ও প্রেমানুশীলন এ-দুটিকে আশ্রয় ও লক্ষ্য করেই তার পথ চলা। মানুষ তার জানায় অদম্য ইচ্ছাকে শুধু ইন্দ্রিয়ের । বরং আবার সে যা পায় তাতে মানুষ হতে পারে না। এই চাওয়া এবং পাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণই মানব জীবন সাধনা। শ্রী নিগমানন্দের জীবন-দর্শন এখানেই তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রী নিগমানন্দদেব সহজ অর্থে সাধারণ মানুষের পর্যায়ভূক্ত হলেও তিনি ছিলেন অতিমানব। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ মানবদরদী। তাঁর দর্শন ছিল জ্ঞান ও প্রেমের মিলন। তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজীবন প্রেমকে কন্যার মত বুকে ধারণ করেছিলেন। আবার তিনি যে মানবতাবাদী ও সমাজ কর্মী ছিলেন না এমনও নয়। সাধারণ মানুষের জন্য ছিল তাঁর গভীর দরদ তিনি, বিপদে-আপদে, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলকে উদারভাবে। সমাজকে কুসংস্কার ও কলুষমুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের নৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য।

শ্রীনিগমানন্দ উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। কারণ সাংসারিক বিপর্যস্ত পিতার দুঃখ দৈন্য তাঁকে বাস্তববাদী করে গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল। তাঁর জন্ম কুষ্ঠিতে ছিল রাজ-জীবন নয়তো ধর্ম প্রাণতা ও সন্ন্যাস যোগ। এই কারণে পিতৃ ইচ্ছায় তিনি বিবাহিত হন অপরিণত বয়সে। তাঁর পিতার সন্দেহ ছিল সময় মত সংসারী না করলে একদিন সে সংসার ত্যাগ করে চলেও যেতে পারে। পিতার ইচ্ছাকে রূপ দিতেই তিনি হন কঠিন বাস্তবাদী। প্রথম জীবনে তিনি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও কর্মবীর ঈশ্বর চন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও তাঁর বাস্তবতার অন্যতম প্রতীক রূপে সহায়ক ছিলেন তাঁরই সহধর্মিণী শুধাংশু বালা দেবী। স্ত্রীকে তিনি দেবীর মত ভালবাসতেন। একজন সপ্তদশ বর্ষীয় পুরুষের সাথে একাদশবর্ষীয়া স্ত্রীর প্রেম কামগন্ধহীন বললে অত্যুক্তি হবেনা। প্রেমেরই সঞ্চার ছিল বরং সেখানে দ্বিগুণ। অল্পবয়সে মাতৃবিয়োগ এবং স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে অন্ধকারে পথহারার মত দিশাহারা হলেন নলিনী (বাল্য নাম) কিন্তু ভালবাসাকে বিসর্জন দিতে তিনি হলেন পরাঙ্মুখ। এই ভালবাসা কিরূপ? শ্রীনিগমানন্দ তাঁর 'সুধাংশুবালা' উপন্যাসে কবিপ্রতিভা দ্বারা বিকশিত করেছেন, যথা–

স্বর্গীয় জিনিষ প্রেম পৃথিবীর নয়,
পরশপাথর তুল্য জানিবে নিশ্চয়,
হৃদয় লৌহতে স্পর্শ করিলে এমনি,
উজ্জ্বল সুবর্ণ কান্তি ধরে তা তখনি।
অনুরাগ, অভিমান, আবেগ, আদর,
প্রেমের সহিত বাস করে নিরন্তর।
যে সূতাতে বাঁধা প্রেম তাহা অতি ক্ষীণ,
সামান্য কারণে হয় প্রণয় মলিন।[১]

এই ভালবাসা কী জিনিস আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ ঠিক করে বলতে পারেনি। এই আকর্ষণ কেন, কিসের, কেউ জানেনা। শুধু এটুকুই বুঝা যায় যার সাথে যার মনের যত মিল তার সাথে তার তত ভালবাসা। মানুষ মাত্রেই যে ভালবাসার দাস একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে ভালবাসার উৎপত্তি কিসে তার লক্ষণ বুঝে এই টুকু অনুভূত হয় যে প্রেম, শ্রদ্ধা, বাৎসল্য, ভক্তি, দয়া, মায়া সমস্তই এই ভালবাসা হতে উৎপন্ন। আর ভালবাসার স্বরূপ রূপে শুনা যায় ভালবাসলে মানুষ সুখি হয়, ভালবাসায় দু'য়ে এক হয়, প্রাণে স্ফুর্তি হয়, চক্ষে জ্যোতি হয়, মুখে কান্তি হয়, বুকে বল হয়, আরও শুনেছি

১। সুধাংশু বালা, নলিনী কান্ত চট্টোপাধ্যায়, ,,কোকিলা মুখ, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হতে প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ ১৪১৪, পৃষ্ঠ-৫২

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসায় পশু মানুষ হয়, মানুষ দেবতা হয়, কণ্ঠে সঙ্গীত স্ফুরে, ওধরে হাসি ফোটে, চোখে তড়িত ছোটে। ভালবাসা সমান সমানে। যাকে ভালবাসি সে উচ্চ আমি নীচ- এটি কৃত্রিম ভালবাসা। অত্র গবেষণা পত্রের অন্যত্র শ্রী নিগমানন্দ এই দিব্য প্রেমকে জীবন্ত বাস্তব রূপে কিভাবে লাভ করেছিলেন তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

শ্রীনিগমানন্দের জীবন প্রথমার্দ্ধে শুধুই বিমূর্ত তত্ত্বানুসন্ধান ছিলনা। তিনি চেয়েছিলেন সার্থক ও সফল একটি জীবনযাত্রা। চাকুরিতে যোগ দিয়ে বাস্তবতার গভীর নিরিখে সংগ্রামী তিনি হয়ে উঠেছিলেন। বাল্য জীবন থেকেই তিনি ছিলেন কর্মনিষ্ঠ কর্তব্য পরায়ণ, পরোপকারী, মানবদরদী, সমাজের অন্যায় অনাচারের বিরোধী। যারা আচারস্বর্বস্ব ভন্ড ব্যক্তি তাদের প্রতি তাঁর ছিল উপেক্ষা ও ব্যঙ্গোক্তি। সত্যকে তিনি ভীষণ সম্মান দিতেন। এজন্য কোন অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার এবং দৃঢ়চেতা। সমাজপতিদের অন্যায় মীমাংসা তিনি জীবনে কোন দিন মেনে নেন নি। আচারপরায়ণ নৈষ্ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণ কখনো অশুচি পতিত শূদ্র জাতিকে স্পর্শ করবে না, সমাজ পতিদের এই বিচার বা ধর্মানুশাসন তিনি কখনও মনে-প্রাণে স্বীকার করেন নি। অন্তজ জাতির এক মৃতাকে শত বাঁধা ও আপত্তি সত্তেও এমন কি সমাজ থেকে বয়কট করার ভয় থাকা সত্ত্বেও তিনি উক্ত পতিতাকে নিজ কাঁধে বহন করে তাঁর সৎ কাজ করতে কোন বাঁধা মানেননি । নববধুর প্রতি শাশুড়ির অন্যায় অত্যাচার সেকালে সমাজে উল্লেখযোগ্য ছিল। অর্থাৎ গুরুজন ব্যক্তি হিসেবে শ্বশুর বা শাশুড়ি যে আদেশ করবেন তার পুত্রবধুর জন্য সেই মঙ্গল এবং এই তার ধর্ম ও কর্তব্য। এ সমস্ত ফতুয়া বলবতী থাকলেও শ্রীনিগমান্দ সেই দজাল শাশুড়ীকে ক্ষমা করেননি। বরং তিনি রক্ষা করেছিলেন সেই অপরিচিত নববধুকে। 'তোমার মেয়ে হলে তুমি কি পারতে এইভাবে তাকে মারতে'? এই ছিল মানবতাবাদী নিগমানন্দের চরিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল নিগমানন্দের প্রাণের আবেদন। চরিত্র প্রধান সুশিক্ষা অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে স্বয়ং শিক্ষাদাতা সেজে তিনি সমাজে শিক্ষার মান অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীদের জন্য শিক্ষার আলো জ্বেলে দিতে তিনি ছিলেন একজন সক্ষম ব্যক্তিত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজপতিদের বহু অন্যায় ধ্যান ধারণাকে ধুলিসাৎ করে তিনি অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষার সাথে সাহিত্য সংস্কৃতির যে গভীর যোগ তা তিনি প্রাণে-প্রাণে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি 'শোভাবিলাপ বা তরুনীসেন বধ' নাটক লিখে এবং নিজে অভিনয় করে সমাজকে নৈতিক শিক্ষাদানে শিক্ষিত করতে অগ্রনি ভূমিকা পালন করেছিলেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে বঙ্গসাহিত্য সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল রূপে অনন্য অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর স্বরূপ শুধাংশুবালা নামে একটি উপন্যাস লিখে তিনি সমাজে প্রকৃত প্রেমভালবাসার যে কত অভাব তা দূরিকরণের সহায়ক হিসেবে সচেষ্ঠ ছিলেন। ১৩০৬ বঙাব্দে এন, কে শীল এন্ড কোং কর্তৃক উপন্যাসখানি প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও ১৩০৩ থেকে ১৩০৭ বঙাব্দ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় বিদ্বোৎসমাজে সাহিত্যিক রূপে স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুধাংশুবালা উপন্যাসখানি বঙ্গীয় সাহিত্য ভান্ডারে একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হিসেবে সুপরিচিত। সুধাংশুবালা উপন্যাসে বঙ্কিম প্রভাবের ঘনিষ্ঠ ছাপ পরিলক্ষিত হয়। কাহিনীকে পরিচ্ছেদে বিভক্তি করণ, এই বঙ্কীম রীতিও সুস্পষ্ঠ দেখতে পাই। কিন্তু এই অল্প বয়সে যে ভাব ভাষা নৈপূণ্য এবং দূরদর্শীতার পরিচয় উক্ত উপন্যাসে পরিদৃষ্ট হয় তাতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। তাঁর স্বরচিত কবিতায় যোজনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। একজন সফল সাহিত্যকের সুফল রূপে তাঁর ৩১/৮/৭৪ ইং সালে 'সুধাংশুবালা' উপন্যাসখানি জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থান ও অনুমোদন লাভ করে। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন- তাঁরই ঐতিহাসিক মূল্য এখানে প্রমাণ লাভ করেছে। এছাড়াও 'চারুবালা' নামে আরো একটি উপন্যাস 'শোভাবিলাপ বা তরণীসেন বধ' নামক গীতি নাট্য, 'মর্মগাথা' নামে একটি গাথা কাব্য, শিবঠাকুরের নিকে নামে একটি প্রহসন তাঁর সাহিত্য জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা ছিল তাঁর অঙ্গের বিবেক ভূষণ। কোন অনৈতিক অনুদার কর্মকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। এর জন্য তাঁকে সমাজপতিদের অনেক বাধা ও আক্রমণাত্মক রোষে পড়েও পিছপা হতে দেখা যায় নি। ভয় ও দুর্বলতা তিনি জানতেন না। অদম্য সাহসী ও দৃঢ়চেতা মনোবলের অধিকারী ছিলেন তিনি। 'হবে না' একথা তিনি নীরবে বা কারো অনুশাসনের ভয়ে মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন না। প্রযত্নতা-কে অস্বীকার করে তিনি কারও কৃপাভিখারী হওয়াকে পছন্দ করতেন না। যে কেউ যেখানে যা অপারগবলে প্রত্যাখ্যান করতেন তিনি সেখানেই উপস্থিত হয়ে তা করার জন্য অগ্রবর্তী হতেন। তিনি যতক্ষণ অপারগতায় ক্লান্ত বোধ না করতেন ততক্ষণ তার পিছু ছাড়তেন না। শেষ দেখাটি ছিল তাঁর দৃঢ়চেতা মনের অদম্য পিপাসা। যারাই নিরাশ্রয় ও শরণাপন্ন হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন তারাই তাঁর মহত্ব ও দয়ার দানে পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। জীবন-দর্শন তাঁর কাছে বড় দর্শন ছিল। নিছক ভাববিলাসিতার পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না কখনও।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর জ্ঞাতি দাদু ছিলেন। নলিনীরূপে তিনি তাঁর আদর্শকে এবং দর্শনকে প্রথম জীবনে মনে প্রাণে গ্রহণ করে ভাববাদীয় দর্শন ও ধর্মকে উপেক্ষা করতে শিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তিতে নিগমানন্দ রূপে উক্ত আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ভারতীয় ইতিহাস দর্শনে যদিও অধ্যাত্মবাদের ভূয়সী প্রশংসা, একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও তাঁর মনকে ঐ দর্শন তখনও সেদিকে কেড়ে নিতে পারেনি। যুক্তিবাদকে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই কোন কাজ বিনা যুক্তিতে গ্রহণ করেন নি। কাজটির ভূত-ভবিষ্যৎ, নৈতিকতা, মানবিকতা, যুক্তিবিচার, বিশ্লেষণ করেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অন্ধবিশ্বাসে কোন কাজ করতেন না, আবার জাতীয় ধর্ম বর্ণগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যে উপেক্ষা অবহেলা করতেন তাও নয়। যেমন উপনয়ণে সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ করে যজ্ঞপোবিত ধারণ ধর্মের অঙ্গ বা অনুশাসিত নিয়ম। তা তিনি মনে-প্রাণে পালন করেন। কিন্তু তিনি যখন পর্যালোচনা করে দেখলেন এই সূত্র ধারণ করে কী হবে? কী আছে এই সূত্রের ভিতর? কেন এর ব্যবহার? কেন এত নিয়ম কানুন অনুশাসন এই প্রশ্নগুলি তাঁকে আলোড়িত

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলিত করতো। যখন কোন উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ও সদোত্তর কারো কাছ থেকে বা দীক্ষাচার্যের কাছ থেকেও পেলেন না তখনেই তিনি তা পরিত্যাগ করেন, এরজন্য কোন ধর্মভয় বা পাপভয় তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি কঠোর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জীবন সংগ্রামে ব্রতী ছিলেন। নৈতিকতা ছিল তাঁর আদর্শ। ধর্মকে তিনি উপেক্ষা না করলেও ধর্মান্ধতার প্রতি ছিল তাঁর তীব্র প্রতিবাদ যা বর্তমান সময়ের অনেক চিন্তাবিদ্ ও বুদ্ধিবিদের মধ্যে খুঁজে পাই।

ভবিতব্য সম্বন্ধে মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অনেক অগ্রবর্তী হলেও নীরেট ভবিষ্যত সে জানেনা। প্রকৃতির নির্মম পরিণতি ও পরিহাস অনেক বাস্তব জীবনকেও বদলিয়ে দেয়। তাঁর প্রেমের রাণী (সুধাংশুবালা), তাঁর জীবনে এমনি একটি পরিবর্তন ও পরিণাম। তাঁর অকাল মৃত্যু তাঁর জীবনকে আমূল পরিবর্তন করেছিল। যে অসম্ভব অলৌকিকতাকে তিনি জীবনে কোন দিন সহজে স্থান দিতেন না সেই অলৌকিক আকস্মিক পরিবর্তনই তাঁকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী জীবন সেই অলৌকিকেই ভরে উঠেছিল। তিনি যতই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ততোই বাধ্য হন তা নানা ভাবে গ্রহণ করতে। লৌকিকের মত অলৌকিকও যে সত্য, তাঁর জীবন দর্শন তাঁকে তা মানতে বাধ্য করে। বিজ্ঞানের সমাধান– যে মরে যায় তাঁর শেষ সেখানেই হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ও পূণর্জন্মের সূত্রপাত সেখান থেকেই শুরু হয়ে তাঁর সামনে হাজির হয়।

শেষ যে শেষ নয়, শুরু যে শেষেরই উত্তরণধারা তাই তাঁর জীবনে অনাহুত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর মৃতা স্ত্রী তাঁকে বারবার জীবন্তরূপে দর্শন দিয়ে তাঁর বাস্তবতার সমস্ত শিক্ষা ও সমীক্ষাকে উলটে দেয়। তিনি আশ্চর্য হয়ে জানতে চান এও কি সম্ভব? এ আমার ভাবাবেগ না ভবিতব্য না– অন্য কিছু? এই ভবিতব্য বা অন্য কিছুই এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের ধারক বাহক পালক ও পরিচালক নামে কোন এক পরম সত্তা শক্তি, যা ধর্ম জানান দেয় দাবী করে। তিনি খুঁজে দেখতে শুরু করলেন প্রাচীন ভারতের বেদ, উপনিষদ ও সে সাথে গুরু, যোগ, জ্ঞান, তন্ত্র, প্রেম, ও কর্মের পিছনে দাবীকৃত নিহিত সব তত্ত্ব। যে কোন বিষয় জানতে চাইলেই তার প্রমাণের জন্য তৎপদ্ধতি ও নিয়ম

Dhaka University Institutional Repository

নীতি মেনে চলতে হয়। বস্তুবিজ্ঞানীগণ কিন্তু ধর্মের বিভিন্ন কৃচ্ছ পদ্ধতি মানতে রাজীও নন বা স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হন বরং উপেক্ষণীয় বলেই গণ্য করে বেশি। বস্তুবাদী নিগমানন্দ এখানে ব্যতিক্রম। যে কোন পদ্ধতির সত্যকে বরণ করতে তাঁর কোন দ্বিধা ছিলনা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি তিনি ছিলেন ভীষণ সাহসী ও জেদী মনোবলের অধিকারী। যত কঠিনই হোক কিন্তু তা তিনি প্রমাণ বা তার শেষ না দেখে ছাড়তেন না। এই মনোবলের কারণে তিনি একদিন বিশ্ববিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিবাদী মন তাঁকে ভাবিত করে তুলে– যে মৃত সে জীবিত হয়ে কথা বলছে – অমরত্ব কি একেই বলে? প্রশ্ন জাগলো; তাহলে মৃত্যু হল কার? কে মরে গেল, কে জীবিত থাকলো? জীবন জিজ্ঞাসায় তিনি হলেন বাউল। খুঁজতে খুঁজতে পেলেন– 'আত্মা' অবিনশ্বর , জীব দেহ নশ্বর। এই আত্মাই বিশ্বব্রহ্মান্ডের একমাত্র কর্তা। এই একক সত্তাই রূপ নেয় বহুর। আবার বহু তার অস্তিত্বকে খুঁজে পায় একের মধ্যে।

শুরু হল তার নূতন জীবন জিজ্ঞাসা । বহুর এই অন্তরতম ঐক্যের ভিত্তিতেই এই জগৎ ও জীবনকে জানার জন্য শুধুমাত্র উপদেশ শুনেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, চেষ্টা করলেন জানতে– ভারতীয় ধর্ম দর্শনের যোগ, জ্ঞান, তন্ত্র ও প্রেম এই সার্বভৌম চারিটি কঠোর সাধন পদ্ধতি এবং সেই দাবীকৃত সত্যের মত-পথের দিক্‌দর্শনগুলি। চারজন উপযুক্ত গুরু পেয়ে তাঁদের নির্দেশেই তিনি হলেন মহামানব জীব্‌ন্মুক্ত পরহমংস ও সদ্‌গুরু। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হল তাঁর যোগের চরমফল নির্বিকল্প সমাধি মাধ্যমে। যে জীবন বাস্তবতার নিরিখে শুরু হয়েছিল তাঁর একদিন, আজ ভাবরাজ্যে তাই ফিরে পেয়ে তিনি দেখলেন জগতের নূতন রূপ নূতন জীবন। সাধারণরা যে দৃষ্টিতে দেখে হন আপ্লুত, তিনি তাই দেখে হন পরিপ্লুত। বৈষম্যের মাঝে যে কী অপরূপ সুসম্যতা তা দেখে এই মরজগতেই তিনি অমরত্ব লাভের অনিবার্যতায় মুগ্ধ হলেন।

যেই মানুষকে দুঃখ দৈন্য কষ্ট ব্যথা বেদনা এক সময় করতো অধৈর্য আজ সেই দুঃখ দৈন্য কষ্ট তাঁর অন্তরে জেগে বলে উঠল এ কষ্ট এ দুঃখ এ মৃত্যু নয়, এ আনন্দ অমৃত। অমৃতকে চাইলে যে

Dhaka University Institutional Repository

এই কষ্ট যাতনারূপ মৃত্যুর ভিতর দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। এই কষ্ট দুঃখ যাতনা ও মৃত্যু মানুষের প্রকৃত কষ্ট দুঃখ ও জীবন যাতনা নয় বরং আনন্দ লাভেরই জন্য এই মৃত্যু এই যাতনা। মুক্তিরূপ আনন্দকে পাবারই জন্য এ পথের এই জীবন যন্ত্রণা ।

বাস্তববাদীদের মতে এই যুক্তি, চিন্তা-চেতনা যদিও মুল্যহীন, কারণ ভবিষ্যতে পাব এমন অন্ধ আশা নিয়ে সারা জীবন যাতনার স্বীকার হওয়া মূখতারই শামিল। কিন্তু এও সত্য, উপস্থিত সুখ মানুষ অন্তর থেকে কখনও পছন্দ করেনা। মানব চায় চির সুখ। যা পাব তা কি হারাবার জন্য? কিন্তু পরিণামী জীবন কি সেই অপরিমিত সুখ দিতে পারে?

বেদান্তের চারিটি মহাবাক্য যথা– 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম), 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (আমার আত্মাই ব্রহ্ম), 'প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম' (জ্ঞানই ব্রহ্ম), 'তত্ত্বমসি' (সেই আমি, আমিই সেই) তাকে ভাবিয়ে তুললো। শ্রী নিগমানন্দ জ্ঞানী গুরু সচ্চিদানন্দজীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা– 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্য লাভ করার পর যোগীগুরু সুমেরুদাসজীর অনুকুলে যোগের পথ ধরে তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। এই সমাধিতে পৌছলে আত্মসত্তা বিশ্বসত্তায় বিলীন হয়। তখন কোন উপাধি থাকে না, নিরূপাধিক বনে যান। ব্যক্তিত্ব বিসর্জন হয়ে শুধু 'আমিই ব্রহ্ম' এই বোধ প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই মহাসমাধিতে শ্রী নিগমানন্দেরও ইন্দ্রিয়গত নশ্বর দেহ পড়ে রইল এই ভূমার ভূমিতে কিন্তু তাঁর 'বোধে-বোধ' এই উপলব্ধিসত্তা শুধু রইল জাগ্রত প্রত্যক্ষ হয়ে। এই বার সেই ভূমা নেমে আসলেন তাঁরই পরিত্যক্ত পরিশুদ্ধ পবিত্র দেহকে আশ্রয় করে; হলেন তিনি নিগমানন্দ। ধর্ম বিজ্ঞানের দুটি ধারার মধ্যে এটি হল অবরোহ ধারা আর সাধক যখন সাধন দ্বারা উপরে ক্রমে ক্রমে উঠেন সেটি হল আরোহ ধারা। তিনি দুই ধারার দুটি বিদ্যাতেই ছিলেন পারদর্শী। সহজেই তিনি সমাধিস্ত হতে পারতেন আবার ফিরতেও পারতেন অনায়াসে অপার অনুভূতি নিয়ে। তিনি কেন নিগমানন্দ? কী তার তাৎপর্য? আলোচনা করলে দেখতে পাব 'নিগম' অর্থ 'বেদ;' বেদ অর্থ অপৌরুষেয় অপরোক্ষ অচিন্তনীয় মহাজ্ঞান। এই জ্ঞানযুক্ত প্রেমরূপ আনন্দ যোগে তিনি এবার হলেন নিগমানন্দ। এই

Dhaka University Institutional Repository

মহাআনন্দকে তিনি আরও খুঁজে পেলেন বিশ্বস্রষ্টার এই সৃষ্ট জীবজগতে। তিনি ভালবাসলেন জগৎজীবকে। নিবেদিত হলেন তাদের কল্যাণে। শুধু আর্থিক কল্যাণেই নয়, পরমার্থিক কল্যাণেও। এই হল মুক্তি চির সুখ লাভ। কারণ প্রকৃত কল্যাণ শুধু ব্যক্তির বাঁচার সহায়তা দান করা নয়। সাথে চাই প্রকৃত কল্যাণরূপ 'জ্ঞান' দান। অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান করাই প্রকৃত কল্যাণ। বর্তমানে জ্ঞান দান করা বললে যা বুঝায় তা জ্ঞান নয়, তাঁর নাম বুদ্ধি বা কৌশল । প্রকৃত জ্ঞানে বুদ্ধির মৃত্যু; থাকে বোধি, জাগে আনন্দ এই আনন্দই হল প্রকৃত জ্ঞান এবং জ্ঞানই হল প্রকৃত আনন্দ। যা শ্রীনিগমানন্দের জীবনে আজীবন বাস্তবরূপ ধারণ করেছিল।এখানেই তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব যা আমাদের জীবন দর্শন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যে প্রজ্ঞাঘন দৃষ্টিতে শ্রীনিগমানন্দ সর্বত্র সারাক্ষণ দেখছেন, জীব তার স্বরূপ ভুলে অজ্ঞান আমিকে আশ্রয় করে– নিয়ত কষ্ট দুঃখের স্বীকার হচ্ছে, যদি তার স্বরূপ তাকে জানিয়ে ও দেখিয়ে দেওয়া যায় তবে এই নিছক দুঃখকে সে কখনও দুঃখ বলে গ্রহণ করবেনা । এই প্রকৃত কল্যাণ ও পরমানন্দ দান করার জন্যই তিনি বর্তমান সমাজের প্রতি দৃষ্টি ফিরালেন। দেখালেন ব্যক্তি গঠন না হলে পরিবার গঠন সম্ভব নয়। পরিবার জাগ্রত না হলে সমাজ জাগবেনা। সমাজ না জাগলে দেশ জাতির জীবনেও শান্তি ফিরে আসবেনা।

আজ সারা পৃথিবী মানবিক মূল্যহীনতার স্বীকার হয়ে উঠেছে । 'কত দুঃখ , কত ক্লেশ, কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু,নাহি তার শেষ।' অফুরন্ত চাহিদার দাবদাহে প্রকৃতিও বিপর্যস্ত। দেখতে পাচ্ছি নিত্য আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বৈশ্যিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তন , মহামারী আরও কত না প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সভ্য বলে দাবীদার এযুগের মানুষ নিয়ত পরিণত হচ্ছে অসভ্য অমানুষে। খবরের কাগজ খুললেই প্রমাণ মিলে – শুধু খুন, জখম, ধর্ষণ, ছিনতাই, নির্যাতন, অপহরণ,রাহাজানি, লুণ্ঠন। এইহল সভ্য মানব সৃষ্ট পাপ হিংস্রতার মর্মান্তিক দৃশ্য। অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। সমস্যা নিরসনে সমাধানের পথ খুঁজে বের করলেন 'আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন'। ত্রিশ

Dhaka University Institutional Repository

বছর ধরে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম পূর্বক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। সত্য সংবাদ দান করে গৃহস্থকে উদ্‌বুদ্ধ করতে লাগলেন। তাদের শেখালেন দম্পতির আদর্শ জীবন যাপনের ক্রিয়া কৌশল। শিখালেন নিজ পরিবার গঠন প্রণালী। সংসার দাবদাহ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী এ প্রশ্নের উত্তরে? উপদেশ দিলেন এই মর্মে "তোমরা আদর্শ গৃহী হও এই আমার কামনা। মনে রেখ! আদর্শ গৃহী ও সন্ন্যাসীতে কোন পার্থক্য নাই।"[২] 'উভয়ে মিলেমিশে পশুভাবের পরিবর্তে প্রেমভাব বিকাশই দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা।' একজন আদর্শ পিতামাতা একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও বটে। পারেন শত পুত্রের অভাব এক পুত্রে মিটাতে। 'এক চন্দ্রস্তমোহন্তিন চ তারা গণৈরপি।' এক চন্দ্র যেমন শত শত তারা ও নক্ষত্র অপেক্ষাই জগতের অন্ধকার দূর করতে সক্ষম; তদ্রূপ বংশ রক্ষার্থে, সৃষ্টি রক্ষার্থে, দেশ-জাতি-সমাজ রক্ষার্থে তোমরাও চন্দ্রের মত একটি শুভ্র স্নিগ্ধ আলোক উজ্জ্বল জ্ঞানী সন্তান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। যে নাকি শত শত তারা-নক্ষত্র রূপ সন্তানের উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে দিতে পারে। এই ছিল শ্রী নিগমানন্দের প্রাণের দাবী।

সংসার জীবন শুধু ভোগের জীবন নয়, জৈবিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়। সংসার জীবন একটি ব্রত বিশেষ। পুত্রোৎপাদন হল একটি যজ্ঞ বিশেষ, আহুতি হল বীর্য রূপ ব্রহ্ম বিশেষ, হবি হল জীবন যজ্ঞের অমৃত ফল চন্দ্রের মত উজ্জ্বল একটি জ্ঞানী পুত্র লাভ। বিবাহিত জীবন স্বেচ্ছাচারীর জীবন নয়, পূর্ণ সংযমের জীবন। প্রতিমাসে একদিন শুধু নারীর ঋতু রক্ষা করবে। এই ছিল ভারতীয় বৈদিক সনাতন ধর্মের আদর্শ ও অনুশাসন। ভাবভেদে একটি নারী কন্যা, জায়া, জননী। সে শুধু স্ত্রীই নয়, সহকর্মিনী ও সহধর্মিনীও। এই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যুগে যত ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে তা নিশ্চই অনেক ত্যাগ তপস্যা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে। অতএব ভোগ্য বস্তুও তপস্যা লব্ধ। ভোগ করতে চাইলেও প্রথমার্দ্ধে ধৈর্য রূপ ত্যাগব্রত চাই। খেয়াল খুশিমত কোন বস্তু ভোগ সম্ভব কি? নিশ্চই নয়। শ্রী নিগমানন্দ তাঁর অনুগতদের কঠোর অনুশাসন বাণী জানালেন– বৈদিক যুগের ঋষিদের মত

২। পূর্বোক্ত, আদর্শ গৃহস্থ্য জীবন গঠনে শ্রী শ্রী ঠাকুর, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

তোমরাও আদর্শ গৃহস্থ হও। 'ঋতুকালে সঙ্গং ভবতি। শুধু নারীর ঋতু রক্ষা কর। ঋতু কালে ধর্ম রক্ষার্থে পুত্র কামনায় স্ত্রী সহবাস ব্যতীত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ সহবাস বেশ্যাগমনের তুল্য। সস্ত্রীকং ধর্ম মাচরেৎ – স্বামী স্ত্রী উভয় মিলে ধর্ম আচরণ কর। এক ধর্মই তোমাদের সব রক্ষা করবে সব দিবে। শুনালেন ঋষিদের বাণী–ত্যান তক্তেন ভুঞ্জিথা- যা কিছু ভোগ করবে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। ভোগের জন্য ভোগ নয়, ত্যাগ করেই ভোগ বাঞ্চনীয়। আরও শুনালেন, কর্ম ভূমিম্ ইমাম প্রাপ্য কর্তব্যম কর্ম যৎ শুভম্ । যখন এই কর্ম ভূমি ঈশ্বর কর্তৃক পেয়েছ তখন এখানে শুভ কর্ম করাই তোমার কর্তব্য।

"বিবাহিত জীবন বা গার্হস্থ ধর্ম স্বেচ্ছাচারীর নহে। গৃহস্থ হইয়াই পূর্ণ সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। আদর্শ গৃহস্থ হইতে চাইলে, কিছু দিন দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করিবে। অন্যত্র বলেন–লোকে স্ত্রীকে বিলাসের উপকরণ মনে করিয়া সুফল বঞ্চিত হয়। জীবন অশান্তিময় করিয়া তোলে। উভয়ে সংযত হইয়া ভক্তের মত জীবন যাপন করিতে পারিলে দাম্পত্য জীবন মধুময় হয়। আদর্শ গৃহস্থ হইয়া সংসার সমাজের প্রভূত উপকার করা যায়।"[৩] এভাবেই তিনি তাঁর দর্শন দ্বারা তৎকালীন সমস্যাগুলি নিরসনের প্রতি জোর দিয়ে গেছেন। সনাতন বৈদিক ধারাই হল নিগম ধারা। শ্রীনিগমানন্দ সনাতন ধর্ম প্রচার করতেই এসেছিলেন। 'প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।' সন্তান ধারা রক্ষা করা ছিল যেমন বৈদিকধারা অনুরূপ নিগমানন্দের আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন ধারা। তিনি সংসার ধর্ম রক্ষাকেই জোর দিয়েছেন বেশি। গার্হস্থ আশ্রম জেষ্ঠ্য ও শ্রেষ্ঠ আশ্রম। সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা এই আশ্রমে রক্ষা লাভ করেছে। এই আশ্রম থেকেই অপর আশ্রমগুলি পরিপূর্ণতা ও পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

'বিবাহ' শব্দটি এসেছে বি-পূর্বক বহ ধাতু + ঘঙ্ প্রত্যয় করে। অর্থাৎ যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীলোক বা যে কোন স্ত্রীলোক যে কোন পুরুষকে বিশেষ ভাবে আজীবন বহন করার(পরস্পরকে সাহায্য করার) উদ্দেশ্যে দেবতা, অগ্নি, গুরু, পুরোহিত এবং কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাক্ষী

৩। পূর্বোক্ত, আদর্শ গৃর্হস্থ্য জীবন গঠনে শ্রী শ্রী ঠাকুর, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

রেখে পুরোহিত দ্বারা বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক একতা সূত্রে বন্ধনের যে স্বীকৃতি তাই বিবাহ। নিশ্চয়বিবাহিত জীবন তাহলে বর্তমান যুগের আইনানুগ সামান্য কার্যকলুষিত চুক্তিভিত্তিক বিবাহ ব্যবস্থা নয়। ইচ্ছা হল গ্রহণ করলাম ইচ্ছা হল ত্যাকরলাম। এমন স্বেচ্ছাচারী জীবনের ভয়াবহতা শ্রী নিগমানন্দ সমাজ জীবনে প্রত্যক্ষ করেই আদর্শ গৃহী হওয়ার জন্য প্রাণপাত উপদেশ দিয়ে গেছেন। ধর্মগত বিবাহের তাৎপর্য ও আইনগত অথবা চুক্তি ভিত্তিক বিবাহের তাৎপর্য লক্ষ্য করলেই হৃদয়ঙ্গম হবে বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা কত ঠুনকো কাঁচসম। বিবাহের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হল– পরস্পর পরস্পরকে ধর্ম ভাবে বহন, পালন ও রক্ষণ। মিলে মিশে জীবন যাপন। পরস্পর পরস্পরের দোষ গুণ আলোচনা সংশোধন ও সংবর্ধন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার রক্ষা ও প্রতিপালন। উদ্দেশ্য হল দেবোপম একটি সন্তান লাভ করে সমাজে উপহার দান।

বর্তমান সময়ে সমাজের দূরবস্থা দেখে শ্রীনিগমানন্দ তাই সকলের কাছে আহ্বান জানালেন– "আমি চাই-ধর্মের মধ্য দিয়ে এই অধ:পতিত জাতিকে উঠিয়ে তুলতে, এদের মধ্যে সেই ঋষি যুগের মহান্ আদর্শগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে, সে যুগের ঋষিদের মত মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ দান– আত্মার স্বরূপজ্ঞান দান করতে।"[৪] ঋষিদের আবিস্কৃত মহান দর্শন ছিল, 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা সর্বভূতাত্মমদাত্মৈ ব।' 'আমার আত্মাই সর্বভূতের আত্মা, সর্বভূতের আত্মাই আমার আত্মা।' এক পরমাত্মাই জীবে জীবে বহু আত্মা। অতএব আত্মায় আত্মায় মিলনই হল দার্শনিক ঋষিদের বিবাহ ব্যবস্থা। এই মূল সুরকে লক্ষ্য করে সনাতন ধর্মে বিবাহ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ক্রমবিবর্তনের ফলে অনেকাংশ ক্ষয়িষ্ণু হলেও কিছু না কিছু টিকে থাকবেই। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতাকে যতদিন না আমরা অবস্থা বুঝে উপেক্ষা না করবো ততোদিন আমাদের জাতীয় ভিত্তি ও উন্নতি সম্ভব নয়। এশিয়ায় বিশেষত পাকভারত উপমহাদেশে আমাদের জাতীয় ভিত্তি 'ধর্ম।' ধর্ম আমাদের মজ্জাগত জাতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি স্বরূপ। ধর্মকে এখনও ধারণ করেই আমাদের জন্মকর্ম। আমরা যদি

৪। পূর্বোক্ত, আমি কি চাই, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

আজ এই পন্থাকে অস্বীকার করি তবে আমাদের জন্ম কর্ম উভয় মিথ্যা হয়ে যাবে। কারণ যে জাতির জন্ম মিথ্যা তার কর্মও মিথ্যা। সেই জাতির উন্নতি কোন দিন সম্ভব নয়। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ঘৃণা উপেক্ষা করতে বলছি। মানুষ নিজের সত্তাকে কখনও বিসর্জন দিতে পারে না। এই লক্ষ্যে অপরের কাছ থেকে যা গ্রহণ করলে আমার সত্তার উন্নতি হবে তাই গ্রহণ করবো। যা গ্রহণ করলে সত্তার স্খলন হবে তা পরিত্যাগ একান্ত বাঞ্চনীয়। আমার যা নেই তাই নিব, যা আছে তা কেন ত্যাগ করবো? আমরা আজ নিজেদের ঐতিহ্য ও অস্তিত্বকে ভুলে গেছি বলেই আমাদের চরম দৈন্য ও দূর্দশা।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন সম্পর্কে এই অধ্যায়ে শ্রী নিগমানন্দের শেষ ইচ্ছা উপস্থাপন করে জানাতে চাই তিনি বিবাহ মাধ্যমে কিভাবে দেশ জাতি সমাজ ও পরিবার গঠন করতে চেয়েছিলেন–

> আমি চাই তোমরা আদর্শগৃহী হও। শুধু সন্ন্যাসী হয়ে বনে গেলেই ভগবান্ লাভ হয় না। গৃহে থেকে আদর্শ গৃহী হয়ে ধর্ম সাধন করলেও ভগবান্ লাভ হয়। আমি সেই কথাই প্রচার করতে চাই। তোমরা শরীরে মনে ভাবে কাজে চিন্তায় সৎ হও, বলিষ্ঠ হও, গরিষ্ঠ হও, সত্যকে আশ্রয় করে চল – এক সত্যই তোমাদের সব দিতে পারে। সংসারে সব থাকবে –স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই-ভগ্নী, বিষয়-আশয়, বাড়ীঘর, অর্থ নাম যশ কিন্তু তোমরা থাকবে নির্লিপ্ত। তোমরা ভগবানের দাস হয়ে সব তাঁরই জেনে সুষ্ঠুভাবে তাঁরই কাজ করে যাবে। ঘরে বাইরে এসব তোমার বলবে কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে জানবে এরা তোমার কেউ নয়। সব ভগবানের। এই ভাবেই তোমাদের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। এমন মধুর ব্যবহার ও অমায়িক আচরণ তোমরা দেখাবে যেন জগতের সকলেই আদরের এবং ভালবাসার পাত্র হতে পারে। স্ত্রী মনে করবে এমন স্বামী আর হয় না, পুত্র-কন্যা মনে করবে এমন পিতা কারও মিলে না, ভাই মনে করবে এমন দাদা কারও থাকেনা, পিতা-মাতা মনে করবেন এমন পুত্র কারও জন্মে না। বন্ধু মনে

Dhaka University Institutional Repository

করবে এমন বন্ধু কারও হয় না। জমিদার মনে করবে–এমন প্রজা আর নাই, প্রজা মনে করবে এমন জমিদার আর নাই। সংসারে যার যেটুকু পাওনা তাকে কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দিবে। অথচ স্বীয় লক্ষ্য অটুট থাকবে– এই হচ্ছে গৃহস্থের লক্ষণ। আমি সমাজে এই রূপ গৃহস্থ দেখতে চাই।[৫]

নারীদের প্রতি তাঁর উক্তি ছিল–

তোমরা যথার্থ মা হও। মাতৃত্বের সাধনাতেই নারী জন্মের সার্থকতা। সন্তানের মঙ্গল কামনা থাকলে, মাকে অসংযমী হলে চলবে না। রমণীত্ব শয়তানের উচ্ছিষ্ট। জননীত্ব নারী জাতীর অস্তিত্ব ও সতীত্ব। নারীরা যত দিন নিজেকে 'মা' না ভাববে ততোদিন দেশ জাতি সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। মাতৃহৃদয় জাত অস্তিত্ব স্নেহ প্রেম সেবা ভালবাসাই নারী জাতীর প্রকৃত প্রেম-ভালবাসা ও সেবা। রমণী হৃদয় কাম গন্ধশূন্য নয় বলেই মায়ের ভালবাসার অধিকার গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। মা-ই (মাতৃরূপই) জগতে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। রমণী হৃদয় যেদিন মাতৃ হৃদয়ে পুর্ণ হবে সে দিনই নারীজাতির জন্ম সার্থক হবে।[৬]

এই সত্য বাণী প্রচার দ্বারা শ্রী নিগমানন্দ জগৎ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বর্তমান সমাজ জীবন চিত্র সম্পর্কে শ্রী নিগমানন্দের আরও একটি সুষ্ঠু জীবন বিধান তাঁর জীবন দর্শনে লক্ষ্যণীয়। তিনি যখন ভারতের আসাম প্রদেশে কোকিলামুখ নামক স্থানে তাঁর শক্তি সঞ্চার কেন্দ্র (মঠ) স্থাপন করেন, তাঁর প্রকাশিত 'যোগীগুরু' পুস্তকখানি সর্বসাধারণে প্রচার করেন, ভারতে তখন একদিকে যেমন আধুনিকায়নে তীব্র পাশ্চাত্য প্রভাব এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের গরম হাওয়া– **'ধর্ম মাথায় থাক'**। ভারত বাসী যখন বাঁচার জন্য এমন কর্মব্যস্ত তখন ভারতের ঐতিহ্য

৫। পূর্বোক্ত, আমি কি চাই, পৃ. ৪৩

৬। লেখক অজানা, ডায়েরী, দিনাজপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সেবাশ্রম গড়নুরপুর, ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৬

Dhaka University Institutional Repository

আত্ম মুক্তি উপেক্ষিত হলেও প্রকৃত আত্মমুক্তিই যে ভারতের মুক্তি জগতের মুক্তি মাধ্যম জগতহিত ও কল্যাণ–তাঁর উৎসর্গীত 'যোগীগুরু' গ্রন্থখানি ছিল সেই সময় সেই গোপন তত্ত্বসম্ভার ও তথ্য ভান্ডারের যথার্থ নির্যাস যা দেখে দিশেহারাগণ পেয়েছিল তাদের জীবনের প্রকৃত সন্ধান। বহু শিক্ষার্থীর জীবন-জিজ্ঞাসা– 'যোগীগুরুর' যোগ সাধন শক্তির আদর্শকে যে ভাবে তাদের ভিতর জাগিয়ে তুলেছিল প্রেরণা এবং এর পরিণতিতে; ভোগকে অগ্রাহ্য করে ত্যাগ প্রতিষ্ঠা যার মূলধন রূপে ছিল একমাত্র বিজ্ঞান ব্রহ্মচর্য জীবন গঠন, শ্রী নিগমানন্দ এই সুদূর গহীন তপোবনে সেই আদর্শই স্থাপন করেছিলেন এবং এর স্থায়ী একটি দিকনির্দেশনা ও সমাধানের লক্ষ্যে 'ব্রহ্মচর্য সাধন' নামে একখানি অমূল্য পুস্তকও রচনা করেন। বালকদের মন গঠনের সাথে দেহ গঠনের উপায় স্বরূপ এবং ব্যাধি নিরাময়ের উপায় রূপে উক্ত পুস্তকে চিকিৎসা ব্যবস্থাও দান করেন। অর্থাৎ ব্যাধিজনিত দেহ কষ্টের কারণে মন গঠনের যাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না ঘটতে পারে অথবা যারা ভিতরে ভিতরে দেহের জীবনী শক্তি নষ্ট করে ফেলছে কিভাবে তাদের রক্ষা হবে তাও উক্ত পুস্তকে চিকিৎসা অধ্যায়ে উল্লেখ করেন এবং প্রতিকার ব্যবস্থা দান করেন।

তিনি সরলমতি নবীনদের ও শিশুদের জন্য এসব রচনা করে সুশিক্ষা লাভার্থে সুশিক্ষক রূপে নিজে এবং তাঁর আদর্শে তৈরি সুশিক্ষিত অন্তেবাসীদের নিযুক্ত পূর্বক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরা যাতে দেশ জাতির ভবিষ্যৎ সম্পদরূপে আত্মগঠন করতে পারে এবং জীবনের অন্তিম লগ্নে স্বীয় মুক্তি মোক্ষে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে এই আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য প্রযুক্তিগত শিক্ষা-সভ্যতা দেশে এত বেশি উত্তাল তৎসত্তেও তিনি নিজ জীবন দ্বারা পরিক্ষিত ব্রহ্মচর্য ভিত্তিক এই আদর্শ শিক্ষাদানে কোন ভাবে পিছপা হন নি বরং ছাত্রদের শুনালেন–আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারিটি যেমন মানুষের বৃত্তি তেমনি পশুরও বৃত্তি। এই জৈবিক ধর্মগুলি জীবমাত্রেই কম বেশি ভোগ করে। শুধু মানুষই এর ভালমন্দ বিচার দ্বারা উন্নতির শিখরে উঠতে পারে, যা পশুদের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ এ জন্যই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই সৎ শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

দান করেই তিনি নবীনদের সাবধান করলেন–'জীবনং বিন্দু ধারণাৎ মরণং বিন্দু পাতনাৎ ।' অকারণে তোমরা জীবন থাকতে বিন্দুপাৎ করবেনা । এই বিন্দুই তোমাদের জীবনের এক মাত্র আনন্দসত্তা-সঞ্জিবনী শক্তি । তোমাদের জীবনের মূল ভিত্তি । অতএব 'বীর্য ধারণং ব্রহ্মচর্যম্ ।' মানব জীবনের মূল শক্তি বীর্য রক্ষা । বীর্যই ব্রহ্ম । ছাত্র জীবন সংযমের জীবন । এই জীবনে একবার সংযম শিথিল হলে আর উদ্ধারের উপায় থাকেনা । ক্রান্তদর্শী নিগমানন্দের দৃষ্টিতে এটা ফুটে উঠেছিল যার ফলশ্রুতি রূপে তিনি বর্তমানে দেশ জাতি সমাজের এই বিশৃংখল অবস্থাকে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল করতে চেয়েছিলেন ভারতীয় প্রত্যক্ষবিজ্ঞান তথা যোগ সাধনার অমৃত ফল জাতিকে উপহার দেওয়াই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছিনেল । তিনি বিশ্বাস করতেন এই পথেই ভারত স্বাধীনতার চুড়ান্ত ফল লাভ করবে । কারণ স্বাধীনতা অর্জন বড় নয়, স্বাধীনতা রক্ষাই সবচেয়ে বড় । নিজে স্বাধীন যোগ্য না হলে অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে দেশ জাতি তথা সকল কর্মে বিশ্বকর্তার সাথে যুক্ত হতে না পারলে সেই স্বাধীনতা হবে দেশের জন্য কলংক ও ক্ষণভঙ্গুর । শ্রী নিগমানন্দ তাই তাঁর 'যোগীগুরু' গ্রন্থে আহ্বান রেখে দেশের প্রকৃত আদর্শ যুবক সৈনিকদের দেশ জাতি সমাজ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন । প্রকৃত কর্মযোগী তৈরির জন্য তিনি ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন । বীর্য অর্থ হল শক্তি যা মনোবল নামে খ্যাত ও সুপরিচিত । মনোবল যার নেই তার উন্নতিও নেই । পৃথিবীতে যত প্রকার শক্তি প্রকাশ পেয়েছে সকলের উর্দ্ধে মন:শক্তি । একমাত্র এই ইচ্ছা শক্তি দ্বারাতেই অসম্ভব সম্ভব করা যায় । এই শক্তিকে যদি মহাশক্তির সাথে যুক্ত করা যায় - তবেই হবে মানুষ দেবমানব । মানব জীবন হবে তার ধন্য । শ্রী নিগমানন্দ তাই ব্রহ্মচর্য আশ্রম গঠন লক্ষ্যে এই নবীনদের নিয়ে ঐ তারাবন সদৃশ গহীন জঙ্গলে নিভৃতে নিরালায় তাদের আত্মগঠনে আত্মনিয়োগ করেন । তিনি তাঁর ক্রান্তদর্শী দৃষ্টি দ্বারা আরও দেখালেন ভারতের স্বাধীনতা বৃটিশদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হলে পরাশক্তির চেয়ে আত্মশক্তিই চাই বেশি । মন দুর্বল হলে হাজার পারমাণবিক শক্তি গচ্ছিত থাকলেও তার দ্বারা কোন কাজ হবে না । মানুষের সেবক হওয়া খুব কঠিন কাজ । সেবা শক্তির চেয়ে বড় শক্তি আর নেই । আর

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত জগত-সেবক যেহেতু একমাত্র জগদ্দীশ্বর তখন আপন আত্মায় তাঁকে অনুধ্যান করা প্রয়োজন। এ জন্য শক্তিপূর্ণ প্রবল মানসিকতার প্রয়োজন । একমাত্র ব্রহ্মচর্য আচরিত জীবনেই তা সম্ভব। প্রচলিত শিক্ষার সাথে তিনি তাদের প্রকৃত জীবন গঠনে ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, কলা, নন্দনতত্ত্ব, প্রজননতত্ত্ব ইত্যাদি আচার নিয়ম নীতি শিক্ষা ও পালনে ব্রতী করে তুলতে সচেষ্ট হন। চারাগাছ রক্ষার্থে প্রথম শক্ত বেড়ার প্রয়োজন নইলে গরুতে খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার গাছ শক্ত মজবুত হলে তখন সেই গাছের গোড়াতেই উক্ত গরুকে বেঁধে রাখা সম্ভব এবং কোন বেড়ার প্রয়োজন পড়েনা তদ্রূপ তিনি প্রারম্ভে নিয়ম বিধৃত জীবন দ্বারা ব্রহ্মচারী বালক শিশুদের শক্ত মজবুত করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। দেশ জাতি সমাজের উপকার করতে চাইলেও অনুরূপ আত্মশক্তি অগ্রে প্রয়োজন, তবেই সম্ভব মানব সেবা মানব কল্যাণ। গৃহস্থ ভক্ত শিষ্যদের তিনি এভাবে আহ্বান জানালেন–

তোমাদের সন্তানদের তৈরি করার সুযোগ আমাকে দাও। এরা যখন বড় হবে সংসারে যাবে তখন এরা সমাজের এক একটি শক্ত মজবুত খুঁটি হবে। তখন তোমরা শান্তিতে তাদের আশ্রয়ে জীবন পাত করতে পারবে। চতুরাশ্রমের তৃতীয় আশ্রম বাণপ্রস্থ আশ্রমের শিক্ষা এভাবেই সম্যক্ উপলব্ধি করে তারা ও তোমরা উভয় আত্মসুখ লাভ করবে। যথাসময়ে সংসারের দায় দায়িত্ব সন্তানদের হাতে ন্যস্ত করে দিয়ে এই মঠে এসে আমার সাহচর্যে বসবাস করবে। আশি বিঘা সম্পত্তি এই কারণেই ক্রয় করা হয়েছে। তোমরা এখানে এক একটি কুঠির নির্মাণ করে বসবাস পূর্বক স্বীয় জীবন গঠন করবে। গুরুশক্তির কৃপা করুণা দ্বারা আত্মমুক্তির সুযোগ লাভ করবে। নির্লিপ্ত নিষ্কামভাবে তোমাদের মত তারাও জগৎ সেবক হয়ে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ' অথবা 'আত্ম মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'– নিজের মুক্তি ও জগতের হিতকল্যাণে প্রকৃত ব্রতী হয়ে উঠবে। এই মহান সুশিক্ষা জগতে যেদিন ছড়িয়ে পড়বে সেদিন সমাজ গঠনে অপরিণত মস্তি-ষ্কের অপরিকল্পিত বুদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository
দ্বারা বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবীদের সমাজের দিক নির্দেশনা দিতে হবে না। যার সীমাহীন দূর্গতি আজ দেশ জাতি ভোগ করছে। এই ছিল শ্রী নিগমানন্দের জীবন দর্শনের মর্মার্থ।

শ্রীনিগমানন্দের এই নিখুঁত নিপূণ আদর্শগুলি বহুলাংশে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা থাকলেও সামান্য একাংশ যারা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সবাই জগৎ বরেণ্য হয়েছিলেন, ভারত বিখ্যাত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই ধারাকে আরও মূলে টেনে এনে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি এবার অনাথ আশ্রম গঠনে প্রয়াসী হলেন। তাঁর ধ্যান ধারণা এই ভাবে প্রকাশ হয়েছিল– গৃহস্থরা যেহেতু তাদের সন্তানদের আশ্রম মঠে পাঠাতে নারাজ। এক মাত্র ভয় যদি তারা সাধু হয়ে সংসার ত্যাগ করে তবে বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের (উক্ত পিতা-মাতাদের) কি হবে? সংসারের হাল কে ধরবে? অতি কষ্টে গড়া এই বিষয় সম্পদ কে রক্ষা করবে? বংশ রক্ষা কার দ্বারায় সম্ভব হবে। স্রষ্টার সৃষ্টি-ধর্ম ইচ্ছা কিভাবে পূরণ ও রক্ষা পাবে? বিরুদ্ধ এই মন মানসিকতাগুলি গৃহস্থদের ভিতর-ভিতর কাজ করেছিল বলেই তিনি অর্ন্তদৃষ্টিতে তা দেখে নতুন অনুসন্ধান উৎসরূপে এই লক্ষ্যে অনাথ আশ্রম গঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর গর্ব হল যেহেতু এরা অনাথ, অসহায়, দুস্থ, লাঞ্ছিত, নিপিড়িত, নির্যাতীত এবং অবাঞ্ছিত তখন আমি হব এদের অন্ধের আলো রূপ একমাত্র সনাথ অর্থাৎ আশ্রয় দাতা পিতা। নিজ হস্তে আমি এদের মানুষ করতে পারব। যদি এদের কল্যাণে কাজ করে সময় নষ্টও হয় বা আশা পূরণ নাও হয় ঋষির বাণী– 'দরিদ্র দেব ভব' –দরিদ্ররাই সন্মুখস্থ প্রকৃত ভগবান্ এদের সেবা সূযোগ লাভ করতে পারাও কম সৌভাগ্য নয়। জগতে আগমনের মহত্ত্বতা এবং এদের সেবা সুযোগ লাভে ধন্য হওয়া কম কথা নয়? এছাড়াও এই সেবা সুযোগ লাভটি দেশ জাতির মানবতা বোধের সামাজিক দায় দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলেও বিবেচিত হবে। মানুষ তাদের কর্তব্য বোধ সম্মন্ধে সজাগ হবে। নিজ সন্তানের মত এই সন্তানদের প্রতিও তাদের সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত হবে। দেশে এরাও সামাজিক মর্যদায় বাঁচার প্রয়াস পাবে। নচেৎ অমানুষের মত জীবন যাপন করে একদিন এরাই সমাজের শত্রু সাজবে। প্রতিশোধ নিতে একদিন তৎপর ও জিঘাংসিত হবে। পক্ষান্তরে নিজেদেরই শান্তি বিঘ্নিত হবে। 'জীব সেবাই

Dhaka University Institutional Repository

কলির একমাত্র ধর্ম।' জীবে প্রেম করে মানুষ ঈশ্বর সেবার অধিকার পাবে। এই মহান চিন্তা-চেতনা তাঁর প্রাণে প্রবল রূপে দানা বেঁধে উঠল। ঘোষণা দিলেন আশ্রম সেবকদের –

> তোমরা যখন মহামারি, ডায়রিয়া, কলেরা, বন্যার্ত পীড়িত, অগ্নিদগ্ধ, দুঃখী নির্যাতিত পরিবারে সেবা কাজে যাবে, দুঃখীনি মায়ের অবহেলিত সন্তানদের পাশে দাঁড়াবে, দুঃখী নির্যাতীতদের দেখতে পাবে সেসব স্থানে,দেখবে– কত অনাথ কত নিঃসহায় পড়ে রয়েছে। অবশ্য তাদের আশ্রমে নিয়ে আসবে॥ রাস্তা - ঘাটে, ড্রেনে, নর্দমায় পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন অবাঞ্ছিত ও ভবঘুরে শিশু যখনেই এদের সাক্ষাত পাবে তখনেই তাদের কোলে তুলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। শুরু হল কাজ। বাণী দিলেন, 'জীবের সেবা কর, জগতের সেবা কর অনাথ দরিদ্রদের হৃদয়ে হৃদয় মিশাও।' নির্দেশ দিলেন, 'যাহাতে আমার উদ্দেশ্য মত শ্রীশ্রী জগৎ গুরুর পূজা ও সনাতন ধর্মের প্রচার ও সৎশিক্ষা বিস্তার ও আর্ত-ক্লিষ্ট-রুগ্ন-দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হয়। সেই সম্বন্ধে ট্রাষ্টিগণ বিশেষ যত্নবান হইবে।' 'সেবা ধর্ম মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ', 'দরিদ্র-নারায়ণের সেবা সর্বসেবার সার ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।'[৭]
>
> সর্বপ্রকার বিলাস বাসনা পরিবর্জিত কতকগুলি ব্যক্তিকে এই রূপভাবে শিক্ষিত করা হইবে, যেন তাহাদের শিক্ষা ভবিষ্যতে হিন্দুর আদর্শ জীবন গঠনে ও জীব সেবায় বিশেষ সাহায্য করিতে পারে ইহাই শান্তি আশ্রম (সারস্বত মঠ) প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং তদনুকুল হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিই আশ্রমে গৃহীত হইবে ।' এই ভাবেই তিনি জাতীয় উন্নতি বিধানে সক্ষম হওয়ার প্রত্যাশা জ্ঞাপন করেছিলেন এবং 'নিজে আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাই'এই বাণী স্বয়ং আচরণ ও অনুসরণ পূর্বক জগৎ জীবকে শিক্ষা দিয়ে ধন্য করেছিলেন। দেশ জাতিকে উদারতা ও মানবতার শিক্ষা দান করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ মঠে প্রতিষ্ঠা

৭। পূর্বোক্ত, ভগবান্ লাভের উপায়, পৃষ্ঠা- ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

করলেন 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম' বা 'অনাথ নিকেতন' । শুরু হল তাঁর 'শিশুমঙ্গল' চিন্তা । বালক ও শিশুদের জন্য বাণী দান করলেন ।[৮]

"একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন করিলেই তোমাদের সম্যক্ প্রকার চিত্তশুদ্ধি হইবে । চিত্তশুদ্ধি হইলে পাপ দমন হইবে । এবং ভক্তিলাভের প্রধান কন্টক কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,মদ্, মাৎসর্য্য, হিংসা, নিন্দা, ঘৃণা, উচ্ছৃংখলা, সাংসারিক দুঃচিন্তা, পাটোয়ায়ী বুদ্ধি, মিথ্যা ভাষণ, পরস্বাপহরণ, বাহবা লাভের প্রবৃত্তি, কুতর্কে ইচ্ছা, ধর্মান্তর প্রভৃতি চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে ।"[৯] স্থায়ীভাবে এই শিক্ষা লাভের জন্য স্থাপন করেন জন্মভূমি কুতুবপুরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় । আত্মগঠনের অস্ত্র হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেন স্বরোচিত 'ব্রহ্মচর্য সাধন' শিক্ষা পুস্তক । এছাড়াও নীতিশিক্ষা রূপে তাঁর অভিপ্রেত বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন উপদেশগুলি যা শিশুদের কল্যাণার্থে দান করেছিলেন এখানে তারই কিয়দংশ সংগ্রহ পূর্বক উদ্ধৃত করা হল ।

(১) কখনও মিথ্যা কথা বলিও না ।
(২) কাউকে হিংসা করিও না ।
(৩) সকল জীবে দয়া করবে ।
(৪) যথাসাধ্য পরোপকার করবে ।
(৫) রিপুসকল দমন করবে অর্থাৎ আপন বশে আনিবে ।
(৬) পরশ্রীকাতর হবেনা বরং আনন্দিত হবে ।
(৭) জ্ঞানত: কোন প্রকার অন্যায় করবে না ।
(৮) বৃথা ও বেশি কথা বলবেনা ।
(৯) লোভ ও বাসনা একেবারে ত্যাগ করবে ।
(১০) কামনা ত্যাগ করে উপাসনা করবে, সদা সৎসঙ্গ করবে ।
(১১) কোন ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করবে না ।
(১২) ভুলেও কখনও কারও বিশ্বাস ভঙ্গের চেষ্টা করবে না ।[১০]

---

৮ । পূর্বোক্ত, ভগবান্ লাভের উপায়, পৃ. ৮১,৮৬
৯ । স্বামী নিগমানন্দ, ব্রহ্মচর্য্য সাধন, কোকিলা মুখ, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হতে প্রকাশিত, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৯
১০ । ঐ, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

সেই সময় এই ভাবে তিনি আশ্রিত সন্তানদের সোনার মানুষ রূপে গঠন করে তুলেন। এদেরকে আদর্শ হিসেবে তৈরি করে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, জাতীর অনিশ্চয়তা মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় অত্যাচার হিংসা নিন্দা স্বার্থপরতা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই সংকটময় মুহূর্তে শ্রী নিগমানন্দের আদর্শ পৃথিবীর মানুষকে সুখ শান্তি দানে সক্ষম হবে বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী। শ্রী নিগমানন্দ এখানেই থেমে থাকেন নি। শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়েও বিশেষ মনোযোগী হন। 'ব্রহ্মচর্য সাধন'– পুস্তকে শরীর রক্ষার জন্য আসন প্রাণায়াম ধ্যান ও মুদ্রার গুণাবলী বর্ণনা এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ চিকিৎসা ব্যবস্থাও লিপিবদ্ধ করেন।

আমরা জানি দেহ সুস্থ থাকলে মন সুস্থ, মন সুস্থ থাকলে প্রাণ সুস্থ। রোগ ব্যাধি হল এই সুস্থতার পথে একমাত্র বাধা। মানুষ মরতে রাজী, কিন্তু রোগ ব্যধি কষ্ট ভোগ করতে রাজী নয়। অথচ অনিবার্য রূপে এই কষ্ট মানুষকে ভোগ করতে হয়ই। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপায় থাকেনা। অতএব রোগ ব্যাধি জীবন যাত্রার পক্ষে একটি স্থায়ী বাধা। এর প্রতিকার জন্য গড়ে উঠেছে স্বাস্থসেবা রূপে চিকিৎসা বিধান ব্যবস্থা এবং রুগীদের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ। শ্রী নিগমানন্দ মনে প্রাণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, এই গরীব দুস্থ অসহায় রোগীদের কিভাবে সেবা সম্ভব। ডাঃ স্বামী স্বরূপানন্দ (এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জেন) তাঁর সহায়ক হলেন। তাঁর ইচ্ছাকে রূপদানে তিনি নিজেকে তাঁর চরণে উৎসর্গ করলেন। তাঁর দ্বারায় তিনি মঠে একটি দাতব্য সেবাসদন স্থাপন করেন। এই ভাবে অত্র এলাকার পাহাড়ী হাজং পল্লীর অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অভাবে যারা ধুকে ধুকে মরে যেত সেই অবহেলিত অসহায় অনাশ্রিতরা এখানে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হল। বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষজনিত ভয়াবহ ডায়রিয়া কলেরায় শত শত আক্রান্ত পীড়িত রোগীদের সাহায্যের জন্য কিভাবে পাশে দাঁড়াতে হয়, চিকিৎসা- সেবা ও সাহায্য দান করতে হয় ও করা যায় তা প্রচার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর পার্ষদদের উদ্‌বুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিয়ে তিনি দেশ জাতি সমাজ তথা সকল বর্ণ গোত্রের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে যাতে সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা পূর্ণবাসন কার্যক্রমগুলি

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের কল্যাণে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে তৎজন্য নিজ জন্মভূমি মেহেরপুর কুতুবপুরে প্রায় শতাধিক বিঘা সম্পত্তির উপর একটি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারী, একটি স্থায়ী ছাত্রাবাস, আবাদযোগ্য কিছু জমিতে খামার প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনস্বার্থে এসব সম্পদ স্থায়ী ভাবে রক্ষাকল্পে হাসপাতালটি সরকার বাহাদুরকে এবং অন্যান্যগুলি স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য ট্রাষ্টিদের ট্রাষ্টডিট মাধ্যমে আমজনতার স্বাধিকার সংরক্ষণে নিয়োজিত ও উৎসর্গীত করেন। দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে তিনি জ্ঞানমূলক 'আর্যদর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যা অষ্টানব্বই বৎসর ধরে বিজ্ঞাপন ছাড়াই সমাজের বুকে জ্ঞানের প্রদীপ রূপে প্রভাময় হয়ে আজও জ্বলছে।

বর্তমান সময়ে শ্রী নিগমানন্দ দর্শনের প্রাসংঙ্গিকতা তুলনাহীন। যতদূর জানি অল্পসংখ্যক মহামানব এরূপ শিশু-মঙ্গল চিন্তায় সরাসরি আত্মনিয়োগ করেছেন। গোড়াতে জল ঢেলে সিঞ্চন শুরু করেছিলেন, কারণ– বর্তমান শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ মেরুদন্ড। এই শিশুদের আত্মগঠনে ক্রান্ত দর্শী দার্শনিক মহাজ্ঞানী নিগমানন্দদেবের আদর্শানুপ্রাণিত অনুগামী শিষ্য বিখ্যাত দার্শনিক প্রবর শ্রীমৎ অনির্বাণজী, লীলানারায়ণী দেবী, শশী ব্রহ্মচারী, সিদ্ধানন্দ, সত্যানন্দজী ইত্যাদি আরও অনেকে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন শিক্ষিত সুশিক্ষক, গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। অতএব শিশুপালন ও শিশুশিক্ষাই হল আদর্শ শিক্ষা। শিক্ষককে হতে হবে একজন আদর্শ মায়ের মত যে মা শত শিক্ষকের সমপর্যায়ভুক্ত। মায়ের স্নেহ মমতা শাসন সোহাগ একটি শিশুর জন্য যত বেশি প্রয়োজন বা গ্রহণের অধিকার রাখে অন্য কারো পক্ষে তা গ্রহণ ও প্রদান সম্ভব নয়। শিক্ষক ট্রেনিং-এ যদি মেয়েদের মায়ের ভুমিকায় এবং পুরুষদের পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার শিক্ষাদান করা যেত তবে শ্রী নিগমানন্দের শিশুমঙ্গল আদর্শ আরও বাস্তবায়িত হত। শিশুদের আপন পিতা-মাতার মত সেবাসহানুভূতি আদর যত্ন নির্ভরতা নিশ্চয়তা ও শাসন সোহাগে জীবন গড়ে তুলতে তাদের কোন সমস্যায় পড়তে হতো না। শ্রীনিগমানন্দদেব এই শিশুমঙ্গল আদর্শকে প্রাচীন ভারতের ঋষি আশ্রম বা গুরুকুলে শিক্ষাসংযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মচর্য ব্যবস্থার মাধ্যম হিসেবেই এই মহতি আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। কুতুবপুর ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়টি ঠিক সেই লক্ষ্যেই তিনি গঠন করেছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্ররা আশ্রম কর্তৃক আবাসিক সুবিধা পাবে। অন্ন-বস্ত্র-খাদ্য পুস্তকাদি সবকিছু পাবে। পড়ার জন্য বৃত্তি পাবে। পিতামাতাগণ শুধু এই কাজে পারতপক্ষে জোগানদাতা হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন। শিক্ষকগণ ছাত্রদের নীতি বিদ্যা, দর্শন বিদ্যা, ধর্মবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, শিল্প,সাহিত্য, নাট্য, কলা এবং নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি অন্যান্য সব শিক্ষার সাথে প্রচলিত শিক্ষাও অকাতরে দান করবেন। শিক্ষকদের বেতন শ্রীনিগমানন্দদেব তাঁর এষ্টেট হতে ট্রাষ্ট কমিটি মাধ্যমে জোগান দিবেন। সম্ভবত দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত নিদর্শনের স্বাক্ষী রূপে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিদ্যালয়টির স্মৃতিচিহ্ন রূপেছিল। পরবর্তিতে এই সম্পত্তি এ্যানিমি প্রপারটিতে পরিণত হয়। অন্যত্র হস্তান্তর হয়ে বর্তমানে বিদ্যালয়টির পূর্ব নামকরণ 'শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দির' নামের পরিবর্তে 'নজরুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়' নামে কাথুলিতে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে বলে জানা যায়। শিক্ষানুরাগী শ্রীশ্রী ঠাকুর তৎকালীন প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা এই বিদ্যালয়ের জন্য দান করেছিলেন। কালের গর্ভে বর্তমানে তা বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানকালে তাঁর অনুসারী ও গুরুধাম এলাকাবাসীগণ মর্মে মর্মে শ্রীনিগমানন্দের এই আদর্শ চিন্তা নষ্টের জন্য অনুতপ্ত। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অনেকে কুতুবপুর শ্রীশ্রী গুরুধামে সেই সকল ধ্বংসস্তুপ ও নির্দশনগুলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মহৎ প্রাণের মহৎ ইচ্ছা এবং তাঁর শাশ্বত সত্য দৃষ্টি কখনও বিনষ্ট বা নিঃশেষ হয় না। সময় কালের তারতম্যে পুনঃ জাগ্রত হয়। শততম বর্ষ পরে শ্রীনিগমানন্দের শাশ্বত ইচছা ও সনাতন দৃষ্টি আবার আমরা দেখতে পাই তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত 'দিনাজপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সেবাশ্রম' গড়নূরপুর নামক স্থানে। এই আশ্রমে ঠাকুরের ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে তাঁরই নামে তাঁরই আদর্শে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি অনাথ আশ্রম, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি আধুনিক প্যাথলোজি বিভাগ, হোমিওপ্যাথি বিভাগ, একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণামূলক জ্ঞানদানের জন্য একটি বৃহৎ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে চব্বিশখানি জ্ঞানমূলক পুস্তক; আরও অনেক পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে । মানব জীবনের উন্নতির উচ্চতর দিক্‌দর্শন হল সামাজিকতা ও আধ্যাত্মিকতা যা এখানে আবাসিক অনাথ শিশুদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই আশ্রম উক্ত বালকদের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে থাকে। আশ্রম পরিচালক নিজেও করেন এবং তাদের দ্বারাও করিয়ে নেন। এখানেই শিক্ষা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জীবন গঠন ও জ্ঞানলাভের নিগূঢ় তাৎপর্য বহন করে। সু-অনুকরণ মানুষকে সু-লক্ষ্যে পৌঁছায় যা শ্রীনিগমানন্দ আশ্রমের একটি ঐতিহ্যবাহী দিক্। বালকদের এস এস সি পাশ করার পর কর্মক্ষম করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা দিয়ে জীবনের ভিত্তি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ঠাকুরের আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনের তাৎপর্য এখানেই নিহিত। যারা সংসারে ফিরতে চায়না তাদের আশ্রমের সেবামূলক কাজের আদর্শ ও নির্দশন শিক্ষা দিয়ে মানবসেবাব্রতী করে গড়ে তোলা হয়। মানবসেবা করে তাদের চিত্তশুদ্ধি হয় তখন তারা জন্ম-জীব ও জগতের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় । মিথ্যা বাসনা-কামনা যখন তাদের অন্তর থেকে দূর হয়। প্রকৃত চাওয়ার প্রতি তাদের পাওয়ার লক্ষ্য স্থির হয়। এইভাবেই নিগমানন্দদেব দেবমানবে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন আপামোর জনসাধারণকে।

আশ্রমের প্রধান কাজ হল শিশুদের সন্তান জ্ঞানে মানুষ করা। তাদের দৈহিক মানসিক নৈতিক ও আত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। মানব জীবনের চর্তুবর্গ – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া আশ্রমের শিশুদের জীবন গঠনে এরূপ সুন্দর সুন্দর কতকগুলি নিয়ম রচনা করা হয়েছে যা দেখে শিশু কিশোররা তাদের দায়িত্ব কর্তব্যগুলি পালন করতে কোন দ্বিধাবোধ করে না। কোন চাপ নেই অথচ তারা উক্ত কঠিন দায়-দায়িত্বগুলি অতি সহজ ভাবে আনন্দের সাথে পালন করে চলছে। এই অলিখিত নিয়মগুলি আর অন্য কিছু নয় আত্যন্তিক সেবা-স্নেহ-প্রেম-মায়া ও মমতা। সত্যিকারভাবে পরের জন্য নিজের জীবন দান করা। এমন পদ্ধতি যুগোপযোগী, চেষ্টা করলে

Dhaka University Institutional Repository

এতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরিবার নিঃসন্দেহে আনন্দমুখর হয়ে উঠবে, সেখানে শান্তির সুবাতাস বইবে। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাবে। একটি শিশু কী করে কর্তব্যপরায়ণ হবে, পবিত্র হবে, শিক্ষিত হবে, জ্ঞানী হবে, ঈশ্বর পরায়ণ হবে আশ্রম পরিচালক তাদের সঙ্গে একসাথে মিলে মিশে কাজ করে দেখান। তিনিও একজন শিশু সেজে শিশুমন কেড়ে নিয়ে তাদের মন প্রাণ আত্মার সাথে প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক এমন করে ভালবাসায় বশ করে তুলেছেন যে– শিশুরা পরিচালকের কথা শুনতে বাধ্য বরং দেখা যায় হুড়োহুড়ি করে শিশুরা অগ্রবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট কাজটি পালন করতে ছুটে যায়। পরিচালক মহোদয় যে দেশের একজন প্রকৃত সুশিক্ষক এখানে তাই প্রমাণ হয়। 'নিজে আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়', সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসেরা শিক্ষকপ্রধান মহাপ্রভুর এই বাণী দেশের সর্বস্তরের শিক্ষকগণ যতদিন পালন না করবেন, ততোদিন মানব জীবনে উন্নতি আশা করা বৃথা; শিক্ষকগণ দেশ ও জাতিকে সুন্দর মানুষ উপহার দিতে সক্ষম ও সমর্থ হতে পারবেন না। মানুষ তৈরি করার কৌশলই হল নিজে ভাল পবিত্র হলেই অপরে তা অনুকরণ করবে। শ্রীনিগমানন্দদেব প্রচারে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর বাণী ছিল- প্রচার নয়, প্রকাশ হও। তিনি সারাজীবন নিজে বলে ও করে তা দেখিয়ে গিয়েছেন। অনুবর্তীরা আজ সেই আদর্শ অনুসরণ করে সফল হয়ে উঠছেন। শ্রীনিগমানন্দ ছিলেন একজন আধিকারিক পুরুষ। এজন্য তাঁর দৃষ্টি ছিল সমগ্র জাতির প্রতি। এই আধিকারিক পুরুষগণ আসেন বিশ্বের কল্যাণে। বিশ্ববাসীর উন্নতির জন্যই তাঁদের অমূল্য কিছু কিছু মঙ্গল বিধান বা মঙ্গল-সূত্র আবিষ্কার। আপন আপন মতে উপাসনার অধিকার সবার আছে। আধিকারিক পুরুষ নিগমানন্দের হিন্দু, খ্রিষ্টান, মুসলমান, বুদ্ধ শিষ্যও ছিল। তাদের স্বধর্মে নিযুক্ত রেখেই তাদের বাঞ্ছিত অধিকার লাভ করাই ছিল তাঁর আদর্শ। মত পথ ভিন্ন হলেও গন্তব্যে পৌছতে, সবার লক্ষ্য এক, এই ছিল তাঁর ধর্মদর্শনের সার্বজনীন দৃষ্টি। দেশজাতির উন্নতিতে বর্তমান কালে এর বিকল্প নেই তিনি মনে করতেন আমরা যে দৃষ্টি ও গতিতে উপদেষ্টা সাজি সেই গতি ও দৃষ্টিতে উপদেশ পালন করিনা। উপদেশ পালন না করে যে উপদেষ্টা হওয়া যায় না এই শিক্ষা আমরা কেউ বর্তমনে মানি না যার ভয়াবহ

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতি দেশের শিক্ষাঙ্গনে আজ দেখতে পাচ্ছি। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার পীঠস্থান হলেও সেখানেই চলছে বরং বেশি অনৈতিক কর্ম, যা নিত্য দিন খবরে প্রকাশ হচ্ছে। এর মূলেই হল উপদেশ গ্রহণ ও পালন না করে উপদেষ্টা সাজা। নৈতিক বিধান হল, তুমি যতটুকু করবে ততোটুকুই পাবে এবং ততোটুকুই দিবে। না করে যা চাবে বা দিবে তা কখনও নিবেনা, দিবেনা ও পাবেনা। যদি কর বা নাও তবে একদিন তা আঘাতরূপে আসবে, এর জন্য প্রস্তুত থাকতে সচেষ্ট হতে হবে, এই ছিল তাঁর নির্দেশনা। জগতে সবাই যে হারে চায় সে হারে পায়না, দেয় না। আশা পূরণ সেকারণেই হয় না। প্রাণের টান ও ভালবাসা ছাড়া কোন কাজ বাধ্য করে বা দায়িত্ব কর্তব্যবোধে করলেও তা গ্রহণে ভাল কাজ হয় না। বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখতে হবে ভাল ফল আশা করলে ভালবাসা দ্বারা শ্রম দিতে হবে। সে প্রেম বা ভালবাসা যেন কারও ক্ষতি ও প্রতিহিংসা এবং প্রতিযোগিতা পর্যায় না পড়ে। সবার ভাল চেয়েই কাজে যতবেশি ভাল ফল কামনা ও চেষ্টা করা হয় শুভ ফল ততোই বেশি লাভ হয়। আমরা সবসময় নিজের সুখ খুঁজি বলেই আপন সুখ হারাই। শ্রীনিগমানন্দ সমাজের জন্য এমন শত সহস্র উপদেশ ও নীতি বাণী দিয়ে গেছেন আমরা এর সার-সংক্ষেপ এবং মর্মার্থ এখানে সামান্য তুলে ধরলাম।

মানবতা অর্জনের মূলে হল "শিশুশিক্ষা"। শিশু অনুকরণ প্রিয় যা শিখাবে তাই শিখবে। শিশু মনে প্রাণে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর সহজে মুছে যাবেনা। বড় হলে যদি পুনঃ সেই সুযোগ সে পায় বা সেই আচরিত শিক্ষাটি তাকে শিক্ষার জন্য দেওয়া হয় তার উন্নতি শতভাগ হবেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার এক লক্ষ্য এক আদর্শ এক উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যা দিয়ে শুরু করেছি তা দিয়েই শেষ করতে হবে। ২৫ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য সময় শিক্ষার বয়স। এই বয়সটি শিক্ষার্থী শিক্ষক ও শিক্ষাকে একমুখী হতে হবে। দেশে ঘুষ দুর্নীতি আজ কেন বেশি হয়েছে – মূল কারণ হল বিচ্ছিন্ন চিন্তায় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শিক্ষা। ভোগ লোভ বা বাসনামূলক শিক্ষার ব্যাপকতা শিশুর মনে যতবেশি প্রবেশ করবে ততো সে লোভী ও অর্থলিপ্সু হয়ে উঠবে। শিক্ষা তার উপাদেয় না হয়ে উপকরণ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তখন সে শিক্ষাকে মাধ্যম করে অর্থকেই জীবনের লক্ষ্য রূপে দেখবে। অথচ যে শিক্ষার জন্য জীবনের আদর্শ উদ্দেশ্য নির্ভর করে গড়ে উঠছে, সেই শিক্ষাই তখন পিছনে পড়ে থাকে। শিক্ষায় যত জ্ঞান ও গুণের আদর্শ থাকবে সেই শিক্ষার্থী ততোই সুশিক্ষিত এবং সুশিক্ষক হয়ে দেশজাতিকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। দেশকে ঐ জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সেমিনার সিম্পোজিয়াম বিতর্কপ্রতিযোগিতা, জ্ঞানের জন্য গানের আসর যত মিডিয়া আছে সবগুলিতে জ্ঞানমূলক নীতিমূলক যুক্তিমূলক শিক্ষাদান ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রথমে এর জন্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি হবে, প্রতিবাদ হবে, কিন্তু তার শেষ ভাল হয়ে উঠবে। আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় শিক্ষাই হল ধর্মনীতি। ধর্মকে ধরেই এগোতে হবে। বাঙ্গালীর স্বভাব প্রকৃতি বুঝেই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়তে হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রযুক্তি দেশের উন্নতির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অবশ্যই শিখতে ও গ্রহণ করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, নিজের আদর্শ কৃষ্টি সভ্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের আদর্শকেই বড় বলে গ্রহণ করতে হবে। আত্মনির্ভরশীল হতে চাইলে নিজ ভিত্তির উপর দাঁড়য়েই জীবন অট্টালিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির যা যা প্রয়োজন শুধু তাই অন্যের নিকট থেকে গ্রহণ করে প্রয়োজন মিটাতে হবে। বাকিটা নিজ শক্তিতেই উদ্‌বুদ্ধ হতে হবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি যত বদল হচ্ছে ফলরূপে তত জাতির উন্নতি হচ্ছে না। কারণ একটিই – লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শে ভুল। ক্রান্তদর্শী দার্শনিক শ্রীনিগমানন্দের 'শিশুমঙ্গল' চিন্তা এই লক্ষ্যেই আমরা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি।

প্রবাদ আছে 'যার ভিতর ভাল তার বাইর ভাল।' শ্রী নিগমানন্দদেব চেয়েছেন, শিশুর অবচেতন মনের ক্রমবিকাশ সাধন। শিশুর অন্তরকে পূত পবিত্র করে গড়ে তুলতে। আর এটি সক্ষম হলেই তার জ্যোতির বিকাশ ঘটবে। যার ফল– ভিতর-বাইর দুই উজ্জ্বল হবে। বর্তমান শিক্ষায় প্রগতিমুখী চেতনার বিকাশে যত শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে তাতে বাইরটি উজ্জ্বল প্রগতিশীল হচ্ছে কিন্তু ভিতর যেই আঁধার সেই আঁধারই থেকে যাচেছ। মনের আধুনিকতা বেড়েছে যে হারে প্রাণের আধুনিকতা সে মোতাবেক স্থবির হচ্ছে। চেতনার দিগন্ত কিঞ্চিৎ উন্মেচিত হচ্ছে না।স্বভাব শক্তি

Dhaka University Institutional Repository

ভিতর থেকে ফুটে বের হচেছ না। শ্রীনিগমানন্দ শিশুর ভিতরের স্বজ্ঞা শক্তির আবির্ভাবকেই শিক্ষা বলেছেন।

রক্ষণশীলতা ও প্রবহমানতা চিরকাল ধরে আছে, থাকবে। আমরা সব সময় এই দুটিকে এক পক্ষ করে বিচার করি এবং যুক্তি আরোপ করি। পুরাতনকে বাদ দিয়ে কি নূতন, বা নুতন ছাড়া কি পুরাতন? একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নয় বরং উভয়কে আশ্রয় করেই উর্ধ্বায়ন ও উন্নতি সম্ভব। শ্রী নিগমানন্দদেব রক্ষণশীল, কারণ তাঁর চিন্তা চেতনা সনাতন। শ্রী নিগমনন্দদেব আর্য ঋষিদের চিন্তা-চেতনারই রূপকার। তিনি প্রাচীন ভারতের সনাতন আর্যধারা– ক্রান্তদর্শী অপরোক্ষ বিজ্ঞানী বৈদিক ঋষিদের সিদ্ধান্তকেই জীবনে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। শ্রী নিগমানন্দের জাতীয় ভিত্তি এখানেই পরিস্ফুট। তিনি আরও একবার প্রমাণ করে দেখালেন – সনাতন ভারতবাসীর জাতীয় কৃষ্টি সভ্যতা আদর্শ ও ভিত্তি একমাত্র ধর্ম। পরমেশ্বর আছেন তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং সর্বশক্তিমান। তিনিই জগতজীব রূপে প্রকাশ হয়েছেন। জগত জীবকে নিয়ে তিনি আবার বিলীন হয়েছেন। তিনি সৃষ্টি, তিনি স্থিতি, তিনি ইতি। তিনি নিজের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে জীবমাঝে অবস্থান করছেন। জীবের স্বরূপ লাভ করাই নিগমানন্দ দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। এই মূল শিক্ষাকে লাভ করার লক্ষ্যেই প্রবহমানতাকে স্বীকার, কারণ পরিবর্তনশীল জগতে নিত্য সবকিছু পরিবর্তন হচ্ছে। বাহ্যিক ব্যবহারিক সবকিছু পরিবর্তন হতে বাধ্য। এই পরিবর্তনকে স্বীকার করেই যে প্রবহমানতা শুধু টিকে থাকবে আর আদি পুরাতন রক্ষনশীলতা নষ্ট হবে, এমন বুঝায় না। এখানে যা নশ্বর শুধু তারই পরিবর্তন, যা নিত্য অবিনশ্বর তা অপরিবর্তিত। যেমন 'আমি' শব্দটি আজও পরিবর্তিত হয়নি। কারণ এই অস্তিত্বই নিত্য শাশ্বত অবিনশ্বর সত্তা, যা প্রতি জীবে চেতন রূপে অন্তঃস্থলে বর্তমান। প্রবহমানতা আমরা এই অর্থে গ্রহণ করবো, সেই আদি সত্তাকে কিভাবে নুতন উপায়ে আরও সহজে জানতে পারা যায়। এই ভাবেই নূতন পুরাতনের সমন্বয় সাধন করেই এগুতে হবে জাতীয় জীবনে– কর্মে, আদর্শে, শিক্ষায় ও ধর্মে। শ্রীনিগমানন্দ একজন আদর্শ বাঙ্গালী হয়ে বাংলার উন্নতিকে ভালবেসে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বাঙ্গালীর স্বরূপের সন্ধান করে তা নিজ জীবনে সাধনার ফলরূপে জেনে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন তাহল –"ভালবাসার স্বভাব কর। পাপী, তাপী, দুখী দরিদ্রকে ভালবাস, আপন ভূলিয়া পরের সেবা কর ভগবান কোলে তুলিয়া লইবেন। মন্ত্র-তন্ত্র যোগ-যাগের প্রয়োজন নাই।"[১১]

এই ভালবাসার প্রবহমান সাধনাটি তিনি আদি খুঁটিতে যুক্ত করে দিয়ে জানালেন, এ যুগ যোগ যাগ ধ্যান তপস্যার যুগ নয়। এই যুগ ভালবাসার যুগ। তোমরা মানুষকে ভালবাস আত্মস্বরূপে। তোমাকে আগে তুমি চিন অতঃপর কেন তুমি ভালবাসা পছন্দ কর, কেন ভালবাসা অন্যকে দিতে ভাল লাগে, ভালবাসা অন্যে কেন প্রত্যাশা করে তুমি তোমার কাছে তা জেনে বুঝে ভালবাসার মর্মার্থ জগতে প্রচার কর। মানুষকে আত্মসচেতন করে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান দান কর। বর্তমান সময়ে শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই ভালবাসা যে সেবা-সহায়ে চিত্তশুদ্ধি পুর্বক অতি সহজলভ্য, এই দর্শনও শ্রীনিগমানন্দ দান করে গেলেন। কলির একমাত্র ধর্ম জীবসেবা ও দান। দান ও সেবা কি ব্যক্তিতে, কি পরিবারে, কি জাতিতে, কি দেশে, কি সমগ্র পৃথিবীতে অর্থাৎ দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে, সমাজে-সমাজে গ্রহণ ও প্রতিদান– তখনই সার্থক ও সুন্দর হবে যখন কিনা আমরা জানবো শিখবো আমরা সবাই এক আত্মা। আমাদের রুচি প্রকৃতি প্রতিভা ভিন্নতার কারণে জ্ঞানগুণের বৈষম্যের কারণে যত পার্থক্য ও প্রভেদ দেখিনা কেন বাইরে অন্য হলেও ভিতরে আমরা এক। মরমীরা এই লক্ষ্যে এর প্রমাণ দিয়ে গেছেন এই ভাবে যথা –

নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,
জগত ভরিয়া দেখিলাম একই মায়ের পূত।
নানা দেশের নানা নদী কত নাম যে ধরে,
পথ চলিয়া তারা একসাগরে পরে।[১২]

১১। পূর্বোক্ত, ভগবান লাভের উপায়, পৃ. ১৬৩

১২। As Quoted in, Gover, **The Folk Songs of South India**, Kolkata, 2nd Edition 2001, , P. 165

Dhaka University Institutional Repository

যখন এই নানা নামের নানা নদী এক সাগরে পৌঁছে তখন এই নদীগুলো কি বলতে পারে আমরা সাগর ছাড়া অন্য কিছু? নানা বরণ গাভীর দুধগুলি কি বলতে পারে আমরা আলাদা আলাদা? নিশ্চয় তখন বহু জল এক জলে, বহু দুধ এক দুধে পরিণত হয়েছে। একমাত্র সাগর যদি ইচ্ছা করে তার তরঙ্গিত প্রবাহ দ্বারা সে পুনঃ বহু নদ-নদী হবে তার পক্ষেই তা সম্ভব। বেদ এজন্যই বলেছে 'একই বহু বহুই এক।' নিগমানন্দ এই স্মৃতি-শ্রুতি বা দর্শন দান করেছেন, এবং এই দর্শনে আত্মবোধে বিশ্বকে কুটুম্ব করে আত্মীকরণ করেছেন। এক শ্রীনিগমানন্দ বাহির-ভিতর যুগপৎ এক করে নিজ জীবনে প্রমাণ করে এটাই দেখিয়ে ও দেখায়ে গেলেন। এখানেই তাঁর দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা বা সার্থকতা।

তাঁর দর্শনের এ দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে-

"বর্তমান যুগের সম্প্রদায় প্রবর্তক মহাপুরুষদের মধ্যে এদেশে শ্রীনিগমানন্দই সর্বপ্রথম তাঁর দর্শনকে একটি সুশৃংখল এবং বিধিবদ্ধরূপ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে হৃদয়োচ্ছ্বাসের চাইতে বুদ্ধির উদ্দীপনাই দাবী করেছেন বেশি।"[১৩] এটি তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হৃদয়ের আবেগ ও অন্ধবিশ্বাস যুক্তিবুদ্ধি-বিশ্লেষণে খাটে না। অতএব যা কিছু গ্রহণ করবো তা অবশ্য যুক্তি বিচার বিশ্লেষণযোগ্য হওয়া চাই। শ্রী নিগমানন্দের 'জ্ঞান-প্রেম' সমন্বয় দর্শন গভীর যুক্তি বিশ্লেষণে ভরা এবং সর্বধর্ম সমন্বয় ভাবাপন্ন তথা অসম্প্রদায়িক। শ্রীনিগমানন্দ দর্শনে রয়েছে সঙ্গতি, অবিরোধ এবং মিলন। শ্রীনিগমানন্দের সাধন-জীবন দর্শন করলে এবং তাঁর লিখিত পুস্তক পাঠ করলেই তাঁর সমন্বেয়ের জোর দাবীর পরিচয় ও প্রমাণ মিলে। যেমন-

> মৎপ্রণীত ব্রহ্মচর্য সাধন নামধেয় পুস্তকের নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য পালন করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে। তখন মন স্থির করিবার জন্য যোগীগুরু পুস্তকের লিখিত আসন

১৩। পূর্বোক্ত, আধিকারিক পুরুষ শ্রী নিগমানন্দ, পৃ. (গ)

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোগক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে এবং জ্ঞানীগুরু পুস্তকের লিখিত জ্ঞানালোচনা করিবে তৎপরে 'যোগীগুরু' বা 'জ্ঞানীগুরু' পুস্তকোক্ত সাধনায় সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মোপলব্ধি কিংবা 'তান্ত্রিকগুরু' পুস্তকোক্ত স্থুল সাধনায় ভগবৎসাক্ষাৎকার করিবে। তদনন্তর 'প্রেমিকগুরু' পুস্তকের লিখিত সাধনায় গোপিকানিষ্ঠ প্রেমময় স্বভাব লাভ করতঃ ভগবানের অসমোর্দ্ধ লীলা-রস মাধুর্য্যে অনন্ত কালের জন্য নিমগ্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং মৎপ্রণীত পুস্তক কয়খানিতে হিন্দু শাস্ত্রের সার গৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক কয়খানিতে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মসম্বন্ধীয় সকল অভাব পূর্ণ করিবে।[১৪]

কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় – তিনি নিজের জীবনে তাঁর সাধনার এই ধারা অনুসরণ করেন নি। তাঁর প্রথম সাধনা তন্ত্রপথে, তারপর জ্ঞানপথে, তারপর যোগপথে, এবং সবার শেষে প্রেমপথে। এ বিন্যাশের রহস্য কী? তিনি তাঁর অতি আদরণীয় শিষ্য ঋষি অনির্বাণকে একদা বলেছিলেন, "আমি ঘর ছেড়েছিলাম ভগবান খুঁজতে নয়, 'তাঁকে'(সুধাংশুবালা) খুঁজতে। মৃন্ময়ীকে খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেলাম চিন্ময়ীকে। সাধনার পথে আমার সম্বল কিছুই ছিলনা – ছিল শুধু সংযম, সত্যনিষ্ঠা, আর ভালবাসা।"[১৫] অর্থাৎ জগৎকর্তা কাকে কিভাবে তাঁর সাথে সংযুক্ত করবেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। কারণ– যেহেতু তিনি বিধি নিয়মের অতীত। তাঁর জ্ঞানী শিষ্যের আলোচনায় আরও জানতে পাই–

তন্ত্রের সাধনা বস্তুভিত্তিক। শ্রীনিগমানন্দেরও সাধনার শুরু বস্তুতন্ত্রকে আশ্রয় করে, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে। জীবনের উপর এসে পড়ল মরণের পরঃকৃষ্ণ যবনিকা। যবনিকার অন্ত রালে কি আছে ? আঁধার না আলো ? মৃত্যু কি বস্তুতই বৈনাশিক, না বৈবস্বত? এই ছিল তাঁর জিজ্ঞাসা এবং এষণা। ইষ্টকে বস্তুরূপে পেতে হলে তন্ত্র ছাড়া পথ নেই। তার ক্ষিপ্রসিদ্ধি অমিত পুরুষাকারের

১৪। পূর্বোক্ত, আধিকারিক পুরুষ শ্রী নিগমানন্দ, পৃ. (ঘ)
১৫। ঐ, পৃ. (ঘ)

Dhaka University Institutional Repository

অপেক্ষা রাখে। পথ দুঃসাহসিকের, মৃত্যুঞ্জয় জীবনরসিকের। শ্রী নিগমানন্দ প্রথমেই সে পথ ধরলেন। বরং বলা চলে, মহাশক্তি যেন ধরা দেবার জন্যই তাঁকে এই পথ ধরালেন।

শ্রীনিগমানন্দ সেদিন বলেছিলেন, "আমি তাকে পেলাম, দেবী নেমে এলেন মানবীর রূপে। যখন খুশি তখনই তাকে পাই, কিন্তু দেখি, তার মুখে ছায়া, চোখে জল। আমার চিত্ত হাহাকার করে উঠল। একি হল! রূপে তো তৃষ্ণা মেটেনা। হৃদয় রূপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। রূপ ছেড়ে ঝাঁপ দিলেন অরূপে।"[১৬]

বৌদ্ধ সাধনার পরিভাষায় তাঁর সাধনার এই বিবর্তনকে বলতে পারি কামাবচর ভূমি হতে রূপবচরে এবং রূপবচর হতে অরূপাবচরে উত্তরণ। চেতনার উত্তরায়ণের এই শাশ্বত ধারা। তন্ত্র সাধক হলেন জ্ঞানের সাধক। বিবর্তনের পরের ধাপগুলি বুঝবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক স্মরণ করি–

> 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥' ১/২/১১
>
> তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ বলে থাকেন যে, অদ্বৈত জ্ঞানই তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান নামে অভিহিত।' এই শ্লোকটি যেমন ভাগবত ধর্মের সার, তেমনি শ্রীনিগমানন্দেরও জীবন দর্শনের রহস্যকঞ্চিকা। এই তত্ত্বকে অনুভব করা ব্রহ্মরূপে, আত্মারূপে, ভগবানরূপে। তিনটি অনুভবের মাঝে একটি পরম্পরা আছে, গাঢ়তার তারতম্য আছে। যদি পথের দিক দিয়ে দেখি, জ্ঞানের পথে ব্রহ্মের সাধনা, যোগের পথে পরমাত্মার সাধনা, আর প্রেমের পথে ভগবানের সাধনা। খন্ডদর্শী তিনটি সাধনাকে বিবিক্ত মনে করতে পারেন, কিন্তু

১৬। পূর্বোক্ত, **আধিকারিক পুরুষ শ্রী নিগমানন্দ**, পৃ. (ঘ)

Dhaka University Institutional Repository

অখন্ডবিজ্ঞানী তত্ত্ববিদ্ বলবেন– তিনটি সাধনার সমাহারে এবং সমন্বয়ে এক অদ্বৈত তত্ত্বেরই সাধনা।[১৭]

শ্রীনিগমানন্দ ব্রহ্মকে জেনে জ্ঞানী, পরমাত্মাকে জেনে যোগী, ভগবানকে জেনে প্রেমিক। সবমিলিয়ে তিনি গুরু। তাঁর সাধনা চতুস্পাৎ অথবা পঞ্চপাৎ। পাদ ব্যবস্থা আকস্মিক নয়, তাঁর মাঝে ধারাবাহিকতা আছে। এমনি করেই তাঁর রূপের সাধনা অরূপে উত্তীর্ণ হয়ে আবার যখন রূপে নেমে এল, তখনই হল স্বরূপের প্রতিষ্ঠা। যিনি ছিলেন স্বরূপা, অরূপা হয়েই তিনি হলেন অপরূপা। বৈদেহীর অশ্রুবাষ্পের স্ফূরিত হল মহাভাবোল্লাসের বিদ্যুদ্দাম। তারই প্রচ্ছটায় উদ্ভাসিত তাঁর জীবন দর্শন।[১৮]

শ্রীনিগমানন্দ ছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের সমন্বয় কর্তা বা ঐক্য মূর্তি। তিনি অন্যান্য ধর্ম প্রবর্তকদের মত একদেশদর্শী ছিলেন না। ধর্মের দ্বন্দ্ব তিনি তাঁর দর্শনে দেখেননি, দেখাননি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মত পথে বৈশিষ্ট্য থাকলেও সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান চলারও একটা রাস্তা থাকে। শুধু এক সম্প্রদায়ের নহে সকল সম্প্রদায়েরই ক্রমোন্নতির পথ আছে। আধিকারিক পুরুষ নিগমানন্দ সকল মত পথে সাধনা করে এই সম্যক্ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সর্বধর্মসমন্বয় এবং অসম্প্রদায়িকভাবে ধর্মে বিস্তার হলেই জীবজগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে।

শ্রীনিগমানন্দ যেমন নির্গুণ ব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন আবার স্বগুণ সাকার ব্রহ্মকেও স্বীকার করে পুর্ণযোগীর আদর্শে জগতের হিতকল্পে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কর্মযোগী সন্ন্যাসী রূপে, জগৎ শিক্ষক হয়ে জগতের কাজ করে গেছেন। 'জগৎ মিথ্যা' তিনি বলেননি। তিনি জগতকে প্রবহমান সত্য বলেছেন এবং ব্রহ্মকে শাশ্বত সত্য বলেছেন। শংকর মতের সাথে নিগমানন্দের মত এক হলেও নিগমানন্দ দর্শনের এটি একটি অতিরিক্ত অবদান। তিনি কর্ম সন্ন্যাসী ছিলেন না। কর্ম বন্ধনের কারণ, তাই কর্মবিমুখতা জগতকে শিক্ষাদিতে হবে তিনি এই প্রভাব মুক্ত ছিলেন, বরং তিনি ছিলেন জগৎ

১৭। পূর্বোক্ত, আধিকারিক পুরুষ শ্রী নিগমানন্দ, পৃ. (ঙ)
১৮। ঐ, পৃষ্ঠা- (ঙ)

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত কর্মযোগী। তাঁর জীবন দর্শন ছিল জীব, জগৎ, কর্ম ও সৃষ্টি। তিনি এর কোন একটিকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে ধর্ম দর্শন দান করেন নি। তিনি 'জীবন্মুক্ত' হওয়াকেই জগতজীবনের বড় সাধনা বলতেন। জীবন্মুক্ত অর্থ – জীবিতবস্থাতেই পার্থিব মায়াবন্ধন হতে মুক্ত। যেমন বুদ্ধদেব নির্বাণ অবস্থা লাভ করার পরেও বহুদিন শরীরে বর্তমান থেকে লোকহিত সাধন করে গেছেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ মৃত্যুকে যেমন কামনা করেন না আবার জীবিত থাকতেও ইচ্ছা করেন না। তিনি কালের প্রতীক্ষায় থাকেন মাত্র। যেরূপ ভৃত্য আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে। জীবন্মুক্তকে দেখে যেন জীবজগৎ শিক্ষা লাভ করতে পারে এজন্য জীবন্মুক্ত বা বিদেহী মুক্তিকে তিনি শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেছেন। যার মৃত্যু ইচ্ছাধীন, যিনি ত্রিকালজ্ঞ, যিনি এই দেহে মৃত্যুকে অতিক্রম করে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করছেন, যাকে কোন কিছু স্পর্শ করতে পারছে না, অথচ তিনি সবকিছুতে ছড়িয়ে ও জড়িয়ে আছেন, তিনি দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকেও দ্বন্দ্বাতীত। তিনি গুণের মধ্যে থেকেও গুণাতীত। তিনি মৃত্যু যাত্রী হয়েও অমৃত অমর। জীবন্মুক্ত শ্রীনিগমানন্দ সদ্য মুক্তিকে গ্রহণ করেন নি। কারণ এতে নিজের কাজটি গুটিয়ে ও গুছিয়ে কৃপণের মত একা সুখ ভোগ করা বুঝায়। এই লক্ষ্যে তিনি অপরের মুক্তির জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা অথবা বার বার জন্ম গ্রহণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। আমার একটি শিষ্য অমুক্ত থাকিতে আমি মুক্ত হইব না। এই ছিল তাঁর জগতের প্রতি প্রাণপাত ভালবাসা। তিনি নিজের জীবন দর্শনকে জগতের জন্য উদাহরণ রূপে উপহার দান করেছেন। সাথে কি করে তাঁর মত আমরাও হতে পারি সেই শিক্ষাও নিজ হাতে কলমে দেখিয়ে ও দেখায়ে গেছেন। তিনি বক্তৃতার চেয়ে কাজ করে গেছেন বরং বেশি। তাঁর জগৎ বিখ্যাত চারিখানি অমূল্য পুস্তক তাঁরই প্রমাণ বহন করে।

তিনি তাঁর অনুগতদের একদিন মৃত্যুর অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন, 'সূর্য দ্বার দিয়া আমি এখনেই ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করতে পারি।' যা কথা তাই কাজ। তিনি ইচ্ছা শক্তি দ্বারা প্রাণবায়ুকে গুটিয়ে নিতে থাকলেন। ধীরে ধীরে তাঁর হাত পা অসাড় অবশ হয়ে পরছে কোন চেতনা তাতে নেই। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ। শিষ্যগণ ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তাদের আকুল আহ্বানে তিনি আর

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রসর হতে পারলেন না। ফিরে এলেন পুনঃ দেহে। আধিকারিক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্থান এজন্য সবার উপরে। মানুষ ইচ্ছা করলেই এই আদর্শ জীবন লাভ করতে পারে। এই সত্য জ্ঞানদান তিনি দেখিয়ে দেখায়ে শিখিয়ে শিখায়ে এবং নিদর্শনরূপে চিরকাল জীবন্ত জ্বলন্ত ও স্বর্ণাক্ষরের মত উজ্জ্বল হয়ে যাতে থাকে তদ্‌জ্জন্য চারিখানি গ্রন্থে সেগুলি লিপিবদ্ধ করে গেলেন। অর্থাৎ জগতের এই শিক্ষার আলো যাতে অস্বীকৃত ও অবলুপ্ত না হয় বা কেউ যেন অবলুপ্ত করতে না পারে চিরকাল যাতে উজ্জ্বল থাকে এজন্যই তাঁর এই মহৎ রচনা।

শ্রীনিগমানন্দের দর্শন আর এক অর্থে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহলো – 'বেদান্তবিদ্‌গুরুর সেবা।'এখানে আচার্য শংকরের মত অপেক্ষা আধিকারিক পুরুষ নিগমানন্দের দার্শনিক অভিমত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আচার্য শংকর শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন এর উপরই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জোর দিয়েছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর সেবা পূজা ভালবাসাতেও যে ব্যক্তিত্ববোধ বিসর্জন হতে পারে এবং ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করা যেতে পারে এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত শংকর দেননি। শংকর শুধু মহাবাক্য উচ্চারণের উপরেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' – (মহাবাক্য) 'আমিই ব্রহ্ম'–এই অনুধ্যান। ভক্তি ভালবাসাও যে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারে তিনি সেদিকে জোর দেন নি। কারণ তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতেই জগতে এসেছিলেন। নিগমানন্দ বেশে আবির্ভূত হয়ে ভক্তিতে ভগবান লাভ সর্বজন গ্রাহ্য সহজ সরল সার্বজনীন পথ এই শিক্ষা দেখিয়ে দেখায়ে গেলেন। এর অর্থ এই নয় যে, শংকর ভক্তি অস্বীকার, উপেক্ষা ও ঘৃণা করতেন এবং গৌরাঙ্গ জ্ঞান অস্বীকার, উপেক্ষা ও ঘৃণা করতেন। বরং তাদের মত গুরুভক্তি যে কারও ছিলনা প্রচ্ছন্নভাবে তাই প্রকাশ করেছেন। শংকরের ভক্তির নাম হল – 'স্ব-স্বরূপানুসন্ধানাত্মিক'। অর্থাৎ স্বরূপ বা আত্মপ্রীতিই হল শ্রেষ্ঠ ভক্তি। স্বীয় আত্মাকে ভালবাসাই হল শ্রেষ্ঠ ভক্তি ও ভালবাসা। 'আকীট ব্রহ্ম পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থ সেই আমিত্বের বিকাশ; ইহাই শংকর মতের মূলমন্ত্র।' অদ্বৈত অর্থে বুঝতে হবে যেখানে দ্বৈত বা ভেদ বুদ্ধি নেই তাই অদ্বৈত। অদ্বৈত কোন সংখ্যা নয়,অনুভব। গৌরাঙ্গের ভক্তি হল – পরম সত্তা কৃষ্ণ নির্গুণ ব্রহ্ম নন, বরং ভক্তের ভগবান।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সবার প্রিয় বন্ধুস্বরূপ। এই অর্থে তিনি দ্বৈত। যেমন সন্তানকে বাদ দিয়ে মায়ের কোন অর্থ হয় না। তেমনি সৃষ্টি ব্যতিরেকে স্রষ্টারও কোন মানে হয় না। ভিন্ন দৃষ্টিতে আবার দ্বৈতবাদই দেখা দেয় অদ্বৈতবাদ রূপে। বৈষ্ণব মতে স্রষ্টা-সৃষ্টি রাধা-কৃষ্ণ বিভিন্ন হয়েও অভিন্ন। দুই হয়েও একাত্ম।

প্রকৃত ধার্মিকই যে প্রকৃত সমাজ কল্যাণকর্মী আমরা অনেকে এই বিষয়টির মূল্য দান করিনা। ভাবি, ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মকর্মে ব্যস্ত সমাজ কর্মের তাঁর প্রয়োজন কী? ধর্ম ছাড়া যেমন সমাজ নয়, অনুরূপ সমাজ ছাড়াও ধর্ম নয়। ধর্ম ও সমাজ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজের মুক্তি না চাইলে ধর্মের বৈশিষ্ট্য কোথায়? একা বাঁচা তো ধর্ম নয়, সকলে বাঁচাই হল ধর্ম। ধর্ম, চিরকাল সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতেই ব্যস্ত। আমরা পূর্বে ব্রহ্মচর্য, আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন, চিকিৎসা, সেবা ও শিক্ষা বিষয়ে স্বামী নিগমানন্দের আদর্শ ও বর্তমান সময়ে তাঁর দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছি। বলিষ্ঠ নাগরিক তৈরি করতে চাইলে যে, সংযম ভিত্তিমূলে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধন চাই আর এর মূলে যে সমাজের কর্তা গৃহস্থ জীবন এবং এই গৃহস্থ জীবন যে একপ্রকার ব্রহ্মচর্য জীবন, সেই বিষয়টি আমরা বর্তমান সমাজ মনে না করার জন্যই বিবাহ যে একটি পবিত্র ব্রত বিশেষ তা হারিয়ে বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় জীবিকা নির্বাহ করছি। সে কথা নিগমানন্দ বারবার স্মরণ করে দিয়েছেন। এক কালে যে গৃহস্থের সংসার ছিল সুখের শান্তির এখন সেই সংসার ক্ষেত্রে কেন আগুন জ্বলছে আমরা একবার চিন্তা করলেই বুঝতে সক্ষম হব যে, সমর্থ পুরুষ এবং সমর্থা নারীর আজ দেশে কত অভাব। এদের সম্ভোগ সুখ কোনদিনই দেশে সুসন্তান এনে দিতে পারবে না। আজাকাল সমাজ শিক্ষায় ব্রহ্মচর্যের কোন প্রসঙ্গই নেই। অথচ এই ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে না পারলে সুস্থ সবল বলিষ্ঠ সন্তান গঠন অসম্ভব। একথা স্মৃতির অতল তলে ফেলে রেখেছি বলেই আজ হাপিত্তেস করছি। নিগমানন্দ তাঁর মঠাশ্রমগুলিকে এজন্যই শক্তির কেন্দ্ররূপে গঠন করেছিলেন। এখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে চরিত্র গঠন পূর্বক বীর দর্পে দেশ, দশ ও সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করাই ছিল তাঁর ধর্মদ্বারা জাতিগঠন প্রক্রিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

এরই বিকেন্দ্রীকরণ রূপে তাঁর ঘরে ঘরে সংঘ প্রতিষ্ঠা। কারণ কলির দুর্বল জীবের জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া আদর্শ হওয়ার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। বাঙ্গালীকে সংঘবদ্ধ করতে তিনিই প্রথম সক্রিয় ও সচেষ্ট ছিলেন – যেখানে আমার তিন জন ভক্ত শিষ্য থাকবে সেখানেই একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করবে। কারণ কলির জীব দুর্বল চিত্তের, এদের চাঞ্চল্য বেশি, কাজেই একত্রিত না হলে কোন কর্মে, ধ্যানে, ও উপাসনায় এমন কি কোন ক্ষেত্রেই শক্তির বিকাশ হবে না। সংঘ শিক্ষা দিবে নিয়মানুবর্তিতা, ত্যাগ, সংযম, চরিত্র গঠন এবং অধ্যাত্ম উন্নতি। সমবেত শক্তির সহায়তাই মনুষ্যত্ব অর্জনে কলির আদর্শ। শাস্ত্রেরও এই অভিমত। সংঘ শক্তি কলৌযুগে– কলি যুগে সংঘ শক্তি ভিন্ন জাতি গঠনে দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। সংঘ স্বেচ্ছাকৃত আনন্দযুক্ত। সংঘে কোন একনায়কত্ব, জুলুমবাজী এবং কোন প্রভুত্ব থাকবে না। লক্ষ্য ও আদর্শকে বরণ করেই একতার সূত্রে বন্ধন। একত্রিত হয়ে একমন একপ্রাণ এক লক্ষ্যে যাতে উপনীত হতে পারি এজন্য প্রণয়ন করেন শ্রদ্ধার উৎসরূপে 'পঞ্চনিয়ম' এবং 'সপ্তবিধান'। এই স্থুল আদেশগুলি পালন করেই অনেক পথহারা গৃহী পথ লাভ করে আজও সুখী জীবন যাপন করছেন। পরিকল্পনায় আধিকারিক পুরুষের কোন গলদ নেই শুধু 'কুটনীতি' এবং 'মতলববাজী' ঢুকলেই বিপদ। দেশে সংঘ শক্তিগুলি এই দুই কারণেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমরা বারবার ভুলে যাই প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠাতারই বিভূতি। ব্যক্তি কোন আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান নয়। তবুও আমরা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যে আদর্শের বিরোধিতা করি এটি বুঝে উঠতে না পারার জন্যই প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘ শক্তির ভিত্তি মূলে আঘাত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে ভেঙ্গে ফেলি। স্বীয় ব্যাক্তিত্ব, প্রভাব ও প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠানে আরোপ করে নিজের মত করে সবাইকে ভাবি। আমরা অজ্ঞতা বশতঃ এই ভাবেই দেশ, জাতি, ধর্ম, ব্যক্তি, সমাজ পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র ক্ষতি করে থাকি। বুঝার চেষ্টা করিনা আশ্রম মঠ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এক একটি আনন্দ নিকেতন, শান্তি নিকেতন। আমাদের কখনও উচিত হবে না এমন কোন কাজ করা যাতে এর শান্তি, আনন্দ নষ্ট হয়। কারণ আনন্দই সৃষ্টি। আনন্দ ব্যহত হলে সেই সৃষ্টির কোন সার্থকতা থাকেনা। সংঘ শুধু অধ্যাত্মভাব

Dhaka University Institutional Repository

তথা সৎ শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই। এটি কখনই অত্যাচার উৎপীড়ণের আড্ডা নয়। শান্তি বিঘ্নিত করার সংঘ নয়। সংঘ হল দিব্য শক্তির ক্ষেত্রভূমি। সংখ শক্তি ছাড়া পৃথিবীর উন্নতি অসম্ভব। ক্রান্তদর্শী, আধিকারিক-আদর্শ পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ এই লক্ষ্যে দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকন করেই এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

শ্রীনিগমানন্দের আদর্শের আর একটি মূল্যবান সামাজিক দিক দর্শন হল – 'ভক্ত সম্মিলনী' অর্থাৎ– জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র ভেদে যে যাই হই সবাই মিলে এক অখন্ড শক্তির ছায়াতলে আশ্রয় লাভ। আমরা সবাই এক প্রভুর ভক্ত। অর্থাৎ আমরা সবাই ভক্ত তিনি আমাদের প্রভু বা ভগবান্। এই জ্ঞানে বাৎসরিক এক অখন্ড মহামিলন, এরই নাম তিনি দিলেন ভক্ত সম্মিলন। অর্থ্যাৎ ভক্ত- ভগবানে বা প্রকৃতি-পুরুষে মিলন। তিনি একজন মহান্ শক্তিধর পুরুষ ছিলেন বলেই বিভিন্ন মত পথের সাধককে তিনি বিদেহী হওয়ার পরেও যাতে এই সংগঠন সচল গতিতে বরং বর্ধিতাকারে চলে দীর্ঘকাল ধরে তার ব্যবস্থা করে গেছেন। সেই ধারাবাহিকতা আজও তাঁর কেন্দ্রিভূত নিয়ন্ত্রিতীত শক্তি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। সবার কথায় সবাই মিলন করতে বা মিলিত হতে পারিনা বা পারেনা, মিলন মন্দির নির্মানে নিশ্চয় একজন প্রেমিক পুরুষ চাই যার ছোঁয়াচে সবাই পবিত্র সুন্দর ও প্রেমময় হয়ে ওঠে। প্রেমিক পুরুষ নিগমানন্দ তাঁর অমিত আকর্ষণেই গোপীদের যেমন কৃষ্ণ রাসে ডেকে এনে ভালবাসার বিহার করেছিলেন তিনিও প্রতিবছর সেই অপ্রাকৃত প্রেমকণা বিতরণ করে সবাইকে সংঘবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলছেন। উদ্দেশ্য সমাজের প্রতি অন্যায় অত্যাচার অবিচারকে যেন আমরা গুড়িয়ে দিয়ে সমাজকে সুস্থ সবল সুন্দর পবিত্র প্রেমময় করে গড়ে তুলতে পারি। আমরা জগতে সমাজে যেন সবাই আদর্শ পবিত্র হই, সবাইকে যেন এই অনুপ্রেরনায় গড়ে তুলি– এই ছিল শ্রী নিগমানন্দের ভক্ত সম্মিলনী রূপ এই মিলন-মেলা গঠনের আন্তরিক অভিপ্রায়। এই দর্শন বাঙ্গলার বুকে একচ্ছত্র মহামানব রূপে তিনিই প্রথম এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই আনন্দের লীলাভূমি আনন্দ হতেই সৃষ্টি, আনন্দেরই এর স্থিতি এবং আনন্দেই এর ইতি। শ্রীনিগমানন্দ ছিলেন স্বয়ং আনন্দময়

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ ভক্তসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একমাত্র পুরুষ আমরা সবাই তাঁর প্রকৃতি। তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন, আমি ব্যক্তি নই। অর্থাৎ তিনি স্থূলে ব্যক্তি হলেও সূক্ষ্মে তিনি সর্বভূতাত্মা। অবজাননন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনু মাশ্রিত– ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একথাই বলেছিলেন – মুর্খ মানুষ আমায় চিনতে না পেরে আমাকে মানুষ ভাবে। শ্রী নিগমানন্দ এই ভক্ত সম্মীলনীর মধ্যমণি রূপে ঠিক ঐ কারণেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, প্রতিষ্ঠা লাভ করে আছেন এবং থাকবেন। এই ভক্ত সম্মিলনী তাঁরই বিভূতি।

জীব দুঃখ বিমোচনে তাঁর আকুতি ও শক্তি প্রকাশ অবিস্মরণীয়। যিনি ভগবান লাভ করেন বা ভগবদ শক্তিতে শক্তিমান হন তিনি বিভূতি না চাইলেও বিভূতি তাঁকে আশ্রয় করেই। অগ্নি শিখা যেমন অগ্নিকে আশ্রয় করে স্বভাব বশতঃ এও তেমনি। শ্রী নিগমানন্দদেবের কাছে যখন এমনি করে কোন দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ রোগী সন্মুখস্ত হত তখন তাঁর শক্তি তাকে সুস্থ করে তুলত। যেমন – আলো যেখানে প্রকাশ পায় সেখানে কোন আঁধার থাকতে পারে না অনুরূপ শক্তিমান পুরুষ যখন কখনও এমন আর্তির সামনে আবির্ভূত হন তাঁর সকল চাওয়া পাওয়া তখন আপনাতেই পূর্ণ হয়। কোন ব্যবচ্ছেদ থাকতে পারে না। এই ভাবে তাঁর সন্মুখে পড়ে কত রোগী যে রোগমুক্ত হয়েছে, কত অন্ধ যে আলো পেয়েছে, তাপিত শীতল হয়েছে , মৃত জীবিত হয়েছে , তার ইয়ত্তা নেই। তন্ত্র মন্ত্রও তিনি জানতেন, দেশ দেশান্তর ভ্রমণ কালে অনেক অমূল্য সম্পদ তিনি অযাচিত ভাবে লাভ করেছিলেন। তিনি লোক কল্যাণে সবকিছু নিয়োগ করেন। তিনি বিনা পরীক্ষায় কোন বিষয় আমল দিতেন না। 'পঠিত বিদ্যায় গঠিত জীবন' প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নেন নি। মন্ত্র শক্তিকে বর্তমান বিজ্ঞান যুগে অনেক বিদ্বান্ পন্ডিত হাস্যরস সহকারে উপেক্ষা করেন। কিন্তু মন্ত্র একটি অসাধারণ শক্তি। ভারতে এই বিদ্যা আজও জীবিত। এই বিদ্যা লাভে পবিত্র শক্তি সঞ্চয় পুর্বক ব্যবহার করতে হয় তবেই এই বিদ্যার ফল লাভ হয়। সাধনা করে উক্ত মন্ত্রশক্তি লাভের জন্য অগ্রে উপযুক্ত হয়ে গঠিত হতে হয়। এই মন্ত্রবিদ্যা শক্তি অকালে ঝড়ে পরার কারণ হল – স্বার্থ সিদ্ধির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রশক্তি ব্যবহার, অথবা বিভূতিকে খোলা রূপে অন্যের মন জয়ে ব্যবহারের জন্য এর ব্যবহারের যথেচ্ছ ফল। মন্ত্রশক্তি তান্ত্রিক-বিদ্যার ফল শক্তি। বিজ্ঞান গবেষণায় যেমন শক্তিকেন্দ্র উদ্ধার ও শক্তিলাভ, অনুরূপ তান্ত্রিক সাধনায় তন্ত্রশক্তি লাভ। বিজ্ঞান শক্তিগুলিকে স্বার্থ ভিত্তিক অপব্যবহার করার ফলেই আজ যেমন নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণরূপে ভয়াবহতার কারণ হয়ে উঠেছে এবং এগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। তন্ত্রশক্তির ফল মন্ত্রশক্তিকেও আজ তান্ত্রিকগণ গুটিয়ে ফেলেছেন। নইলে এই শক্তিগুলি দ্বারা উপকার না হয়ে অপকার বেশি হত।

শ্রী নিগমানন্দ এই বিবেচনা দ্বারা তন্ত্র সাধনা করে অসীম তন্ত্রশক্তি লাভ করেও যুগোপযোগী এই শক্তি বুদ্ধি দান অনুপযুক্ত ও অনুপোযোগী ভেবে এগুলি মানব সেবায় নিয়োগ না করে মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন বেশি কারণ সকল প্রকার সেবা সুখের চেয়ে একমাত্র জ্ঞান সেবাই বড় সুখ। জ্ঞানের চেয়ে বড় সুখ আর নেই। জ্ঞানের চেয়ে বড় শক্তিও আর নেই। তাই তিনি সবাইকে জ্ঞানী করে তুলার জন্য জীবকল্যাণে জীবন দান করেছিলেন। নিজের জন্য তিনি একবিন্দুও রেখে যাননি।

তিনি পরা-অপরা দুই বিদ্যায় ভীষণ পারদর্শী ছিলেন। কৃপাবাদকে তিনি অস্বীকার করেন নি, বরং আক্ষেপ করে বলতেন, ভারতে এত বিদ্যা আছে এবং বিদ্যা দানের গুরুও আছেন, অথচ কেউ বড় একটা সাধনা করিয়া সেসব দেখিতে বা পরখ করিতে চান না। সাধনরহস্যবিদের জন্যই তো আজ ভারত বর্ষের এত মহিমা নইলে এই ভারতকে কে চিনত, কে জানত। চতুর্বিদ সাধনায় সিদ্ধ সাধক শ্রী নিগমানন্দ কত বড় যে শক্তিধর মহাপুরুষ ছিলেন এবং কেন যে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে তিনি তার জীবন কাটিয়েছেন তা রহস্যজনক। তাঁর রহস্যময় জীবনের কথা অনেকেই জানত না। তন্ত্রবিদ্যায় শ্রীনিগমানন্দ ছিলেন সাক্ষাত ভৈরব। একজন আরামবাগীশ তাই বলেছিলেন, 'আপনারা কেবল ঠাকুরকে শংকরপন্থী সন্ন্যাসী বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন কিন্তু আপনার জানেন না, তিনি কত বড় মহাকৌল তান্ত্রিক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ইচ্ছা করলে এই তন্ত্রশক্তি দ্বারা পৃথিবীর চেহারা পালটিয়ে দিতে পারতেন। কারণ মহাপ্রকৃতি ছিল তাঁর একান্ত বাধ্যগত, অনুগত এবং প্রিয়া। তিনি শক্তিকে বড় করে দেখান নি। কারণ শক্তিরও ক্ষয় আছে। শক্তি চিরকাল অক্ষয় নয়। বরং শক্তিমান হয়ে যদি শক্তিকে ব্যবহার করা যায় তবেই শক্তি থাকে অক্ষয়, অব্যয়, অবিনাশী।

তিনি যে কত বড় সিদ্ধমহাসাধক ছিলেন এবং আত্মশক্তি বলে কত বড় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর বাণী তার প্রমাণ বহন করে –

> এই পুস্তকের (জ্ঞানীগুরু) লিখিত বিষয় আমার পুথিগত বিদ্যা নহে অথবা গহনাদায়প্রাপ্ত হইয়া আমি এই সকল পুস্তক প্রচার করিতেছি না। হিন্দুধর্ম অনুশীলনে আমি যে অপার্থিব পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি , আমার বঙ্গবাসী ভ্রাতাগণকে তাহার অংশভাগী করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। খৃষ্টান, মুসলমান, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম সকলেই আপন আপন সম্প্রদায়ক্ত ভাব বজায় রাখিয়া পুস্তকোক্ত সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মানব জীবনের পূর্ণত্ব সাধন ও মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন।[১৯]

তিনি প্রকৃত ধর্মকে ধারণ করেছিলেন বলেই তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী। এজন্য তিনি সকলকে উপদেশ দিয়েছেন–

> "যে যাই কর ধর্মবল সুদৃঢ় না হইলে কেহ কখনও কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারেনা। জীবনের প্রথম কার্য চরিত্র গঠন। যাহার চরিত্র বল নাই, সে কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেনা। তাই বলি পাঠক! জাতীয় ধর্মে, জাতীয় আচার ব্যবহারে অবিশ্বাসী হইয়া জগতের অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে লুকায়িত থাকিবেন না। গ্রন্থ অধ্যয়নে জ্ঞান হয় না– জ্ঞান হয় সাধনায়। সাধনবলহীন কাম কলুষিত জীবের বিদ্যা কেবল পাখির হরিনাম শিক্ষা। আগে

১৯। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃ. ৩১১

Dhaka University Institutional Repository

সাধন বল সংগ্রহ কর, দেখবে হিন্দু ধর্ম কত গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ।' বর্তমান যুগে তাঁর অভিজ্ঞান আমাদের জন্য যত অবিশ্বাসই বয়ে আনুক তাঁর সত্যকে উড়িয়ে দেওয়ার কোন ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।"[২০]

আধিকারিক পুরুষ নিগমানন্দের জীবন কেটেছে এইভাবেই লোকচক্ষুর অন্তরালে। অলৌকিক বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন,'তাই নাকি ? কই আমি তো কিছুই জানি না। বিশ্বাসের চোখে তোমরা ঐরূপ দেখ।' এই কথা বলে জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা উড়িয়ে দিতেন। আত্মগোপন করতেন নিজের শক্তির কথা, ক্ষমতার কথা। ভারতের ভবিষ্যৎ তিনি যা যা বলেছেন বাস্তবে আজ তাই প্রতিফলিত হচ্ছে। পৃথিবী সম্বন্ধে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে যা যা বলেছেন তারও সূচনা আজ শুরু হয়েছে।

পরিশেষে আমি বলতে চাই– মহাশক্তিধর শ্রী নিগমানন্দদেব অসাধারণ হয়েও অতি সাধারণভাবে সাধারণের সাথে মিশে যে প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি পূর্বক প্রতি প্রত্যেককে আকর্ষণ করে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ দ্বারা জগতের অভাবনীয় উপকারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আমরা সেই দর্শন যৎসামান্য হলেও প্রচার করে উপকৃত যে হারে হয়েছি এবার আরও হতে চাই এবং উদ্বুদ্ধ করতে চাই এই প্রত্যাশা রেখে দেশের আপামর জন সাধারণকে এই বিরোধের যুগেও সমন্বয় কর্তার সমন্বয় মুর্তি ধ্যান করতে অনুরোধ জানাই। সমন্বয় ছাড়া এই বিরোধের যুগে শান্তির আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। সামঞ্জস্য সাম্য ও সমন্বয়ই হল বিরোধের একান্ত অন্যতম একমাত্র উপায়। বর্তমান যুগে জাতির জন্য শ্রীনিগমানন্দর কী প্রকার প্রয়োজন এবং তাঁর প্রচারিত গ্রন্থগুলিতে তাঁর অভিমত কতটুকু প্রত্যাশা প্রাপ্তির উপায় হিসেবে অবশ্যক তা এযুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী রায় বাহাদুর শ্রী যুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন ডি,লিট (অন) কবি শেখর মহোদয়ের উল্লেখ থেকেই জানতে পারবেন।

বহু গল্প, বহু উপন্যাস, বহু প্রবন্ধ আজকাল সপ্তাহে সপ্তাহে বঙভাষার পাঠাগার অলংকৃত করিতেছে; কিন্তু একখানি নিগমানন্দের 'জীবনী ও বাণী' পুস্তকে যে

২০। পূর্বোক্ত, জ্ঞানী গুরু, পৃ. ০২

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দ, যে উপদেশ, যে উপন্যাসের ন্যায় ঘটনা বৈচিত্র্য ও সারগর্ভ কথা পাইলাম, তাহা পূর্বোক্ত শত শত রত্নমালার মধ্যে মধ্যমণিস্বরূপ। এই পুস্তকে যে সাধুকে দর্শন করিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া সত্যই ঠাকুর দর্শনের পুণ্য লাভ হইল। যে সাধনা দেশ হইতে লুপ্তপ্রায়, এই পুস্তকে সেই সাধনার অমৃত পথ দেখিতে পাইলাম। নিগমানন্দের বাণী দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের মতই সরল, মর্মস্পর্শী ও জীবন পথ চিনাইবার পক্ষে আলোক বর্তিকা স্বরূপ। তাঁর (বই খানি) ও বইগুলি বাঙ্গালী গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে স্ব-যত্নে রাখার সমগ্রী। ইহা দেবমাল্যের মত পবিত্র, উৎকৃষ্ট কাজের মত রসোদ্দীপক এবং মধুচক্রের ন্যায় মধুর। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থ যদি পুত্র কণ্যাগণ লইয়া সশ্রদ্ধভাবে ইহার দুই এক অধ্যায় পাঠ করেন, তবে তাঁহার গৃহের বায়ু নির্মল ও বিশুদ্ধ হইবে।[২১]

তাঁর প্রতিটি উপদেশ এবং লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ করে যোগীগুরু, তান্ত্রিকগুরু এবং প্রেমিকগুরু ও ব্রহ্মচর্য সাধন অমূল্য এই পঞ্চ গ্রন্থ এযাবত অষ্টাদশ/উনবিংশ সংস্করণে পদার্পন করেছে এবং আরও কতকাল যে এর চাহিদানুপাতে সংস্করণ চলবে তার ইয়ত্তা নেই। এযেন শেষ হয়েও হলনা শেষ। এর মহিমা ও জয়গান অতৃপ্ত হয়ে রইল অন্তর। কারণ সত্য চিরকাল নূতন । আজও এর স্বাদ সুস্বাদপুর্ণ। যতই এর স্বাদ গৃহণ করা হবে ততোই এ বৃদ্ধি পাবে। প্রেম যেমন প্রতিক্ষণ বিবর্ধনম ক্ষণে ক্ষণে এর উল্লাস বাড়তে থাকে, কোন বাধা মানে না, চলে সব বাধা অতিক্রম করে। অনুরূপ পঞ্চরত্নসম রচিত তাঁর এই সত্য সুন্দর অমূল্য গ্রন্থগুলিও এমন করে এর মুহূর্মুহূ মহিমা বিকাশে বহুকাল ধরে যে চলবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দেশজাতি সমাজের কল্যার্থে এইভাবে তিনি বহুজনহিতকর লৌকিক ও পারলৌকিক কর্মের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

২১। আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলিকাতা এপ্রিল সংখ্যা ১৯৮০, পৃষ্ঠা-৪

Dhaka University Institutional Repository

তিনি (১২৮৭-১৩৪২) পর্যন্ত পৃথিবীতে উপস্থিত থেকে এই ধরার ধরয়ীকে চির শান্তি সুখ দানে তৎপর ছিলেন।

বৈদিক সনাতন হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর সত্য দৃষ্টি দ্বারা যে সারসত্য প্রকাশ করেছিলেন তা হিন্দু সমাজের জন্য চক্ষু উন্মিলক। তিনি বলেন, 'ভারতের সুবর্ণ যুগে দেবকল্প ঋষিগণ সাধনা পর্বতের সমাধিস্বরূপ উন্নত শৃঙ্গে বসিয়া জ্ঞানের দীপ্তিবহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া যে সকল নিত্য সত্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারই সুধাময় ফল এই হিন্দুশাস্ত্র।' আমরা এমন সত্যনিষ্ঠ সনাতন হিন্দুধর্মে বাস করেও আজ দুর্বল অবহেলিত লাঞ্ছিত নিগৃহীত এর কারণ হল, নির্বিচারে পুরনোকে ঘৃণা, নূতনকে বরণ। পূর্বতনী মানেনা যারা নিছক ম্লেচ্ছ জানিস তারা – একথা যদিও ধর্মগুরু মনীষীগণ বলে গেছেন তবুও আমরা অতীত স্মৃতি ভুলে বর্তমানের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে ভাসছি এবং স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে নূতন তালে মেতে উঠেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের দর্শন, জাতীয় কৃষ্টি সভ্যতা ও ধর্মকে উপেক্ষা করে – পরের সভ্যতাকে আদর পূর্বক নিজেকে ধিক্কার দিয়ে অকাতরে করুণা পাওয়ার জন্য পর পদ লেহন করছি এবং তাদের পশ্চাদগামী হচ্ছি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যে দেশ আমেরিকা তারও আজ দম্ভের শেষ হয়েছে। বিশ্বমন্দায় এমন অর্থের ধ্বস নেমেছে যে, তার দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে পরেছে। তার স্বীয় অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। চীন বরং আজ তাকে ছাপিয়ে দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে চলছে। এই লক্ষে বলা যে, নব্য প্রযুক্তির ধুয়া শুনতে আপাত মধুর মনে হলেও ভবিষ্যৎ পরিণতি তাকে একদিন বহন করতে হবেই। উত্থানের গতি দেখেই পতনের পরিণতি বুঝা যায়। কিন্তু 'সত্য' শত পুরাতন ও মলিন হলেও তা সত্য শুভ্র সুন্দর অক্ষয় অবিনশ্বর এবং অপরিবর্তনীয়। ভারতধর্মের বিজ্ঞানী ঋষিগণ এই সত্য শিক্ষাই দান করে গেছেন। তাঁরা উপস্থিত সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিকে তেমন আদর করে বরণ করেন নি। যত টুকু প্রয়োজন শুধু ততোটুকুই গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অতি লোভে অন্ধ হয়ে আজ আমরা নীতিভ্রম হয়ে পড়ছি। পরের কথায় মুগ্ধ হয়ে নিজের সম্পদকে অবহেলা উপেক্ষা করেছি। এখনও আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

সময় আছে যদি আমরা জাতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কার ও ধর্মকে সঠিক রেখে বেশি প্রতিযোগীতার পাল্লায় ভর না করে– যা আছে তাই নিয়ে এবং যতটুকু দরকার ততোটুকুকেই গ্রহন করে সন্তুষ্ট থাকি, তবেই আশা করি আমাদের শান্তি ফিরে আসবে। কৃত বিদ্য বিজ্ঞানী ঋষিদের সত্য বাক্য সত্য দৃষ্টি প্রমানিত হবে। তাঁরাই যে আমাদের জাতীয় ভিত্তি ও উন্নতি এই দাবী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রমানিত হবে। জগতে চাওয়ার দরখাস্ত এত বেশি পরেছে যে প্রকৃতির কাছ থেকে প্রাপ্তি সে হারে জুটছে না। আর যে পদ্ধতিতে প্রাপ্তি জুটাতে সচেষ্ট হচ্ছি তা জোর পূর্বক অন্যায় অধিকার স্থাপন এবং বুদ্ধি ক্ষমতার অন্যায় বাড়াবাড়ি সামলে যা পৃথিবীর ভারসাম্যের পরিপন্থী। যার নমূনা বিশ্বে আজ শুরু হয়েছে। মানুষের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা নিশ্চিত টের পেয়ে ইতোমধ্যে চেচামেচি শুরু হয়েছে। নিগমানন্দের ভাষায়-

> বিষম কাল পড়িয়াছে,– হিন্দু সমাজের উপযুক্ত নেতার অভাব হওয়ায় সমাজে উচ্ছৃংখলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। লোক সকল উন্মার্গগামী হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের অধিকাংশ লোক বিপথগামী, অথচ সকলেই শাস্ত্রবেত্তা, ধর্মবক্তা ও উপদেষ্টা। তাহারা আপন আপন শিক্ষা দীক্ষা অনুসারে যাহার যেমন সংস্কার বা ধারণা জন্মিয়াছে, সে সেইরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম শিক্ষা দিতেছে। ইহাতে নিজে তো প্রতারিত হইতেছেই আবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনকেও বিপথগামী করিতেছে। কেহ কেহ অবিদ্যা অভিমানে উন্নত হইয়া আত্মদর্শী ও সত্যধর্মী ঋষিগণের ভ্রম প্রদর্শন পূর্বক আপন কৃতিত্ব জাহির করিতেছে। কেহবা একই শাস্ত্রের কতক প্রক্ষিপ্ত, কতক অতিরঞ্জিত এবং কতক মিথ্যালক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বাদ দিয়া আপন মতলব সিদ্ধির উপযোগী অংশ বাছিয়া লইয়া ধর্ম প্রচারক সাজিয়াছে, কেহ কেহ পুরাতন তন্ত্রগুলি বালিকার পুতুল খেলা ভাবিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্মবিদ্ হইয়া বসিতেছে। কেহবা কোন শাস্ত্রকে আধুনিক, কেন শাস্ত্রকে স্বার্থপর ব্রাহ্মণের রচিত বলিয়া মুন্সিয়ানা চালে বিজ্ঞতা প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করিতেছে। কেহবা ব্যাকরণের তাপে পুরাণগুলি গলাইয়া তাহার খাদ বাহির করিয়া দয়াপরশ হইয়া খাটি অংশ বাহির করিয়া দিতেছে, – সে তাপে ঐতিহাসিক সত্য পর্যন্ত উড়িয়া যাইতেছে। কোন দল বা নিয়ম সংযম, বিধি-নিষেধকে কুসংস্কার বলিয়া স্বেচ্ছাচারের প্রশয় দিতেছে। কিন্তু সকলে ধর্ম হীন, বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছে। ধর্মের লক্ষ্য হারাইয়া বসিয়াছে, – অথচ মুখে বড় বড় কথা। দর্শন উপনিষদ্ , যোগ, জ্ঞান ভিন্ন তাহারা ছোট কথার ধারই ধারে না। তাহারা কেহ বেদান্তের মায়াবাদী, কেহ বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যবাদী, কেহ গীতোক্ত কর্মযোগী, কেহ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানী, কেহ তন্ত্রোক্ত কৌলাচারী , কেহ উজ্জ্বলরসাস্বাদী, আর কাহারও মুখে যোগসমাধি।

এই তো গেল শিক্ষিত নেতা ও উপদেশ এবং তাহাদিগের বেলার কথা। আর যারা ধর্মের নিম্নস্তর লইয়া আছে, তাহারা কেবল তিলকমাটি, মালাঝোলা, চিনি, কলা, বাহ্য শৌচাচার ও চৈতন চুটাকি লইয়া সময় কাটাইতেছে। তিন বেলা সন্ধ্যা আহ্নিকের গটা, অথচ মিথ্যা মোকদ্দমা, মিথ্যা সাক্ষ্য, পর নিন্দা, পরস্বাপহরণ ও পরদারগমণে নিবৃত্তি নাই। এই শ্রেণীর লোক ধর্মের প্রাণ ছাড়িয়া সংস্কার বশে হাড় মাংস লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে। প্রথম শ্রেণীর লোক জ্ঞান গরিষ্ঠ ঋষিগণের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বাঁধনের উপর বাঁধন কষিয়া অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িতেছে।

হিন্দু ধর্মে ও সমাজে আরেক শ্রেণীর লোক দেখা যায় তাহারা জারজ ধর্মাবলম্বী । পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের ব্যাখ্যাও হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিয়া ইহারা অজ্ঞ সমাজে বিজ্ঞ সাজিয়া বসিতেছে। তাহাদের মুখে কেবল কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার ধুয়া, কেবল ধর্মসভা ও বক্তৃতার উচ্চনিণাদ। যাহারা গীতার প্রথম শ্লোকটি অনুবাদ করিতে গিয়া সাতটি ভুল করিয়া বসিয়াছে তাহাদিগের সমালোচিত হিন্দু ধর্ম ও

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করত এক শ্রেণীর লোক পন্ডিত হইয়া হিন্দুদিগের গুরু হইতেছে। বর্তমান ঋষিগণ সংস্কৃতজ্ঞগণ না বুঝে বুঝিয়া তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রাদির ভ্রমসংশোধন ও শ্লোকাঙ্ককর্তন করিয়া তাহারা হিন্দু সমাজের নিঃস্বার্থ উপকার সাধন করিতেছে। এই শ্রেণীর লোক দ্বারা হিন্দুধর্মরূপ কল্পপাদপ ফল-ফুল পত্রাদিযুক্ত শাখা-প্রশাখা শূন্য হইয়া স্থানুবৎ শোভিত হইবার যোগাড় হইয়াছে। এতদব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছে– তাহারা অবতার। নিজে কিংবা ভক্তগণ দ্বারা সমাজে অবতার রূপে পরিচিত হইতেছে। ভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের পর হইতে এতদ্দেশ অবতারগণে পরিপূর্ণ। প্রতি জেলাতেই দু'একটি অবতারের অভ্যুদয় পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইতিমধ্যে দুই-একটি অবতারের কারা ও দীপান্তর-বাসের লীলাভিনয়ও হইয়া গিয়াছে। তথাপি ধর্মপ্রাণ সরল লোক গণ দলে-দলে যাইয়া অবতারের দল পুষ্ট করিতেছে। এই শ্রেণীর লোক দ্বারা হিন্দু সমাজ খন্ড খন্ড হইতেছে এবং প্রকৃত সাধু চরিত অবতারের অন্তরালে পড়িয়া লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। অবতারের সংশয় জাল ছিন্ন করিতে না পারিয়া সাধু-মহাত্মার ত্যাগ-বৈরাগ্য বা জ্ঞান-ভক্তির আদর্শ সাধারণে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।[২২]

শ্রী নিগমানন্দদেব এই ভাবেই সমাজের অনৈতিক অজ্ঞান প্রসূত কর্মগুলিকে তীব্র সমালোচনা দ্বারা ধীক্কার পূর্বক যা তিনি নিজ জীবনে কঠোর সাধনা দ্বারা পরীক্ষা প্রমাণ পূর্বক সার সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তা উল্লেখ করতে কারও মুখাপেক্ষী বা কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নি, উপদেশও দেন নি। যা সত্য তিনি তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাউকে বা কোন কিছুকে ছাড় দেন নি। কারও মন বুঝে কথা বলেন নি। বর্তমান যুগে শ্রী নিগমানন্দ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই পরিলক্ষিত ও সর্বজন বিদিত।

২২। শিশির কুমার বসু, শ্রী নিগমানন্দ কথা সংগ্রহ, হালি শহর আসাম বঙ্গীয় সরস্বত মঠ হতে প্রকাশিত, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৯, পৃ. ৩৩-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সমালোচনা করেই আলোচনার ইতি টানেন নি। কিভাবে সাধারণরা বাঁচতে পারে সে বিষয়েও তিনি জানিয়েছেন।

(সাধারণরা) "তাহারা কি করিবে, কোন পথ ধরিবে এবং কাহার কথায় বিশ্বাস করিবে? যে বলিতেছে গৃহস্থ জাগরিত হও আবার সেই বলিতেছে, উঠিও না, রাত্রি আছে। এখন কি করা কর্তব্য?"[২৩] এক্ষণে কর্তব্য এই যে, আমাদের ঈশ্বর দত্ত যে মনুষ্যত্ব তাকে আশ্রয় করা। কেন না তিনি যখন আমাদের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রত্যেকেরই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তখন একটু স্থির ভাবে সেই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া বিবেকের বশবর্তী হইয়া চলিতে পারিলে কোনই গোল পড়িতে হইবে না। সত্যকে লাভ করতে বা জানতে তিনি চিত্তশুদ্ধির উপর জোর দিয়াছেন। খৃষ্টান-মুসলমানে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবে মতভেদ, পৌরাণিক-দার্শনিকে মতভেদ, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়েরই মতদ্বৈধতা দেখা যায় না। চরিত্র গঠন পূর্বক চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা খৃষ্টান-মুসলমান সম্প্রদায়েও অনুমোদিত। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা কোন সম্প্রদায়েই অভিপ্রেত নহে। সুতরাং আমরা প্রথম জীবনে সর্বসম্মত চিত্তশুদ্ধির সাধনা আরম্ভ করতে পারি। প্রতারিত হবার ভয় নাই এবং ইহার অভ্যাস বিশেষ শিক্ষা সাপেক্ষ নহে। দেশ কাল-পাত্রভেদে সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিক চিন্তার অভ্যাস করিলেই সহজে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। অন্য মত শ্রেষ্ঠ নিজ মত নিকৃষ্ট মিথ্যা কুসংস্কার পূর্ণ শুনিয়াও বিচলিত হইও না নিজমত দৃঢ় করিয়া ধারণপূর্বক তাহার পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য চেষ্টা করিবে। কেন না কোন মতই– কোন সম্প্রদায়ই নিরর্থক নহে। সুতরাং মতগুলি পথ মাত্র জানিয়া – কোন মতের নিন্দা না করিয়া কিংবা সকল মতের করিম, কালী, কৃষ্ণ খৃষ্টের খিচুড়ী না পাকাইয়া সতী নারীর ন্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়া থাকিবে। জন্মান্তরের সংস্কার এবং শিক্ষা ও রুচিভেদে অধিকারানুরূপ যে কোন একটি মত অবলম্বন করিবে। এই ভাবেই তিনি দেশ জাতি সমাজ ও ধর্মের সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব দূর করে অসম্প্রদায়িক ভাব প্রতিষ্ঠা পূর্বক পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করে গেছেন।

২৩। পূর্বোক্ত, আদর্শ গৃহস্থ্য জীবন গঠনে শ্রী শ্রী ঠাকুর, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

'অহিংসা পরম ধর্ম জীব হিংসা মহাপাপ' এই নীতি ও মহাবাক্য যদি আজ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতো তবে হাজার হাজার মায়ের কোল খালি হয়ে হাহুতাস করতে হত না। চিত্তশুদ্ধি যে আজ আমাদের সকলের ভীষণ প্রয়োজন, যাকে আমরা শুচিতা নৈতিকতা বলছি, এটি অর্জন ভিন্ন যে দেশ জাতির হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা খুন খারাবি বন্ধ হবে না সত্যদ্রষ্টা শ্রী নিগমানন্দ একারণেই জাতীর সামনে এই মহাসত্যটি তুলে ধরেছেন।

অশান্তি কেউ চায় না সবাই শান্তি চায়, মুক্তি চায় আনন্দে ও সুখে থাকতে চায়। শ্রী নিগমানন্দ এই লক্ষ্যেই নিজের দিকে তাঁর বিদ্যুন্ময় অঙ্গুলীর ইঙ্গিত দেখিয়ে জানিয়েছেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ।' আমার সার সত্য গ্রহণ পূর্বক আমাকে শরণ কর। 'মুক্তি লাভ করিতে চাইলে একজন মুক্ত ব্যক্তির সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। হিন্দু শাস্ত্রে তিনিই গুরু নামে অভিহিত। গুরুর কৃপা না হইলে মুক্তি পথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। ত্রিকালদর্শী এই মানুষ– গুরুই হলেন 'সদ্‌গুরু', অন্তর্যামী আত্মা বা ভগবান্ । এই আত্মস্বরূপ লাভই হল মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদর্শ দান করার জন্যই শ্রী নিগমানন্দ পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানালেন,– এস ভাই! ভা 'য়ে- ভা 'য়ে গলা জড়াইয়া ধরিয়া এই পতিত দেশ ও পতিত জাতির মঙ্গলের জন্য পতিত পাবনের নিকট কৃপা ভিক্ষা করি।' মিথ্যা দর্প, দম্ভ ও অহংকার ত্যাগ না করা পর্যন্ত পৃথিবীর শান্তি ফিরে আসবেনা। নিগমানন্দ দর্শন আমাদের এই শিক্ষাই এবারে দান করে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১। নিগমানন্দ পরমহংসদেব, যোগীগুরু, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ কোকিলা মুখ, চর্তুদশ সংস্করণ ১৩৭৫ বাংলা

২। নিগমানন্দ পরমহংসদেব, প্রেমিক গুরু, হালি শহর, কলকাতা, ১৪শ সংস্করণ ১৪১১ বাংলা

৩। নিগমানন্দ পরমহংসদেব, জ্ঞানীগুরু, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালি শহর, সপ্তদশ সংস্করণ, ১৪১০ বাংলা

৪। নিগমানন্দ পরমহংসদেব, তান্ত্রিক গুরু, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালি শহর, সপ্তম সংস্করণ, ১৪০৮ বাংলা

৫। নিগমানন্দ পরমহংসদেব, বেদান্ত বিবেক, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালি শহর, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৭ বাংলা

৬। নিগমানন্দ পরমহংসদেব, ব্রহ্মচর্য্য সাধন, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালি শহর, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৮ বাংলা

৭। নিগমানন্দ পরমহংসদেব, অমৃত সুধা মেহেরপুর শ্রী শ্রী গুরু ধাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ বাংলা

৮। স্বামী সত্যানন্দ, অভয় বাণী, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ কোকিলা মুখ, ৭ম সংস্করণ ১৪১২ বাংলা

৯। স্বামী সত্যানন্দ, আমি কি চাই, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ কোকিলা মুখ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০১ বাংলা

১০। স্বামী সত্যানন্দ, নিগমানন্দ দর্শন, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ কোকিলা মুখ, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৯ বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

১১। স্বামী সত্যানন্দ, পত্রালাপ, সার সংগ্রহ হৈমবতী প্রকাশনী, ফার্নরোড, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৪ বাংলা

১২। স্বামী সত্যানন্দ, উপদেশামৃত, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ৭ম সংস্করণ, ১৪০৩ বাংলা

১৩। স্বামী সত্যানন্দ, শংকরের মত ও গৌরাঙ্গের পথ, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ৯ম সংস্করণ, ২০০৩ ইংরেজী

১৪। স্বামী সত্যানন্দ, আধিকারিক পুরুষ শ্রী নিগমানন্দ, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, কোকিলা মুখ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ সাল

১৫। স্বামী সত্যানন্দ, মৃত্যু, পরকাল ও গতি সম্পর্কে শ্রী শ্রী ঠাকুর, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, কোকিলা মুখ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১০ বাংলা

১৬। নারায়নী দেবী, বাংলার সাধনা ও শ্রী নিগমানন্দ দেব, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৩ বাংলা

১৭। নারায়নী দেবী, ভাগবতী তনু নিগমানন্দ, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ হালি শহর, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪০৮ বাংলা

১৮। লেখক অজানা, ভগবান লাভের উপায়, দিনাজপুর শ্রী নিগমানন্দ, সেবাশ্রম গড়নূরপুর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪ বাংলা

১৯। লেখক অজানা, গৃহস্থের ধর্ম ও শ্রী শ্রী ঠাকুরের উপদেশ, দিনাজপুর শ্রী নিগমানন্দ, সেবাশ্রম গড়নূরপুর, ২য় সংস্করণ, ১৪১০ বাংলা

২০। লেখক অজানা, শ্রীমৎ অর্ণিবানজীর গুরুভক্তি, দিনাজপুর শ্রী নিগমানন্দ, সেবাশ্রম গড়নূরপুর, ১ম সংস্করণ, ২০০২ ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

২১। লেখক অজানা, পরমহংস শ্রী নিগমানন্দ দেব, দিনাজপুর শ্রী নিগমানন্দ, সেবাশ্রম গড়নূরপুর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ বাংল

২২। লেখক অজানা, ডায়েরী, দিনাজপুর শ্রী নিগমানন্দ, সেবাশ্রম গড়নূরপুর, ১ম সংস্করণ, ২০০৭ ইংরেজী

২৩। স্নিগ্ধা দেবী, নিগম প্রবচন, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ বাংলা

২৪। অনিবার্ণ, দিব্য জীবন প্রসঙ্গ, অরবিন্দ পাঠ মন্দির কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০০ বাংলা

২৫। অনিবার্ণ, পথের সাথী, কলকাতা হৈমবর্তী প্রকাশনী, ফার্ন রোড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪৯৮ বাংলা

২৬। প্রেমানন্দ সরস্বতী, উপদেশ রত্নমালা, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ৭ম সংস্করণ, ১৪০৩ বাংলা

২৭। যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী, শ্রী শ্রী গুরু অর্চনা ও বন্দনা বিধি, নলঝুড়ি আশ্রম, রংপুর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ বাংলা

২৮। সত্য চৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রী শ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী, আসামবঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, কোকিলা মুখ, ৯ম সংস্করণ, ১৪০২ বাংলা

২৯। স্বামী সিদ্ধানন্দ, নিগম প্রসাদ, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ বাংলা

৩০। অর্জুন বিকাশ চৌধুরী, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৭ ইংরেজী

৩১। বিশ্বনাথ দে, শ্রী অরবিন্দ স্মৃতি, অরবিন্দ পাঠ মন্দির, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৮ ইংরেজী

৩২। নলিনী কান্ত চট্টপাধ্যায়, সুধাংশু বালা, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, কোকিলা মুখ, ৩য় সংস্করণ ১৪১৪ বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। শিশির কুমার বসু, নিগমানন্দ কথা সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ২য় সংস্করণ ১৪০৩ বাংলা

৩৪। শিশির কুমার বসু, নিগমানন্দ কথা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৮ বাংলা

৩৫। শিশির কুমার বসু, নিগমানন্দ কথা সংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ১ম সংস্করণ ১৪০৯ বাংলা

৩৬। দিপালী দেবী, শতরূপে অপরূপ নিগমানন্দ, বেলঘরিয়া কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ বাংলা

৩৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্ব ভারতী, কলকাতা, ১০ম সংস্করণ, ২০০৪ বাংলা

৩৮। ড. সুকোমল চৌধুরী, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলকাতা জনা প্রিন্টিং প্রেস, ১ম সংস্করণ, ২০০৩ ইংরেজী

৩৯। শ্রী ব্রজ গোপাল দাস, অমর জ্যোতি, ঢাকা সৎ সাহিত্য প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০২ ইংরেজী

৪০। স্বামী সত্যানন্দ, আদর্শ গৃহস্থ্য জীবন গঠনে শ্রী শ্রী ঠাকুর, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ, হালি শহর, ৩য় সংস্করণ ১৩৯০ বাংলা

৪১। দিপালী দেবী, নিগম অনুশাসন, আসাম বঙ্গীয়, সারস্বত মঠ হালি শহর, ১ম সংস্করণ ১৩৮২ বাংলা

৪২। Gover, The Folk Songs of South India, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫ ইংরেজী